# আফগান জিহাদের অজানা কাহিনী -২

.......................................

জানবাজ

মুজ

াহিদ

মাওলানা মুফতী
মুহাম্মাদ রফী উসমানী

# بسم الله الرحمن الرحيم

# نصر من اللهّ وفتح قريب

জানবাজ মুজাহিদ

আফগান জিহাদের অজানা কাহিনী-২

জানবাজ মুজাহিদ

আফগান জিহাদের সূচনা ও তার প্রেক্ষাপট, গেরিলাযুদ্ধের
বিস্ময়কর কাহিনী, নিজ চোখে দেখা ঘটনাবলীর বিবরণ, পৃথিবীর অন্যতম পরাশক্তির বিরুদ্ধে মুষ্ঠিমেয় নিঃসম্বল মুজাহিদদের বিজয়লাভের ঈমানদীপ্ত দাস্তান। জিহাদ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা, জিহাদের ময়দানে তাঁর অলৌকিক প্রতিক্রিয়া ও বর্তমান বিশ্বের উপর তাঁর বিরল-বিস্ময়কর ও

জানবাজ মুজাহিদ
সুদূরপ্রসারী প্রভাবের বিস্তারিত বিবরণ।

মূল
মুফতী মুহাম্মাদ রফী উসমানী
মুহতামিম, জামি‘আ দারুল উলূম করাচী
মুফতীয়ে আযম, পাকস্তান

অনুবাদ

আবূ উসামা
শিক্ষক ও অনুবাদক

পরিবেশক মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান) ৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আফগান জিহাদের অজানা কাহিনী-২

জানবাজ মুজাহিদ
মূলঃমুফতী মুহাম্মাদ রফী উসমানী অনুবাদঃ আবূ উসামা

জানবাজ মুজাহিদ

প্রকাশক
আবূ আব্দিল কাদির
মুমতাজ লাইব্রেরী
ঢাকা, বাংলাদেশ

পরিবেশক

মাকাতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান) পাঠকবন্ধু মার্কেট (আন্ডার গ্রাউন্ড) ৫০,বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
……………………………………

ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোনঃ ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১১-১৪১৭৬৪, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

দ্বিতীয় মুদ্রণঃ সফর ১৪২৬ হিজরী, মার্চ ২০০৫ ঈসায়ী
প্রথম মুদ্রণঃ জুমাদাল আখিরাহ ১৪২৪ হিজরী

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রচ্ছদঃ ইবনে মুমতাজ গ্রাফিক্সঃ নাজমুল হায়দার কালার ক্রিয়েশন, ঢাকা

মূল্যঃ একশত চল্লিশ টাকা
মাত্র

JANBAJ MUJAHEED
By: Mufti Muhammad Rafi Usmani
Translated by : Abu Usama
Price Tk. 140.00 US $ 10.00 only

# উৎসর্গ

লক্ষ লক্ষ টাকা অসহায় আফগান মুহাজির ও মুজাহিদদের মাঝে বন্টন করেও যিনি নিজে সর্বদা

জানবাজ মুজাহিদ

ছেঁড়া-ফাটা কাপড় ও জুতা পরেছেন।
জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যিনি কঠিন থেকে কঠিনতর রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেছেন।
আফগান বিজয়ের পর যিনিকাশ্মীরের মজলুম মুসলমানদেরকে অত্যাচারী হিন্দু সম্প্রদায়ের হাত থেকে আযাদ করার স্বপ্ন নিয়ে সুদূর কাশ্মীর ছুটে গিয়ে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করলেন।
সেহ মহান ব্যক্তিত্ব শহীদ মঞ্জুর আহমাদ (রহঃ)- এর দরজা বুলুন্দির উদ্দেশ্যে।

বিনীত

অনুবাদক

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

“তোমাদের উপর জিহাদ (সমস্ত্র যুদ্ধ ) ফরয করা হয়েছে , অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয় , অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর।বস্তুতঃ

[illegible]

# [illegible]

[illegible] - [illegible]

## [illegible]

نَحْمَدُه وَ نُصَلِّيْ عَلي رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ, فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ, بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

[illegible]

[illegible]

[illegible]-- كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ

‘তোমাদের উপর জিহাদ ফরয করা হলো। ” এ শব্দগুলোর দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে যে , প্রত্যেক মুসলমানের উপর সর্ব সময়ই জিহাদ করা ফরয। তবে কুরআনের কোন কোন আয়াত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি . ওয়াসাল্লামের হাদীসের বর্ণনা মতে বুঝা যায় যে, জিহাদের এ ফরয, সর্বসময় সর্বাবস্থায় ফরযে আইনরূপে প্রত্যেক মুসলমানের উপর সাব্যস্ত হয় না। বরং এটা ফরযে কিফায়াহ। যদি মুসলমানদের কোন দল তা আদায় করে এবং শত্রুর মোকাবেলায় তাঁরা যথেষ্ট হয় , তাহলে সমস্ত মুসলমানই এ দায়িত্ব থেকে রেহাই পাবে। তবে যদি কোন দেশে বা কোন যুগে কোন দলই জিহাদের ফরয আদায় না করে , তবে এ দেশের বা এ দেশের সমস্ত মুসলমানই ফরয থেকে বিমুখতার দায়ে পাপী হবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন_

**اَلْجِهَادُ مَاضٍ إلي يَوْمِ الْقِيَامَةِ**

এর মর্ম হচ্ছে এই যে , কিয়ামত পর্যন্ত এমন একটি দল থাকা আবশ্যক , যারা জিহাদের দায়িত্ব পালন করবে।

স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণভাবে জিহাদ ফরযে কিফায়াহ হলেও মুসলমানদের নেতা যদি প্রয়োজনে সবাইকে জিহাদে . অংশগ্রহণ করার জন্য আহবান করেন , তখন সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়।

এ প্রসঙ্গে কুরআনে হাকীমের সূরা তাওবায় ইরশাদ হয়েছে -

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ الخ**

অর্থাৎ , "হে মুসলমানগণ ! তোমাদের কি হয়েছে যে, যখন তোমাদেরকে বলা হয় যে , তোমরা আল্লাহর পথে (জিহাদের জন্য ) বের হও, তখনই তোমরা মনমরা হয়ে পড়।

এ আয়াতে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার সার্বজনীন 'আদেশ দেয়া হয়েছে। এমনিভাবে আল্লাহ না করুন , যদি কোন ইসলামী দেশ অমুসলমান দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং সে দেশের লোকের পক্ষে এ আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব না হয় , তবে পার্বর্তী মুসলিম দেশবাসীর উপরেও সে ফরয আপতিত হয়। তারাও যদি প্রতিহত করতে না পারে , তবে এর " নিকটবর্তী মুসলিম দেশের উপর , এমনিভাবে সারা বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানের উপর এ ফরয পরিব্যাপ্ত হয় এবং জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। আর যখন জিহাদ প্রয়োজনের তাকীদে ফরযে আইনে পরিণত হয় , তখন পিতা - মাতা , স্বামী -স্ত্রী অথবা ঋণদাতা কারোই অনুমতির অপেক্ষা রাখে না।

আকীদায়ে জিহাদঃ

জিহাদ সম্পর্কে একজন মুসলমানের আকীদা কি হওয়া উচিত ? এ বিষয়টি ভালমতো জেনে-বুঝে মনে রাখতে হবে এবং সেমতে নিজ নিজ আকীদা প্রয়োজন হলে সংশোধন -করে নিতে হবে।

জিহাদ অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় সশস্ত্র লড়াই ইসলামের অলংঘনীয় ও অকাট্য ফরযসমূহের মধ্য হতে একটি ফরয। সুতরাং এই ফরয (জিহাদ ) অস্বীকারকারী ব্যক্তি এরূপই

কাযের , যেরূপ নামায _রোযা অস্বীকারকারী কাযের। জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার পর বিনা উজরে ত্যাগ করা মারাত্মক গোনাহ্ এবং এ বিষয়ে অহেতুক বিতর্ক করা স্পষ্ট গোমরাহী। )

পূর্বোল্লেখিত আয়াত (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ)এবং নিম্মোক্ত হাদীসসহ একাধিক আয়াত ও অসংখ্য এ বিষয়ের স্পষ্ট দলীল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ

**اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّي يَقُوْلُوْا لا اله الاّ الله ’ فمن قال لا اله الا الله عصم مني ماله و نفسه الا بحق و حسابه علي الله-**

অর্থ - আমাকে লোকদের সাথে সশস্ত্র লড়াই করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা **لا اله الا الله** -এর স্বীকৃতি দিবে (অর্থাৎ হয়তো তারা মুসলমান হয়ে যাবে অথবা ইসলামী হুকুমতের আনুগত্য স্বীকার করে জিযিয়া আদায় করবে ) সুতরাং **لا اله الا الله** যে বললো, সে স্বীয় জীবন এবং সম্পদকে আমার হাত থেকে সংরক্ষণ করে নিলো শরীঅতের হক ব্যতীত , এবং তার হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে। (বুখারী ও মুসলিম )

উপরোক্ত হাদীসে জিহাদ ফরয হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানে প্রতিরোধমূলক জিহাদ নয় বরৎ আক্রমত্মক জিহাদের কথা বলা হয়েছে।

উলামায়ে কেরাম ও জিহাদ

জানবাজ মুজাহিদ

আল্লাহ পাকের নির্দেশে স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসংখ্য জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। ফলে সাহাবায়ে ও সর্বকালের উলামায়ে কিরাম-ই জিহাদকে জান্নাত লাভের সহজ উপায় মনে করে জান-মাল সর্বন্ষ বিলিয়ে দিয়ে জিহাদ করেছেন এবং অনেকে শাহাদাতের সৌভাগ্যও লাভ করেছেন।

বেশী দূরের নয়.নিকট অতীতের কথা। ইংরেজ বেনিয়া যখন উপমহাদেশের স্বাধীনতা হরণ করে মুসলমানের ঈমান ও আমলের মহান দৌলত কেড়ে নেওয়ার যড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, তখন তাদের অপবিত্র হাত থেকে এ দেশের মুসলমানের ঈমান-আমল ও স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য সাইয়েদূত তায়েফাহ হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী রহ.কে আমীরুল মুমিনীন, হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাংগুহী রহ. কে কাযীউল কুযাত প্রধান বিচারপতি) এবং হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী রহ. কে সেনাপতি নির্ধারণ করে ইংরেজ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে - নিয়মতান্ত্রিক জিহাদ আরম্ভ করা হয়। তখন যদিও এই যুদ্ধে মুসলমানগণ বিজয়ী হতে পারেননি এবং পরবতীতে তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোইীতার মামলা দায়ের করা হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী হয় ফলে হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মকী (রহঃ) হিজরত করেন। কিন্তু তাদের এই জিহাদই পরবতীঁতে হিন্দুস্তানের স্বাধীনতা এবং পাকিস্তান ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের কারণ হয়।

পরবতীতে এই জিহাদী চেতনাকে লালন ও মুজাহিদ তৈরীর মানসেই দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

অধঃপতনের এই যুগেও পৃথিবীর যেখানেই জিহাদী জযবা সম্বলিত ইসলামী পুনর্জাগরণের বাতাস প্রবাহিত হতে দেখা যায়, সেখানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দারুল উলুমের কোন না কোন রুহানী সন্তনের ভূমিকা অবশ্যই দেখা যায়।

অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় যে, কতিপয় আলেম ক্ষমতা দখলের প্রচলিত নোংরা রাজনীতির শিকার হয়ে জিহাদের শাশ্বত সুন্দর এই.পথকেই কেবল ত্যাগ করেছেন তা নয় বরং তারা আকাবিরদের জিহাদী তৎপরতার অপব্যাখ্যা করে “জিহাদ ছেড়ে আন্দোলনের পথে” ইত্যাদি শিরোনামে নিবন্ধ ফাঁদার অপপ্রয়াসও চালাচ্ছে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এ সকল অপতৎপরতার মুখোশ উন্মোচন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

আফগান জিহাদও মূলতঃ দারুল উলুম দেওবন্দের জিহাদী চেতনারই ফসল। কারণ, আফগান জিহাদে যে সকল দেশী-বিদেশী মুজাহিদ উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছেন তাদের অধিকাংশই দারুল উলুম দেওবন্দের রূহানী সন্তান_কওমী মাদ্রাসার উস্তাদ, ছাত্র ও তাদের অনুসারীগণ। এ সকল মুখলিস আলেম ও তালিবে ইলমের পদচারণার বরকতে আফগান জিহাদ চলাকালীন যারাই রণাঙ্গনে কিছু সময় অতিবাহিত করেছেন, তাদের প্রায় সকলেই হাদীস, সিয়ার ও মাগাযীর কিতাবসমূহে পড়া দেখেছেন।

গ্রন্থ ও গ্রন্থকার

বক্ষমান গ্রন্থের রচয়িতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ রফী উসমানী ছাহেব দামাত বারাকাতৃহুম। পাকিস্তানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও. মুফতীয়ে আযম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী দেওবন্দী (রহঃ)এর সুযোগ্য সন্তান। তিনি বর্তমানে পাকিস্তানের প্রধান মুফতী এবং পাকিস্তানের অন্যতম দ্বীনী প্রতিষ্ঠান "দারুল উলৃম করাচী*-এর মুহতামিম। ইলম ও আমলের বাস্তব সমন্বয় যে সকল আলেমের মধ্যে দেখা যায়, হযরত মুফতী ছাহেব সে সকল বিরল ব্যক্তিত্বদের মধ্যে অন্যতম। যার দরুন দ্বীনের প্রায় সকল শাখায় তার ভূমিকা উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়। এ গ্রন্থের পাঠকমাত্রই অনুধাবন করবেন যে, হৃদয়ের কত গভীর থেকে তিনি পৃথিবীর চলমান অবস্থাকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং দ্বীনের এই মহান ফরিযা জিহাদের ক্ষেত্রে স্বশরীরে ভূমিকা পালন করাটাকে নিজের জন্য কিরূপ সৌভাগ্যের বিষয় বলে বিবেচনা করেছেন। একজন প্রকৃত আল্লাহওয়ালা যুগ সচেতন আলেম এমনই হওয়া উচিত। শুধু কেবল হযরত মুফতী ছাহেবই নন। হক্কানী আলেমদের প্রায় সকলেরই এ অভিন্ন অবস্থা ও বক্তব্য। আমার এখনো সেই অপূর্ দৃশ্য অন্তরের মনিকোঠায় সংরক্ষিত আছে যে, বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কিরামের দশজনের একটি জামা'আত যখন জিহাদের পবিত্র ভূমি আফগান সফর করে আসলেন, তখন সকলেই একবাক্যে স্বীকার করলেন “বর্তমান

পৃথিবীতে মুসলমানদের ঈমান-আমল, ইজ্জত-আক্র রক্ষার উপায় হলো জিহাদ।’

আফগান জিহাদ, তালেবান ও তাগুত

সাধারণ মুসলমান তো বটেই কোন কোন
আলেমও আফগান জিহাদের ফলাফল, তালেবানের উ্থান-পতন ও আমেরিকার আগ্রাসনের ভয়ানক চিত্র দেখে হতাশায় মুষড়ে পড়েন। প্রথম কথা হল, মুসলমান কোন অবস্থাতেই হতাশ হয় না। এটা তাঁর ঈমানী গায়রতের পরিপন্থী । তাছাড়া মুসলমানের জয়-পরাজয় দুনিয়ার অপরাপর জাতীয় জয়-পরাজয়ের মতো নয়। আফগান জিহাদের সর্বচেয়ে বড় সাফল্য হলো, সমগ্র দুনিয়ার মুসলমানের মধ্যে জিহাদের ভুলে যাওয়া জযবা ও চেতনাকে পূনর্জীবন দান। যার ফলে সমগ্র দুনিয়ায়ই জাগৃতি এসেছে। তৎকালীন অন্যতম পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়েছে। মধ্য এশিয়ার এ সকল ইসলামী রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করেছে, কমিউনিজনের লালজ্রোতে যার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গিয়েছিল। সোভিয়েত রাশিয়া নির্লজ্জভাবে নাকে খত দিয়ে তার অপরাজেয় (?)বাহিনী আফগানিস্তান থেকে প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিল।

পরবর্তীতে ক্ষমতার লোভে কতিপয় আফগান নেতা (যাদের কেউই. আলেম নন) আদর্শ থেকে কিছুটা দূরে সরে গিয়েছিলেন বটে, কিন্ত আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় তারা তেমন ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়নি। কারণ, যখনই তারা সমগ্র দুনিয়ার তাণুতি শক্তির ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পড়ে আফগান মুজাহিদ ও

শহীদদের কুরবানী দুনিয়ার হীন স্বার্থে বিক্রি করার সর্ব আয়োজন সম্পন্ন করেছে, ঠিক তখনি আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমতরূপে মোল্লা মুহাম্মাদ উমরের নেতৃত্বে তালেবানের উদ্ভব ঘটে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে তারা আফগানিস্তানে কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক ইসলামী এমারাত প্রতিষ্ঠা করে দেশের জনগণকে ইসলামের সোনালী যুগের শাস্তি-শৃংখলা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও ইনসাফ উপহার দিয়ে প্রমাণ. করেন যে, আখেরী যমানার ফিতনা-ফ্যাসাদ, জুলুম-অত্যাচার ও দাঙ্গা বিক্ষুব্ধ এই পৃথিবীতে যদি শান্তি সমীরণ প্রবাহিত করতে হয় তাহলে তার বিকল্পহীন একমাত্র পথ হলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিহাদী আদর্শের অনুসরণ করে কুরআন-হাদীস ভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। তালেবান প্রতিষ্ঠিত ইসলামী এমারাতে যারা নিরূপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সামান্য কয়েকটি দিন কাটানোর সুযোগ পেয়েছেন, তারাই নির্দিধায় একথা বলেছেন যে, শাস্তি- শৃংখলা, নিরাপত্তা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের যে দৃশ্য আমরা এখানে দেখেছি তা দুনিয়ার কোথায়ও নেই।

পরবর্তীকালে সমগ্র দুনিয়ার কুফরী ও ইসলাম বিরোধী শক্তির সম্মিলিত ষড়যন্ত্রে দুনিয়ার একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার যখন সকল আয়োজন সম্পূর্ণ করা হয়, তখন ইসলামী নেতৃত্ব জিহাদী আদর্শ ছেড়ে তথাকথিত আন্দোলনের পথে পা বাড়াননি বরং কৌশলগত কারণে সাময়িকভাবে তারা ক্ষমতার হাত বদল করেছেন

এবং তাগুতী শক্তির দর্পচূর্ণ করার জন্য গেরিলা যুদ্ধের পথ বেছে নিয়েছেন। ইসলাম বিরোধী প্রচার মাধ্যমের অসহযোগিতা এবং তাগুতী মোড়ল বিশ্ব-বেহায়া আমেরিকার শত চেষ্টা সত্বেও আমেরিকা ও তার মিত্রদের অসহায় অবস্থার করুণ চিত্র প্রায়ই আজকাল পুত্র-পত্রিকার সৌন্দর্য বর্ধন করে থাকে।

বক্ষমান গ্রন্থ আফগান জিহাদের অজানা কাহিনী-২ “জানবাজ মুজাহিদ' মূলতঃ এমন একটি গ্রন্থ যা আলেম, তালেবে ইলম, মুজাহিদ, সাধারণ মুসলমান, ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও কর্মী সকলেরই অবশ্য পাঠ্য, কারণ এই বই কেবল যে, আফগান জিহাদের তত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ তা নয়, বরং এটি কুরআন-হাদীস ও ইসলামী ইতিহাসের আলোকে জিহাদের গুরুত্ব-ফযীলত প্রয়োজনীয়তা এবং আফগান জিহাদে আল্লাহ পাকের রহমতের বিরল ও বিস্ময়কর ঘটনাবলীর সমাহার।

আমরা বইটিকে সার্বিক সুন্দর ও ক্রুটিমুক্ত করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি তারপরও যদি কারো দৃষ্টিতে কোন অসংগতি ধরা পড়ে, অনুগ্রহপূর্বক আমাদের জানালে আমরা পরবর্তী সংস্করণে শুধরে দিবো, ইনশাআল্লাহ।

এই বই পড়ে যদি কারো মধ্যে জিহাদী চেতনা জাগ্রত হয় এবং কুফর ও তাগুতের বিরুদ্ধে জান-মাল সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে শাহাদাতের অমীয় সুধা পানের আগ্রহ সৃষ্টি হয়, তাহলেই আমাদের শ্রম সার্থক মনে করবো।

জানবাজ মুজাহিদ
আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে আল্লাহর পথের মুজাহিদ হওয়ার সৌভাগ্য নসীব করুন। আমীন। ইয়া রাববাল আলামীন।
বিনীত
আবূ আব্দিল কাদীর
২৫শে জুমাদাল উলা, ১৪২৪ হিজরী

সূচিপত্র

বিষয়
পৃষ্ঠা
জামাখোলার প্রতিরক্ষা দূর্গ.............22 ভূমি মাইন অপসারণ...............................23 পরীক্ষামূলক আক্রমণ...........................24 কমাণ্ডারদের পরামর্শ সভা..................26 আক্রমণের পরিকল্পনা...........................27 ওসীয়তনামা.........................................29 একটি দুর্ঘটনা....................................30 আক্রমণের জন্য মুজাহিদদের দল গঠন.....31 খোদাপ্রেমিকদের দুঃসাহসিক অভিযান...33 অসহায় মুজাহিদগণ..............................35 উপযুক্ত সময়ে আক্রমণ........................37 ভয়ংকর ও বিস্ময়কর............................37 কঠিন পরীক্ষা......................................39

জানবাজ মুজাহিদ
চরম বিপদজনক পরিস্থিতি......................40 গায়েবী নুসরাত..................................41 প্রধান পোষ্টের উপর চড়াও...................43 নাটকীয়ভাবে তোপ দখল............................44 আফগান মুজাহিদদের কার্যকর আক্রমণ....45 কেন্দ্রীয় পোষ্ট দখল........................46 অলৌকিক ঘটনাবলী..................................48 সহযোগী পোষ্টসমূহ দখল........................50 শহীদ এরং আহত মুজাহিদগণ.....................51 মাওলানা আরসালান খান রহমানীর দুশ্চিন্তা.........................................52 শহীদ রহমাতুল্লাহ (রহঃ).....................53 মহাবিজয়.............................................55 শরিয়তের বিধানমত গনিমতের মাল বন্টন. 56 কমাণ্ডার যুবায়েরের অবিস্মরণীয় পুত্র..................................................58 শক্রপক্ষের তৃতীয় আঘাত....................62 উরগুন বিজয়ীদের সঙ্গে শেষ সাক্ষাত. 63 রাশিয়ার অধিকৃত মুসলিম দেশসমূহ........65 ককেশাশ অঞ্চলের মুসলিম দেশ ও রাজ্যসমূহ...........................................66 মধ্য এশিয়ার মুসলিম দেশসমূহ............67 অন্যান্য মুসলিম দেশসমূহ..................68 মাওয়ারাউন নাহার এলাকা....................71

জানবাজ মুজাহিদ
এখানের মুসলমানদের উপর......................73 যে নির্যাতন চালানো হয়.....................73 একজন মুহাজিরের নির্যাতিত হওয়ার কাহিনী................................................75 রুশ কমিউনিষ্টদের “অনুপ্রবেশ রীতি”. 78 আফগানিস্তানে তৃতীয় স্তরের করুণ পরিণতি................................................81 আফগান কমিউনিষ্ট................................85 ডঃ নাজিবুল্লাহর ধর্ম........................86 খোস্ত রণাঙ্গন....................................87 কঠিনতম রণাঙ্গন..................................88 অকুতোভয় বীর মুজাহিদ........................90 কারামত কখন প্রকাশ পায়?...................91 মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী.........94 বিস্ময়কর নুসরাত................................95 সুড়ঙ্গের বিস্ময়কর ঘটনা...............99 খোস্ত রণাঙ্গনে কমাণ্ডার যুবাইর....100 খোস্তের চতুপার্শ্ব.........................103 তোরকামার রণাঙ্গণ............................104 “বাড়ী” রণাঙ্গন...............................105 নিঃসম্বলদের প্রস্তুতি...................107 মুজাহিদদের বাহিনীসমূহ...................110 দুআ কবুলের সময়ে ফুঁপিয়ে কান্না...111 জান্নাত বেচাকেনা............................112

জানবাজ মুজাহিদ
সহকারী কমাণ্ডার আবদুর রহমান ফারুকী ......................................................... 114 তোরকামার রণীজন...............................118 ত্রিমুখী আক্রমণ..............................121 লক্ষ্য করবে কোন সৈন্য যেন পালাতে না পারে..................................................124 বিজয়ের চড়া মূল্য.............................125 আহত কমাণ্ডার....................................127 অন্যান্য আহত ও দু'জন শহীদ মুজাহিদ. 130 লাণ্ডেমাল পোষ্ট বিজয়....................132 তেরেলোটা পোষ্টও জয় হয়.................133 “বাড়ী'র বিপদসংকুল লড়াই................135 টর্চ জ্বালাল কে?..............................137 ক্ষুধার্ত সিংহ................................139 প্রথম শহীদ........................................140 মহান বিজয়........................................141 আরেকজন শহীদ......................................143 মঞ্জিল পানে কমাণ্ডার যুবাইর..........145 মুজাহিদদের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ......................................................... 148 রুশবাহিনীর সম্পর্ণরূপে পশ্চাদাপসরণ ......................................................... 150 যুবাইরের পিছনে ফারুকীও..................151 জেনারেল তানায়ীর বিদ্রোহ..............153

জানবাজ মুজাহিদ
তোরগোড়া বিজয়................................155
১. শহরের অধিবাসীদের সমস্যা............155
২. জালালাবাদের উপর ব্যর্থ আক্রমণ..156
৩. মতবিরোধ ও বহিঃ ষড়যন্ত্রসমূহ....157
৪. উপসাগরের প্রতারণাপূর্ণ দুর্যোগ ......................................................... 158 খোস্তের চূড়ান্ত লড়াই..................161 কমাণ্ডারদের উপদেষ্টা পরিষদ...........163 রণাঙ্গনের বর্তমান পরিস্থিতি.........166 স্কাড মিসাইল....................................171 যুদ্ধের সফল সূচনা...........................173 মুজাহিদদের ট্যাংক...........................175 ক্লাস্টার বোমা................................176 নাপাম বোমা........................................178 মৃত্যুবীজ এবং বারুদী ফিতা.............179 চানার পোষ্ট বিজয়...........................181 আসমানী রসদ........................................182 ফারান বাগের দিক থেকে.......................183 আরো কিছু সফলতা.................................186 বিধুর একটি দুর্ঘটনা........................187 বিপদসংকুল কিন্তু অবশ্যম্ভাবী.......188 ধাবমান ধুম্ররেখা............................189 লড়াইয়ের দ্বিতীয় ধাপ..................191 লড়াইয়ের তৃতীয় ধাপ...........................191

জানবাজ মুজাহিদ
গনীমতের ঘোড়া..................................194 হাফেয রব নাওয়ায.............................196 ফাতহে মুবীন বা প্রকাশ্য বিজয়.......200 জুতা..................................................204 এই বিজয়ের বিশেষ বিশেষ দিক...........207 বন্দী জেনারেলের সাক্ষাৎকার...........211 পরামর্শের ধর্মীয় গুরুত্ব..............213 পশ্চিমা গণতন্ত্র............................222

জানবাজ মুজাহিদ

জামাখোলার প্রতিরক্ষা দূর্গ

পাকিস্তান-সীমান্ত থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে শত্রুপক্ষের পোষ্ট” সহ্ আরও কয়েকটি পোষ্ট (চৌকি) এবং “উরগুন ছাউনী” যেই উরগুন উপত্যকায় অবস্থিত, তার দৈর্ঘ্য উত্তর-দক্ষিণে কমপক্ষে বিশ কিলোমিটার এবং প্রস্থ পূর্ব-পশ্চিমে কমপক্ষে পাঁচ কিলোমিটার। উপত্যকাটি চতুর্দিক থেকে অতি দীর্ঘ ও চওড়া পর্বতসারি দ্বারা পরিবেষ্টিত। মুজাহিদদের ক্যাম্পসমূহ এ উপত্যকারই পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের পাহাড়সমূহে অবস্থিত। কয়েক মাস পূর্বে ১৯৮৮ ঈসায়ীর এপ্রিল মাসে আমরা যখন সেখানকার রণাঙ্গনে যাই, তখন হরকতুল জিহাদিল ইসলামীর প্রধান ক্যাম্প ছিল “খানি কেল্লা”। এটি ছিল “জামাখোলা পোষ্ট” একে অনেক দূরে, আর “মড়জগাহ” হল এর উপক্যাম্প, যা ছিল জামাখোলা পোষ্ট" থেকে দক্ষিন-পশ্চিমে মাত্র দুই কিলোমিটার দূরে। তাই বর্তমানে কয়েক মাস যাবত “মড়জগাহ"কেই প্রধান ক্যাম্প বানানো হয়েছে। “জামাখোলা পোষ্টের উপর সর্বশেষ চূড়ান্ত আক্রমণের যাবতীয় প্রস্তুতি এখান থেকেই গ্রহণ করা হয়। জায়গাটি সবুজ শ্যামল পাহাড়

বেষ্টিত। তারই আশেপাশে রয়েছে মাওলানা আরসালান খান রহমানীর সংগঠনসহ অন্যান্য আফগান সংগঠনের ক্যাম্পসমূহ। “জামাখোলা পোস্টের পূর্বদিকের পর্বতসারির মধ্যেও তাঁদের দুটি ক্যাম্প রয়েছে।

সম্পূর্ণ ভূগর্ভস্থ “জামাখোলা পোষ্ট”টি উরগুন উপত্যকার উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। তার পশ্চাতে উত্তরেই কিছু দূরত্বে “আলমখান কেল্লা" ও 'নেক মুহাম্মাদ কেল্লা" নামে দুটি সহযোগী পোষ্ট এবং এগুলোর পশ্চাতে উরগুন ছাউনী, বিমান বন্দর এবং উরগুন শহর অবস্থিত।

“জামাখোলা পোষ্টটি উরগুন উপত্যকার প্রস্থের ঠিক মাঝ বরাবর টিলার উপর এমন এক স্থানে বানানো হয়েছে যে, সেখান থেকে চতুর্দিকের পাহাড় পর্যন্ত উরগুন উপত্যকার বৃক্ষলতাশুন্য বিস্তৃত প্রান্তর। এ সম্পূর্ণ প্রান্তর ভূমি মাইন দ্বারা পরিপূর্ণ। যাতে করে মুজাহিদরা পূর্ব বা পশ্চিমের পাহাড় থেকে অবতরণ করে কিংবা সম্মুখস্থ দক্ষিণ দিক থেকে পোষ্টের দিকে অগ্রসর হয়ে আক্রমণ করতে না পারে। এমনকি পূর্ব ও পশ্চিমের পাহাড় ও টিলাসমূহের যে সমস্ত জায়গা থেকে মুজাহিদদের

আক্রমণ করার সম্ভাবনা আছে সে সমস্ত জায়গায় ভূমি মাইনসমূহ “মাটিরঙ্গা ফাদ হয়ে আছে। এই প্রান্তরে কিছু নদী-নালাও আছে। সেগুলো পশ্চিম ও পূর্বের পাহাড় থেকে প্রবাহিত হয়ে পোষ্টের নিকট পর্যন্ত চলে গিয়েছে। এসর্ব নদী-নালাও ভূমি মাইন দ্বারা পরিপূর্ণ। বিশেষ করে পোষ্টের

নিকটে চতুর্দিকে তারযুক্ত ভূমি মাইনের পনের গজ চওড়া বেড়া এমনভাবে বিছানো আছে যে, সেখানে একটি পা রাখার মত জায়গাও মাইনমুক্ত নেই। যে কারণে মুজাহিদগণ এতদিন পর্যস্ত পোষ্টের উপর পূর্ব ও পশ্চিমের পাহাড় থেকে তোপ ও মিসাইল দ্বারাই বেশির ভাগ আক্রমণ করতে থাকেন। পাহাড়-প্রান্তর ও নদী-নালার মাইন পরিস্কার করে পথ বের করার পূর্ব পর্যস্ত পোষ্টের নিকট গিয়ে আক্রমণ করার কোন, পথ নেই। এই বিশাল প্রতিবন্ধক উপড়ে ফেলার ধৈর্যসংকুল ও ঝুঁকিপূর্ণ বৃহৎ কর্মটি কমাণ্ডার যুবাইর সাহেব কয়েক মাস ধরে সম্পাদন করে আসছেন।

ভূমি মাইন অপসারণ
কমাণ্ডার যুবাইর সাহেবের সঙ্গে ইতিপূর্বে করাচীতে সাক্ষাত হলে তিনি এই বৃহৎ ও মারাত্মক কাজটির বিষয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করেন। তখন থেকেই তাঁর সহকারী কমাণ্ডার বাংলাদেশের মৌলভী আবদুর রহমান ফারুকী বাছাই করা কিছু তরুণকে সঙ্গে নিয়ে “জামাখোলা পোস্ট'গামী নদী- নালা ও রাস্তাসমূহকে মাইন মুক্ত করার এবং সুযোগমত মোর্চা খনন করার কাজ দ্রুতগতিতে শুরু করেছিলেন। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে যে সমস্ত নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদ অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে “নাসরল্লাহ” বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। “নাসরুল্লাহ' সেই ঈগলসম তরুণ, যার সম্পর্কে আপনারা পিছনে পড়ে এসেছেন যে, তিনি রাশিয়ার ছয়টি গানশিপ হেলিকপ্টারের সঙ্গে একা মোকাবেলা

করে একটিকে ধ্বংস করেছিলেন আর অবশিষ্ট পাঁচটিকে তাদের কয়েকজন সেনা অফিসারের লাশ বহন করে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছিলেন।

ভূমি মাইন অনুসন্ধানের মত ঝুঁকিপূর্ণ কাজটি ছিল জানকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়ার সমার্থক। সাধারণত তাদেরকে রাতের অন্ধকারে একান্ত গোপনীয়ভাবে কোনরূপ আলোর সাহায্য ছাড়া এ কাজ সম্পাদন করতে হতো। কোন মাইনের উপর পা পড়লে কিংবা সামান্য এদিক সেদিক হলেই মাইন বিস্ফোরিত হয়ে যে কোন মূহুর্তে প্রাণ হারানোর সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং উরগুন বিজয়ের কয়েক দিন পূর্বে অভিজ্ঞ ও পুরাতন মুজাহিদ আবদুল হামীদের (বাংলদেশী ) যিনি উরগুন বিজয়ের বুনিয়াদী এই কাজে দিবস রজনী অংশগ্রহণ করেছিলেন __মাটির নিচে গুপ্ত একটি মাইনের উপর পা পতিত হলে ভিনদেশী এই তরুণ বিজয়ানন্দ প্রত্যক্ষ করার পূর্বেই যেন একথা বলতে বলতে শহীদ হয়ে যান __

***ا ل چمن موسم گل تم کو مبارک***

***اپنا تو تعلق ت ا گلستاں س خزاں تک***

“কাননের অধিবাসীরা ! তোমাদের জন্য বসন্তঋতু মোবারক হোক

কাননের সঙ্গে আমার তো সম্পর্কই ছিল শীত পর্যন্ত ”

তবুও ভূমি মাইন অপসারিত করতে করতে নিবেদিতপ্রাণ তরুণ মুজাহিদদের এই দল 'জামাখোলা পোষ্টের নিকটবর্তী হচ্ছিলেন ,

এমনকি তারা পোষ্টের অতি নিকটের একটি শুষ্ক নালা পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হন। সহকারী কমাণ্ডার মৌলভী আবদুর রহমান ফারুকী এবং তাঁর আরও দু'জন সঙ্গী প্রত্যেক রাতে লুকিয়ে লুকিয়ে এই নালার নিকট আসতেন এবং সারারাত পোষ্ট্রের অবস্থা ও সেখানকার লোকদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতেন। তারা বলেন যে, নালাটি তারযুক্ত মাইনের পনের গজ চওড়া বেড়ার এত নিকটে ছিল যে, আমরা বেড়ার তার হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারতাম। বেড়ার ওপারে টিলার উপর জামাখোলা চৌকি অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আমরা সেখান থেকে কমিউনিষ্ট সৈন্যদের কথাবার্তার আওয়াজ শুনতে পেতাম। এ নালার মধ্যে বসে ক্ষুদ্র ওয়ারলেস সেটের মাধ্যমে আমরা কমাণ্ডার যুবাইর সাহেবকে আমাদের এবং শত্রুপক্ষের পজিশন সম্পর্কে অবহিত করতাম। আমরা ওয়ারলেস সেট একেবারে মুখের নিকটে নিয়ে উপর থেকে চাদর দ্বারা ঢেকে দিয়ে নিম্নস্বরে কথা বলতাম, যেন দুশমন আমাদের অবস্থান সম্পর্কে জানতে না পারে।

এ তৎপরতা প্রায় দুই মাস পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। যার ফলে কমাণ্ডার যুবাইর সাহেব দিনের বেলাতেও 'জামাখোলা পোষ্টের” নিকটে এসে আশপাশের পাহাড় ও টিলা থেকে আক্রমণ আরম্ভ করে দেন।

পরীক্ষামূলক আক্রমণ
১৯৮৮ ঈসায়ীর ১৩ই সেপ্টেম্বরে (১৪০৯ হিজরীর মুহাররম মাসের আনুমানিক ৩০ তারিখ)

মুজাহিদগণ কমাণ্ডার যুবাইর সাহেবের নেতৃত্বে 'জামাখোলা পোষ্টের উপর অকস্মাৎ এক প্রচণ্ড ও তীব্র আক্রমণ চালান। এ আক্রমণের একটি উদ্দেশ্য ছিল দিনের বেলায় একেবারে নিকট থেকে পোষ্ট পর্যবেক্ষণ করা এবং ভূমি মাইনের সেই বেড়া চেক করা , যা পোষ্ট এবং মুজাহিদদের মধ্যে এখনও পর্যন্ত প্রতিবন্ধক ছিল। আক্রমণকালে তারা দুশমনের উপর অগ্নি বর্ষণ করতে করতে মাইনযুক্ত বেড়ার নিকটে পৌঁছে যান। কিছু মুজাহিদ আবেগাতিশয্যে বেড়ার ভিতরে প্রবেশ করতে আরম্ভ করেন , কিন্তু ভূমি মাইন বিকট আওয়াজ করে অবিরাম বিস্ফোরিত হতে থাকে। যার ফলে আবু সুফিয়ান , হাবীবুল্লাহ ও সিন্ধুর আবদুল গাফফার সহ কয়েকজন তরুণ মারাত্মকভাবে আহত হন। তবুও মুজাহিদগণ এই আক্রমণের উদ্দেশ্য পূর্ণ করে প্রত্যাবর্তন করেন। কমাণ্ডার যুবাইর সাহেব দুশমনের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত দুর্বলতা সম্পর্কে অবগত হন এবং তারযুক্ত মাইনের বেড়ার সঠিক অবস্থা জানতে পারেন।

***کھلتے نہیں اس قلزم خاموش کے اسرار***

***جب تک تو اسے ضرب کلیمي سے نہ چیرے***

“এই মৌন সাগরের রহস্য উন্মোচিত হবে না , যতক্ষণ তুমি

মুসা কালিমুল্লাহর লাঠির আঘাতে তাকে বিদীর্ণ না করবে ।”

এই আক্রমণের পর কমাণ্ডার যুবাইর সাহেবের এই সিদ্ধান্ত আরও পোক্ত হয় যে , অন্তরে আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাতবরণের প্রকৃত বাসনা পোষণকারী উল্লেখযোগ্য সংখ্যক

মুজাহিদ সাথী যদি বিভিন্ন দিক থেকে পোষ্টের উপর আক্রমণ করেন এবং তারযুক্ত মাইনের বেড়ার উপর রকেট বর্ষণ করে ভূমি মাইনকে বিস্ফোরিত করে পথ তৈরী করে তার উপর দিয়ে দ্রুত অগ্রসর হতে থাকেন; তাহলে অবশিষ্ট মাইন এবং দুশমনের গুলিতে কিছু সাথী শহীদ ও পঙ্গু হলেও বেশ কিছু মুজাহিদ বেড়া অতিক্রম

করে পোষ্টের মধ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হবেন।

এ সময় পাকতিকা প্রদেশের আফগান কমাণ্ডার মাওলানা আরসালান খান রহমানী সাহেব গজনী গিয়েছিলেন। তিনি সেখান থেকে ফিরে আসা মাত্র কমাণ্ডার যুবাইর সাহেব এবং মাওলানা আবদুর রহমান ফারুকী তাঁকে তেরই সেপ্টেম্বরের আক্রমণের বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে অবহিত করেন। মাওলানা আবদুর রহমান ফারুকী এবং নাসরুল্লাহ সাহেব কর্তৃক প্রস্ততকৃত পোষ্ট এবং পোষ্ট পর্যন্ত গমনকারী পথসমূহের মানচিত্র তাঁর সামনে তুলে ধরেন। তাঁরা মাওলানা রহমানী সাহেবকে বলেন, আমরা “জামাখোলা পোষ্ট” থেকে দু'শ মিটার দূরের ভূমি মাইনের পনের গজ চওড়া বেড়া পর্যন্তের মাইন অনেকটাই অপসারণ করে পথ তৈরী করে নিয়েছি। এখন শুধুমাত্র এ বেড়া অতিক্রম করার জন্য কিছু মুজাহিদকে জান কুরবান করতে হবে। এজন্য আমরা এবং আমাদের সাথীরা নিজেদেরকে পেশ করছি। আমাদের পঞ্চাশ জন আর আপনার পঞ্চাশজন মুজাহিদ সাথী হলে ইনশাআল্লাহ একই আক্রমণে পোষ্ট বিজিত হবে।

এ ব্যাপারে কমাণ্ডার যুবাইর সাহেব পরবতীতে মাসিক “আল ইরশাদ'কে যে সাক্ষাৎকার প্রদান করেছিলেন, তাতে তিনি বলেন__

“আল্লাহর মেহেরবানীতে আমাদের সঙ্গী মুজাহিদগণ দক্ষতা, ক্ষিপ্রতা ও প্রাণপণ প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ পোস্টের সমস্ত তথ্য এমনভাবে সংগ্রহ করেছিলেন যে, পোষ্টের সম্পূর্ণ মানচিত্র আমাদের পরিষ্কার বুঝে এসে যায়। আমরা দুশমনের কামান, মেশিনগান ও ক্লাশিনকোভসমূহের সমস্ত মোর্চা সম্পর্কে অবগত হই। আমি যখন মাওলানা আরসালান খান রহমানী সাহেবের নিকট পোষ্টের উপর চূড়ান্ত আক্রমণ করার অনুমতি চাই, তখন আমাদের পরিপূর্ণ বিজয়ের জন্য পোষ্ট পাকা ফসলের মত পূর্ণ প্রস্তুত ছিল। শুধুমাত্র সাহসের প্রয়োজন ছিল আর প্রয়োজন ছিল নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদের । আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের সাথীদের মধ্যে এ দুটি জিনিসের কোন কমতি ছিল না।”

কিন্তু মাওলানা রহমানী সাহেব আমাদের প্রস্তাবের সাথে একমত ছিলেন না। তিনি হরকাতুল জিহাদিল ইসলামীর এ সমস্ত বিদেশী মুজাহিদদেরকে পিতৃতুল্য স্নেহ করতেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, এই বেড়া ঠিকই, কিন্তু তারপরও পোষ্ট জয় হবে না। কারণ, “জামাখোলা পোষ্ট” অত্যন্ত মজবুত ভূগর্ভস্থ চৌকি সম্বলিত এবং সেখানে কোন প্রকার ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের অভাব নেই। উপরন্ত উরগুন ছাউনী, "আলম খান কেল্লা” ও “নেক মুহাম্মাদ পোষ্ট” থেকে এখানে সর্বদাই প্রচুর পরিমাণ রসদ পৌঁছা সম্ভব। বিধায়

বর্তমান পরিস্থিতিতে আক্রমণ করে লাভবান না হয়ে বরং ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে।

কমাণ্ডারদের পরামর্শ সভা
মাওলানা আরসালান খান রহমানী কমাণ্ডার যুবাইর সাহেবকে তাঁর সঙ্গে একমত করতে না পেরে এ এলাকার দায়িত্বে নিয়োজিত আফগান কমাণ্ডারদের উপদেষ্টা পরিষদের সভা আহবান করে পরিষদের নিকট সমস্যাটি' তুলে ধরেন। এর বিস্তারিত বিবরণ মাওলানা রহমানী নিজেই তাঁর এক সাক্ষাৎকারে বর্ণনা করেন-__

“সমস্ত সংগঠনের কমাণ্ডারগণ এক বাক্যে খালিদ যুবাইর সাহেবকে বলেন যে, বর্তমান অবস্থায় “জামাখোলা পোষ্টের উপর এমন আক্রমণের বিপদ ক্রয় করা আমাদের উচিত হবে না। কোন কমাণ্ডার এই ভূমি মাইন থাকা অবস্থায় সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার দুঃসাহস করবে না—তখন হরকাতুল জিহাদিল ইসলামীর কমাণ্ডার খালিদ যুবাইর তেজোদীপ্ত ভাষায় বলেন, “আমি অগ্রসর হতে তৈরী আছি এবং আমার মুজাহিদ সাথীগণও কুরবানী করতে হাজির আছে - কিন্ত কোন প্রকার সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করা ছাড়াই সভা সমাপ্ত করা হয়।”

মাওলানা রহমানী এরপর বলেন__

“খালেদ যুবাইর সাহেব উপদেষ্টা পরিষদের এই কাজে অসস্তষ্ট হন এবং আমাকে বলেন যে, “আপনারা আক্রমণের প্রোগ্রাম না করলে আমরা এখানে পাহাড়ের মধ্যে অনর্থক সময় কাটাতে আসিনি। আমি ফিরে চললাম, খোদা

হাযেজ" একথা বলে তিনি পাকিস্তান রওয়ানা হয়ে যান।”

কমাণ্ডার যুবাইর একটি গাড়ীতে আরোহণ
করে পাকিস্তানের সীমান্ত শহর “বাগাড়” অভিমুখে যাত্রা করেন ঠিকই, কিন্তু গোপনে তাঁর.সহকারী কমাণ্ডার মাওলানা আবদুর রহমান ফারুকীর নিকট বলে যান যে, “পেরেশান হবেন না। সাথীদেরকে সামলিয়ে রাখবেন। আক্রমণের অনুমতি নেওয়ার জন্য আমি এই কৌশল গ্রহণ করেছি।”

মাওলানা রহমানী যখন দেখলেন যে, যুবাইর সাহেব বাস্তবিকই চলে গেছেন, তখন তিনি অনতিবিলম্বে একজন লোককে “বাগাড়” পাঠিয়ে দেন এবং তাঁর সংগঠনের “বাগাড়ে"র ক্যাম্পে ওয়ারলেসযোগেও নির্দেশ পাঠান যে, খালেদ যুবাইরের নিকট আমার পয়গাম পৌঁছে দাও যে, “আপনি ফিরে আসুন, আমি আপনার সর্ব কথা মেনে নিতে তৈরী আছি”।

কমাণ্ডার যুবাইর সাহেব এ সংবাদ
পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে সাথে সাথে ফিরে আসেন। পরদিন ২৮শে সেপ্টেম্বর মাওলানা রহমানী পুনরায় আফগান কমাণ্ডারদের উপদেষ্টা পরিষদের সভা আহ্বান করেন এবং সবাইকে প্রস্তাবিত আক্রমণের উপর রাজী করান।

আক্রমণের পরিকল্পনা আক্রমণের পরিকল্পনা এভাবে তৈরী করা হয় যে, ৩০শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার যোহর নামাযের পর আক্রমণ করা হবে। সমস্ত সংগঠন

কমাণ্ডার যুবাইরের সঙ্গে সম্ভাব্য সকল প্রকার সহযোগিতা করবে। এই আক্রমণের আহ্বায়ক যেহেতু কমাণ্ডার যুবাইর তাই তাঁর মুজাহিদ সঙ্গিরা তাঁর কমাণ্ডেই পোষ্ট্রের উপর সরাসরি আক্রমণ করবে। অবশিষ্ট সকল কমাণ্ডার নিজ নিজ মুজাহিদদের সাথে নিয়ে উপযুক্ত স্থানে সম্পূর্ণরূপে তৈরী হয়ে অবস্থান করবে। যেন যে কোন প্রকার অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক পরিস্থিতি সামলানো যায়। সাথে সাথে তারা নিজ নিজ ক্যাম্প থেকে জামাখোলা পোষ্টের উপর আক্রমণ না করে বরং উরগুন ছাউনী ও তার অন্যান্য নিরাপত্তা চৌকির উপর মিসাইল ও কামান দ্বারা অবিরাম গোলা বর্ষণ করবে, যেন জামাখোলা পোষ্ট পর্যন্ত কোনপ্রকার রসদ পৌঁছতে না পারে। বেলা তৃতীয় প্রহরে তিনটার সময় গোলা বর্ষণ আরম্ভ হবে, আর ঠিক পৌনে ছয়টায়-_যখন কমাণ্ডার যুবাইর তাঁর বাহিনী নিয়ে মাইনের বেড়ার নিকট পৌঁছে পাবেন__তা” বন্ধ হয়ে যাবে। তারপর কমাণ্ডার যুবাইরের বাহিনী মাইনের বেড়ার মধ্য দিয়ে নিজেদের জন্য রাস্তা তৈরী (আর.পি.জি) ফায়ার করবে। যাতে করে যতটুকু সম্ভব সেখানকার মাইন বিস্ফোরিত হয়ে নিঃশেষ হয়ে যায় বা কম হয়ে যায়। তারপর সেই পথ ধরে এই বাহিনী ক্লাসিনকভ, হাত বোমা ও রকেট দ্বারা আক্রমণ করতে করতে পোষ্টের উপর চড়াও হবে। সভায় আক্রমণ-পরিকল্পনার অন্যান্য শুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও বিস্তারিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। খার মধ্য থেকে কিছু বিষয়কে গোপন রাখা হয়।

হরকাতুল জিহাদিল ইসলামীর মুজাহিদগণ এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানতে পেরে আনন্দাতিশয্যে পরস্পরের সঙ্গে এমনভাবে কুলাকূলি করেন এবং পরস্পরকে মুবারকবাদ দিতে থাকেন __যেন ঈদের চাঁদ দেখা দিয়েছে। মরহুম জিগার সাহেব শাহাদাতের জন্য এমন পাগলপারাদের সম্পর্কেইতো বলেছেন __

***جو حق کی خاطر جیتے ہیں، مرنے سے نہیں ڈرتے ہیں***

***جب وقت شہادت آتا ہے،دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں***

“সত্যের খাতিরে প্রাণধারণকারীরা মৃত্যুকে কখনও ভয় পায় না ‚ শাহাদাতের মুহূর্ত ঘনিয়ে এলে তাদের বক্ষমাঝে আনন্দ নৃত্য করতে থাকে ‚

আক্রমণের আর মাত্র দু 'দিন বাকি। এবারের আক্রমণে মূল দায়িত্ব কমাণ্ডার যুবাইর ও তাঁর সাথীদেরকে পালন করতে হবে। তাঁরা সবাই অবগত ছিলেন যে , বিপদজনক এই আক্রমণে আমাদের অনেকেই শহীদ হবেন এবং বেশীর ভাগ আহত কিংবা পঙ্গু হবেন। তাই তাঁরা এ দু ’দিনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত আক্রমণের প্রস্তুতি এবং আখেরাতের তৈয়ারীর কাজে অতিবাহিত করেন।

যাঁর যে দায়িত্ব ছিল , তিনি সেই কাজে ব্যস্ত ছিলেন। অবশিষ্ট মুজাহিদদের কেউ নিজের অস্ত্র পরিষ্কার ও মেরামতের কাজে লেগে ছিলেন , আর কেউ নফল নামাযে সেজদাবনত হয়ে মহাপরাক্রমশালী রবের দরবারে কান্নাবিজড়িত অবস্থায় বিজয় ও

নুসরাতের জন্য দুআ করছিলেন। কেন্উ যিকির ও তিলাওয়াতে লিপ্ত ছিলেন, আর কেউ ওসীয়তনামা লিখতে মনোনিবেশ করছিলেন। কিছু তরুণ পরের দিন রোযাও রেখেছিলেন।

## ওসীয়তনামা

মুজাহিদগণ সাধারণত পূর্ব থেকে ওসীয়তনামা লিখে প্রস্তুত রাখেন। কারণ, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরাপত্তাকালীন অবস্থাতেও এই তাকীদ করেছেন -

**مَا حَقُّ اِمْرَءٍ مُسْلِمٍ لَّهٗ شَيْئٍ يُّرِيْدُ اَنْ يُوْصِيَ فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ اِلَّا وَوَصِيَّتُه مَكْتُوْبَةً عِنْدَه**

অর্থ : যে মুসলমানের নিকট এমন কোন বিষয় রয়েছে, যে সম্পর্কে সে ওসীয়ত করতে চায়, যেমন তার দায়িত্বে কারও আমানত, ঋণ বা অন্য কোন হক রয়েছে) তার জন্য দুটি রাতও এমতাবস্থায় অতিবাহিত করার অধিকার নেই যে, তার ওসীয়তনামা তার নিকট লিখিত নেই। (সহিহ মুসলিম)

বলা বাহুল্য যে, জিহাদ চলাকালীন অবস্থায় _মৃত্যু যেখানে সর্বদা সম্মুখে উপস্থিত থাকে _এই হুকুম পালন করা আরো অধিক জরুরী হয়ে পড়ে। যেন তার জিম্মায় কারও হক থেকে থাকলে নির্ভরযোগ্য কোন ব্যক্তিকে তা পরিশোধ করার জন্য ওসীয়ত করে যায়। কারণ, শহীদের অন্যান্য গোনাহ মাফ করা হলেও কারও হক তার দায়িত্বে থেকে থাকলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত মাফ করা হয় না। তবে যদি হকদার নিজেই মাফ করে দেয়, সে তো

ভিন্ন কথা। এ প্রসঙ্গে ইমামুল মুজাহিদীন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন —

**يُغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْبٍ اِلاَّ الدَّيْنُ**

অর্থ : ঋণ বাদে শহীদের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করা হয়।

(মুসলিম শরীফ )

কমাণ্ডার যুবাইরের ঈগলসম তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দুশমনের উপরও নিবদ্ধ ছিল। তিনি কয়েকদিন যাবত মুজাহিদদের একটি দলকে জামাখোলা চৌকির নিকটে চৌকির তত্ত্বাবধানে লাগিয়েছিলেন। যেন বারুদের বেড়া পর্যন্ত পৌঁছার যে সমস্ত রাস্তা কিছু পরিমাণ মাইন মুক্ত করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে শত্রুরা পুনরায় মাইন লুকিয়ে রাখতে না পারে। সে দলটি সেখানে মোর্চা খনন করে নিজেদের ঠিকানা বানিয়ে নিয়েছিলেন।

***وہ قوم نہیں لائق ہنگامۂ فردا***

***جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے***

“সেই জাতি আগামী দিনের নেতৃত্বের অধিকারী হওয়ার যোগ্য নয়, যেই জাতির -ভাগ্যলিপিতে, আজকের কর্মচাঞ্চল্য অনুপস্থিত ।

## একটি দুর্ঘটনা

২৯শে সেপ্টেম্বর একটি দুর্ঘটনা ঘটে। সুজাআবাদের আশরাফুল উলুম মাদরাসায় অধ্যয়নরত শাহেদ মাসউদ কাশ্মিরী

ত্রৈমাসিক পরীক্ষা ঘনিয়ে এসেছে এমন সময় রণাঙ্গন থেকে দাওয়াত পান। অতি কষ্টে তিনি ওস্তাদদেরকে সম্মত করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা থেকে ছুটি নিয়ে সোজা রণাঙ্গনে চলে যান। রণাঙ্গনে গিয়ে পোষ্টের নিকটে মোর্চায় অবস্থানকারী দলের অন্তর্ভুক্ত হন। বাত্রিবেলায় এ মোর্চায় শুধুমাত্র দু'জন মুজাহিদ অবস্থান করে থাকে। নিয়মমাফিক গত রাতেও তাঁদের দু'জন সাথী মোর্চায় অবস্থান করেছেন, আর এঁরা কেন্দ্রে ফিরে এসেছেন। ফজর নামাযের পর তিনি একজন সাথীকে সঙ্গে নিয়ে মোর্চায় অবস্থানকারী সাথীছয়ের প্রয়োজনীয় রসদ পৌঁছানোর জন্য রওয়ানা হন। পথটি দুশমনের দৃষ্টি ও গোলার আওতার মধ্যে ছিল। কোনক্রমে লুকিয়ে লুকিয়ে সেখান থেকে ফিরে আসার সময় যখন এ জায়গায় এসে পৌঁছেন, যেখানে কয়েক দিন পূর্বে আবদুল হামীদ বাৎলাদেশী মাইন বিস্ফোরণে শহীদ হয়েছিলেন, তখন অকস্মাৎ তার পা-ও একটি গোপন মাইনের উপর পতিত হয়। তিনি নিজে একটি সাক্ষাৎকারে তাঁর সেই অবস্থা বর্ণনা করে শুনান-_

“বিকট আওয়াজে একটি বিস্ফোরণ ঘটে।
যার ধাক্কায় আমি কয়েক ফুট উপরে উঠে নিচে পড়ে যাই। তারপর কি হলো আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। শুধুমাত্র -এতটুকু দেখতে পাই যে, ধুলা উড়ে উঠে সর্বকিছু আচ্ছন্ন হয়ে গেলো। পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখি, রান পর্যন্ত উড়ে গেছে। আমি মাথা উঁচু করে কালিমায়ে শাহাদাত পড়তে আরম্ভ করি। ইতিমধ্যে আমার সাথী এসে আমাকে সান্ত্বনা

দিয়ে বলে যে, আমি কাউকে ডেকে আনছি, আমরা দু'জনে মিলে তোমাকে তুলে নিয়ে যাব। আমি বললাম, এক পা ভাল আছে। তুমি সাহায্য কর আমি এ পায়ের উপর ভর দিয়ে

চলতে পারবো। কিন্ত সে কোথা থেকে যেন একজন সাথীকে ডেকে আনে। তারা দু'জন আমাকে তুলে নিয়ে নিচে নদীর মধ্যে শুইয়ে দেয়। পনের মিনিট পর ওয়ারলেস যোগে ক্যাম্পে সংবাদ পৌঁছে। নিকটবতী মুজাহিদরা এসে আমাকে ট্রেচারে শুইয়ে নিয়ে যায়। ৩০শে সেপ্টেম্বরের বিকালে--যখন জামাখোলা পোষ্টের উপর চূড়ান্ত আক্রমণ হচ্ছিল, তখন আমাকে পেশোয়ারের হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া হয়।”

আক্রমণের জন্য মুজাহিদদের দল গঠন আক্রমণের একদিন পূর্বে সেপ্টেম্বর মাসের ২৯ তারিখে কমাণ্ডার যুবাইর তাঁর চারজন সহকারী কমাণ্ডারকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ পরিকল্পনার বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করেন এবং যুদ্ধের পূর্ব-পরিকল্পনার সম্ভাব্য ছোট-খাটো দুর্বলতাগুলো চিহিত ও সংশোধন করে সংশ্রিষ্ট ব্যক্তিদেরকে জরুরী হেদায়েত দান করেন। মুজাহিদদেরকে মোট ছয়টি দলে বিভক্ত করা হয়।

১. আক্রমণকারী দল--এ দলটি ৬০ জন জানবাজ মুজাহিদের সমন্বয়ে গঠিত হয়। এদেরকে মাইনের বেড়া অতিক্রম করে পোষ্ট্রের উপর আক্রমণ করতে হবে। কমাণ্ডার যুবাইর সাহেব নিজ হাতে এঁদের কমাণ্ডের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং নাসরুল্লাহকে

গ্রুপ কমাণ্ডার নিযুক্ত করেন। এই দলে আবুল হারিস নামক একজন আরব মুজাহিদ ছিলেন। মাওলানা আরসালান খান রহমানী তাঁর সংগঠনের একজন কমাণ্ডার সহ কয়েকজন আফগান মুজাহিদকে এ বাহিনীর অন্তর্ভূক্ত করেন।

২. রিজার্ত বাহিনী_-২৪ জন মুজাহিদের
এই দল তৃতীয় সহকারী কমাণ্ডার মাওলানা আবদুল কাইয়ুমের কমাণ্ডে ছিল। আক্রমণকারী দলের নিকট প্রয়োজনের সময় রসদ পৌঁছানো এবং পোষ্টের অন্য কোনদিক থেকে দুশমনকে উত্যক্ত করে তাদের মনোযোগকে বিভ্রান্ত ও বিক্ষিপ্ত করা এদের দায়িত্ব ছিল।

৩. তোপখানা__ সাত তরুণের এই বাহিনীর দায়িত্ব ছিল '“নাসরুল্লাহ. জিহাদ ইয়ারের” কমাণ্ডে মর্টার তোপ পরিচালনা করা। পূর্বের বাহিনীতে এবং ইতিপূর্বে যার আলোচনা এসেছে এ সেই 'নাসরুল্লাহ' নয়। এ নাসরুল্লাহ অন্য আরেকজন। এর উপাধি “জিহাদ ইয়ার,। ইন্টার পর্যন্ত শিক্ষালাভ করে ১৯৮৬ ঈসায়ী থেকে তিনি নিজেকে জিহাদের কাজে ওয়াকফ করে দিয়েছেন। ইনি যুবাইর সাহেবের চতুর্থ সহকারী কমাণ্ডার। আফগান সংগঠনসমূহের ক্যাম্পগুলো থেকে তাদের গোলাবর্ষণ বন্ধ হওয়ার পর এ দলকে নিকটবর্তী পশ্চিমের পাহাড় থেকে দুশমনের এ সমস্ত মোর্চার উপর গোলা বর্ষণ করতে হবে, যারা মুজাহিদদের আক্রমণকারী দলের উপর ফায়ারিং করছে।

৪. এন্টিইয়ারক্রাফট--১৫ মুজাহিদ বিশিষ্ট এই দলের কমাণ্ডের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় কীরী মুহাম্মাদ আবেদ ফিরদাউসীর

উপর। তাদের দায়িত্বেও প্রায় এ কাজই ছিল, যে কাজ ছিল তোপখানার দায়িত্বে। তাদেরকে নিকটবর্তী একটি টিলা থেকে তৎপরতা চালাতে হবে।

৫. গ্রেন অফ-হেভি মেশিনগান গ্রুপ--এ দলটি ছিল তিন সদস্যবিশিষ্ট । এদের আমীর নিযুক্ত হন আবু বকর বাংলাদেশী । তাঁকেও পোষ্টের আরও নিকটবর্তী পশ্চিমের একটি টিলা থেকে অনেকটা এ দায়িত্বই পালন করতে হবে, পূর্বের দুই দলের যে দায়িত্ব ছিল।

৬. প্রতিরক্ষা দল__এ দলটি ২১জন মুজাহিদের সমন্বয়ে গঠিত হয়। এর কমাণ্ড ছিল কারী নেয়ামতুল্লাহ জারওয়ার (দ্বিতীয় সহকারী কমাণ্ডার)এর হাতে। এঁদের দায়িত্বে আহতদের দেখাশোনা করা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছাড়াও একটি দায়িত্ব এই ছিল যে, তাঁরা সম্পূর্ণ রণাঙ্গনের চতুর্দিকে নজর রাখবে, যেন ডান, বাম বা পশ্চাত দিক থেকে কোন শত্রুদল আক্রমণ করতে না পারে।

অধিকাংশ দল আক্রমণের এক রাত পূর্বেই পাহাড়সমূহের ভিতরে জামাখোলা পোষ্টের একেবারে পশ্চিমে পৌঁছে “দোররায়ে আবদুর রহমান" এর মধ্যে পজিশন গ্রহণ করে। রাত বারোটার সময় তাঁরা এই দুআ করে শুয়ে পড়েন যে, “হে আল্লাহ! আমরা ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত! আপনি আমাদেরকে তাহাজ্জুদের সময় জাগ্রত করুন”

বসতীহীন অঞ্চলে জুমআর নামায জায়েয
নাই বিধায় তাঁরা জুমআর পরিবর্তে যোহরের নামায আদায় করেন। নামাযের মধ্যে

প্রত্যেক মুজাহিদ আনন্দ-উদ্দেলতা, বিনয়-নম্রতা ও খুশু-খুযুর এক অপার্থিব জগতে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েন। রুকু-সেজদা ও ওঠা-বসার স্বাদ তাঁরা এই উপলব্ধি নিয়ে আস্বাদন করছিলেন যে, এটি জীবনের শেষ নামায। প্রত্যেকে মহাপরাক্রমশালী রবের দরবারে তাঁর সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা যেন এ কথাই বলছিলেন--.

***□□ یہی میری نماز، یہی میرا وضو***

***میری نواؤں میں ہے، میرے جگر کا لہو***

***میرا نشیمن نہیں درگہ میر و وزیر***

***میرا نشیمن بھي تو، شاخ نشیمن بھي تو***

***تجھ سے مری زندگی سوز و تپ و درد و داغ***

***تو ہی مري آرزو تو ہی مری جستجو***

"এটিই আমার নামায, এটিই আমার উযু,

আমার প্রার্থনার মধ্যে রয়েছে আমার কলিজার লহু।

আমীর ও উজিরদের দরবার আমার আবাস নয়,

আমার আবাসও তুমি, শাখাও তুমি।

তোমার প্রেমই আমার জীবন, ব্যথা-বেদনা ও দহন।

তুমিই আমার বাসনা, তুমিই আমার সাধনা ***1***"

তৃতীয় প্রহরে ঠিক তিনটার সময় আফগান সংগঠনসমূহ উর ছাউনী, জামাখোলা

পোষ্ট এবং আশপাশের সমস্ত পোষ্টের উপর নিজ নিজ ক্যাম্প থেকে গোলাবর্ষণ ও মিসাইল নিক্ষেপ আরম্ভ করে।

খোদাপ্রেমিকদের দুঃসাহসিক অভিযান
এদিকে পশ্চিমের পাহাড় থেকে পোষ্ট অভিমুখে যাত্রার জন্য নির্দেশের প্রতীক্ষায় রত মুজাহিদদের দৃষ্টি এক অপূর্ব রহস্যপূর্ণ দৃশ্যের অনুসরণ করে চলছিল__তিনজন তরুণ পাহাড়ের বুক থেকে উপত্যকায় অবতরণ করছে। এরা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে টিলা, গর্ত ও বৃক্ষের আড়ালে আড়ালে জামাখোলা পোষ্ট পানে এগিয়ে চলছে--তাঁদের একজন করাচীর খালেদ মাহমুদ, দ্বিতীয় জন বাংলাদেশের অধিবাসী এবং তৃতীয় জন ছিলেন মুহাম্মাদ রফীক।

কমাণ্ডার যুবাইর তাঁদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বিপদজনক অপারেশনে পাঠিয়েছেন। পাহাড় থেকে নেমে তাঁরা কিছু দূর পর্যন্ত শুষ্ক নদী-নালার মধ্যে দিয়ে কখনো ঝুঁকে এবং কখনো বসে অগ্রসর হতে থাকেন। তাদেরকে যেতে হবে জামাখোলা পোষ্ট এবং “আলমখান কেল্লা” পোষ্টের মধ্যবর্তী মুক্ত ময়দানে। কিন্ত এদিকে এমন কোন নদী- নালা নেই, যার মধ্যে আত্মগোপন করে তাঁরা সম্মুখে অগ্রসর হবেন। তাঁদের সম্মুখে বৃক্ষলতাশূন্য উন্মুক্ত ময়দান। সেখানে পৌঁছে তারা উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েন এবং কনুইয়ের উপর ভর করে (ক্রেলিং করে) মনজিলে মাকসুদের পানে পিলপিল করে এগিয়ে চলেন।

বেলা তিনটা অতিক্রান্ত হয়েছে। তীব্র রোদের মধ্যে ময়দানের প্রত্যেকটি পাথর তার প্রতিবিম্ব সহ সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। উভয় পোষ্ট থেকে শত্রুপক্ষের সিপাইরা তাদেরকে সহজেই দেখে ফেলা সম্ভব ছিল। তাদের একটি মাত্র গোলাই ত্রয়ের ভবলীলা সাঙ্গ করার জন্য যথেষ্ট ছিল। এই বিস্ময়কর ঘটনা মুজাহিদরা নিস্তব্ধ ও বিমূঢ় হয়ে প্রত্যক্ষ করছিলেন। কিন্ত ব্যাঘ্রের , ন্যায় আত্মা আর ঈগলের ন্যায় অনুসন্ধানী দৃষ্টিসম্পন্ন এই জানবাজ মুজাহিদত্রয় পেট ও কনুইয়ের উপর ভর করে ক্রেলিং করে এমনভাবে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিলেন , যেন তাঁরা কোন খেলায় মত্ত রয়েছেন। একান্তই আল্লাহ তাআলার গায়েবী মদদ ছিল যে , তাঁদের উপর দুশমনের নজর পড়েনি। এমনকি তাঁরা তিনজন কয়েক শ ' মিটারের দূরত্ব অতিক্রম করে জামাখোলা পোষ্টের পিছনে আলমখান কেল্লার অদূরে পৌঁছে যান। কাটার যন্ত্র চোখের পলকে উভয় পোষ্টের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

নাটকীয় এই কর্ম সম্পাদন করে যখন তাঁরা ফিরে আসেন এবং কমাণ্ডার সাহেবের হাতে কেটে আনা দুই শ ' মিটার তার তুলে দেন , তখন তাঁদের চেহারার আনন্দদীপ্তি , ধুলোমলিন ছিন্নবসন , বাস -প্রশ্বাসে দ্রুত ওঠানামাকারী বক্ষ এবং কনুই থেকে প্রবাহিত শোনিতধারা বীরত্ব ও কৃতিত্বের এমন এক উপাখ্যান বলে চলছিল , যা বহু কাল পর পর কদাচিতই ঘটে থাকে।

***بہ جرآت رندانہ ہر عشق ہے روباہی***

***بازو  قوی جسکا  و  عشق ید للی***

'প্রেমে মত্ত দুঃসাহসিকতা ছাড়া প্রেম ভীরুতা মাত্র

আল্লাহর প্রেমে উন্মত্ত বাহুই শক্তিশালী বাহু'

আবেগোদ্দীপক ও রোমাঞ্চকর এই সফলতা মুজাহিদদের সংকল্পে যে আত্মবিশ্বাস ও তাওয়াকুল এবং শত্রুসেনাদের মধ্যে যে অজানা নৈরাশ্য ও ভীতি সৃষ্টি করে , তা আজ্পকের বিকালের লড়াইয়ের উপর গভীর প্রভাব ফেলে।

বিকাল চারটা বেজে গেছে। কমাণ্ডার যুবাইর সাহেব এবার তার ৬০ বেয়ে প্রান্তরে অবতরণ করেন। তিনি জামাখোলা পোষ্টগামী একটি শুষ্ক নালার নিকট পৌঁছে নিজ বাহিনীকে দুইভাগে বিভক্ত করেন। ৩০ জন অকুতোভয় মুজাহিদকে নিজের সঙ্গে রাখেন , আর অবশিষ্ট ৩০জনকে নাসরুল্লাহর কমাণ্ডে উত্তর দিকে পাঠিয়ে দেন। নাসরুল্লাহ অপর একটি নালার পথ ধরে পোষ্টের উপর আক্রমণ করবেন।

নাসরুল্লাহ বাহিনীতে সিন্ধুর অধিবাসী প্রবীণ মুজাহিদ আবদুল গাফফারের নিকট একটি মোর্চা বিধবংসী ছোট কামান 7.7 ৪ 2-ও ছিল। তিনি কামানটিকে মাইনের বেড়ার কিছু দূর পূর্বে নিরাপদ স্থানে . স্থাপন করে দুশমনের মোর্চাসমূহকে আঘাত করবেন যেন অপরাপর মুজাহিদগণ এই ফায়ারের সুযোগ নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হতে পারেন। উভয় দল কিছুদুর সম্মুখে অগ্রসর হয়ে আসরের নামায আদায় করেন।

সমস্ত আফগান সংগঠন একই সময় অবিরাম গোলা বর্ষণ করায় দুশমন উপলব্ধি করেছিল যে, আজকের আক্রমণ হবে অসাধারণ। টেলিফোনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় তারা এই ভয়ে আক্রান্ত হয়ে পড়ে যে, মুজাহিদগণ তাদের পশ্চাতেও এসে গেছে। বিধায় তারাও চতুর্দিকে এলোপাতাড়ি গোলা বর্ষণ করে চলছিল। সম্পূর্ণ এলাকায় তখন প্রলয়ংকর অবস্থা বিরাজ করছিলো । আসর নামাযের বেশ পরে অকস্মাৎ দুশমনের দৃষ্টি কমাণ্ডার যুবাইরের নেতৃত্বাধীন গ্রুপের উপর পতিত হয়। তারা অনেক সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তখন নালার একটি মোড় অতিক্রম করছিলেন। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত মেশিনগান এবং এন্টিএয়ার ক্রাফট গানের সমস্ত ফায়ার এই বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

অসহায় মুজাহিদগণ
এই জানবাজ মুজাহিদগণ অনতি নালার পাড়ের অসম্পূর্ণ আড়ালে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েন। গোলাগুলির প্রলয়ংকর প্লাবন তাদের সামান্য উপর দিয়ে চলতে থাকে। আলম খান কেল্লা এবং জামাখোলা পোষ্ট উভয় দিক থেকে গুলি আসছিলো এবং মাত্র একগজ সম্মুখে গিয়ে - নালার প্রতি ইঞ্চি মাটির মধ্যে বিদ্ধ হচ্ছিল। মাথা উঁচু করাও সম্ভব ছিল না... সবার মুখে কালিমায়ে তাইয়েবাহ এবং প্রত্যেকে শাহাদাতের জন্য প্রতীক্ষমান।

কিছুক্ষণ পূর্বে এরা যে সিরিয়ালে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিলেন, সেই সিরিয়ালমত ভূমির সঙ্গে একাকার হয়ে পড়ে থাকেন। চার নাম্বার সিরিয়ালে ছিলেন কাশ্মীরের

অধিবাসী মুহাম্মাদ ইলিয়াস। বড় মেশিনগানের একটি গোলা এসে তাঁর উরুতে বিদ্ধ হয়। উরু ছিদ্র করে গোলা পার হয়ে যায়। পায়ের হাড্ডি ভাঙ্গা থেকে আল্লাহ তাআলা তাঁকে রক্ষা করেন।

ইলিয়াস কাশ্মীরী ছিলেন এই লড়াইয়ের প্রথম আহত ব্যক্তি। তিনি সাধীদেরকে লক্ষ্য করে বলেন ৪ “তোমরা আমাকে নিয়ে ভেব না। সুযোগ পেলেই তোমরা সম্মুখে অগ্রসর হও।” এই বাহিনীতে পূর্ব থেকেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সদস্য নির্বাচন করা হয়েছিল যে, যে আহত হবে, সে কান্নাকাটি বা চিৎকার করবে না এবং তার জন্য বাহিনীর কেউ পিছনে থাকবে না। সৃতরাৎ ইলিয়াসকেও লড়াই শেষ. হওয়ার পর অন্যান্য আহতদের সঙ্গেই তুলে নেওয়া হুয়।

এটি নিছক আল্লাহরই নূসরাত ছিল যে, এখানে শুধুমাত্র একজন মুজাহিদ আহত হয়েছেন। অন্যথায় দুশমন যদি আর মাত্র কয়েক ইঞ্চি নিচে ফায়ার করতে পারতো, তাহলে এঁরা ত্রিশজনই তাদের গোলার আওতায় ছিল। এ অবস্থাতেই সূর্যাস্ত হয়। সবাই শুয়ে শুয়ে ইশারা করে মাগরিব নামা আদায় করেন। এমন জটিল মুহুর্তে তাঁরা মহান আল্লাহর- দরবারে কেঁদে কেদে বিজয় ও নুসরাত প্রার্থনা করেন।

পূর্ব পরিকম্পনা মাফিক ঠিক পৌনে ছয়টার সময়, যখন সূর্য অস্ত যাচ্ছিল, আফগান সংগঠনসমূহের তোপ ও মিসাইলের ফায়ার বন্ধ হয়ে যায়। যেন অগ্রসরমান মুজাহিদগণ ফায়ারের আওতায় না পড়েন! এ গোলাবর্ষণের

একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল দুশমনের ছাউনী ও অন্যান্য পোষ্টসমূহ যেন পরস্পরকে রসদ পৌঁছাতে না পারে এবং তারা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে অগ্রসরমান মুজাহিদদের উপর আক্রমণ করতে না পারে। কিন্ত পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক সে.সময় এই মুজাহিদ দলের মাইনের বেড়ার নিকটবর্তী শুক নালার মধ্যে থাকার কথা ছিল। যেন অন্ধকার হতেই তারা এ বেড়ার উপর রকেট বর্ষণ করে নিজেদের জন্য পথ করে নিতে পারেন। কিন্তু দুশমনের ফায়ারিংয়ের প্লাবনের মধ্যে তাঁদেরকে অগ্রাভিযান বন্ধ রেখে এখানেই অন্ধকার হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। আকস্মিক এই পরিস্থিতির কারণে সম্পূর্ণ যুদ্ব-পরিকম্পনাই সুদূরপ্রসারী ক্ষতির সম্মুখীন হয়। আরেকটি ক্ষতি এই হয় যে, কমাণ্ডার যুবাইরের বেল্টের সঙ্গে সংযুক্ত ওয়ারলেস সেটটি ক্রোলিং করে অগ্রসর হওয়ার সময় কোথাও হারিয়ে যায়, ফলে অন্যান্য মুজাহিদদের সঙ্গে এই বাহিনীর যোগাঝোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

উপযুক্ত সময়ে আক্রমণ
এদিকে নাসরুল্লাহ জিহাদ ইয়ারের সাত সদস্যের দলটি—যারা পশ্চিমের “কাজী দুররার একটি পাহাড়ের উপর মর্টার তোপ বসিয়ে তাদের পালা আসার প্রতীক্ষায় ছিলেন_-তারা আফগান সংগঠনসমূহের গোলা বর্ষণ বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে কমাণ্ডার যুবাইর এবং নাসরুল্লাহুর অগ্রসরমান বাহিনীর উপর ফায়ারকারী দুশমনের

মোর্চাসমূহের উপর তীব্র গোলা বর্ষণ আরম্ভ করেন। তেমনিভাবে কারী আবেদ ফিরদাউসীর কমাণ্ডেপশ্চিমের অপর একটি টিলার উপর অবস্থান গ্রহণকারী এন্টি এয়ারক্রাফট গান বাহিনীও দুশমনের বিরুদ্ধে জোর তৎপরতা চালায়। তৃতীয় দিকে বড় মেশিন গানের তিন সদস্যের দলটি আবু বকর বাংলাদেশীর কমাণ্ডে নিকটবর্তী অপর একটি টিলার উপর ওৎ পেতে ছিল, তাঁরাও ফায়ার আরম্ভ করে। এই ত্রিমুখী আক্রমণের ফলে দুশমনের ফায়ার কিছুটা শিথিল হয়। ফলে অগ্রসরমান উভয় দল সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ লাভ করে। কমাণ্ডার যুবাইর সুযোগ পেতেই সম্মুখে অগ্রসর হয়ে নালার মধ্যে অনেক দূর পর্যস্ত পর্যবেক্ষণ করে ফিরে এসে তাঁর জানবাজ মুজাহিদদেরকে সাথে নিয়ে দ্রুত সম্মুখে অগ্রসর হন।

অন্ধকার বেড়ে চলছে। এখন নাসরুল্লাহ জিহাদ ইয়ার, কারী আবেদ এবং আবুবকর তিনজনই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ফায়ার করছিলেন। তাঁরা প্রত্যেক ফায়ারের পূর্বে খুব ভাল করে দেখে নিচ্ছিলেন, যেন কমাণ্ডার যুবাইর বা নাসরুল্লাহর বাহিনীর কোন মুজাহিদ ফায়ারের আওতায় না আসে।

ভয়ংকর ও বিস্ময়কর
এ সময় নাসরুল্লাহ জিহাদ ইয়ার তার ৬৫তম গোলাটি ফায়ার করলে জামাখোলা পোষ্টে না পড়ে অগ্রসরমান মুজাহিদদের নিকটে এসে সেটি পতিত হয়। নাসরুল্লাহ জিহাদ ইয়ারের

সর্বাঙ্গে তরঙ্গের ন্যায় ভীতি প্রবাহিত হয়। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন -

“আমি দূরবীন দিয়ে দেখার সাথে সাথে আমার মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে "আলহামদুলিল্লাহ" বের হয়ে আসে। কারণ, সেই গোলাটি বিস্ফোরিত হয়নি। সেটি বিস্ফোরিত হলে কতজন মুজাহিদ যে শহীদ হতেন এবং কতজন যে আহত হতেন, তা বলতে পারবো না।” তিনি বলেন, “সেদিন সন্ধ্যায় আমি মোট ১০০টি গোলা নিক্ষেপ করেছি। তার সর্ব কয়টি গোলাই বিস্ফোরিত হয়েছে। শুধুমাত্র এ গোলাটিই বিস্ফোরিত হয়নি!

***اس التفات خاص کا ، میں لطف کیا کہو***

***جس نے دیا تھا درد ، وہی غم گسار ہے***

‘প্রেমাস্পদের বিশেষ এই দৃষ্টির কি যে স্বাদ, তা আর কি বলবো***!***

যিনি বেদনা দানকারী, তিনিই আবার বেদনানাশক***!”***

যাহোক জিহাদ ইয়ার, কারী আবেদ এবং আবু বকর যতক্ষণ পর্যন্ত অগ্রসরমান মুজাহিদদের উভয় দলকে দূরবীন যোগে দেখতে পাচ্ছিলেন, করে উভয় দলকে সহযোগিতা করে যাচ্ছিলেন। অন্ধকার ঘনিভূত হওয়ার পর বাধ্য হয়ে তাঁদেরকেও ফায়ার বন্ধ করতে হয়। .

দুশমনের ফায়ার পুনরায় তীব্রতর হয়। কিন্তু এখন তারা অন্ধকারের মধ্যে অনুমানের ভিত্তিতে ফায়ার করছিলো। কমাণ্ডার যুবাইরের বাহিনী গোলাগুলির

বর্ষণ থেকে নদী-নালার মধ্যে আত্মগোপন করে গা বাঁচিয়ে সবিক্রমে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকেন। কমাণ্ডার যুবাইর ছিলেন সর্বাগ্রে। তাঁর পিছনে ছিলেন প্রথম সহকারী কমাণ্ডার মাওলানা আবদুর রহমান ফারুকী ও অন্যান্যরা।

অকস্মাৎ দুশমনের একটি গোলা এসে তাঁদের নিকটে বিস্ফোরিত হয়। তার জ্বলন্ত একটি টুকরা মাওলানা আবদুর রহমানের গোছার গোশত চিরে পার হয়ে যায়। গভীর ক্ষত হয়। কিন্তু হাড্ডি রক্ষা পায়। রক্ত বন্ধ করার জন্য কমাণ্ডার যুবাইর অনতিবিলম্বে নিজের রুমাল দ্বারা তাঁর গোছা শক্ত করে বেঁধে দেন। তারপর উভয়ে দ্রুত সম্মুখে অগ্রসর হন।

কমার সাহেবের ধারণা ছিল যে, বিপরীত দিক থেকে গ্রুপ কমাণ্ডার নাসরুল্লাহ পরিকল্পনা মাফিক তাঁর ত্রিশজন জানবাজ নিয়ে পোষ্টের উপর আক্রমণ করে বসেছেন। তাই এরা অতি তাড়াতাড়ি সেখানে পৌঁছাতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু ওয়ারলেস না থাকার কারণে তাঁদেরকে কে বলবে যে, সেই দলটিও এক প্রাণ সংহারক পরিস্থিতিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে।

***آزمودہ فتنہ ہے اک اور بھی گردوں کے پاس***

***سامنے تقدیر کے ، رسوائی تقدیر دیکھ !***

‘কালের আবর্তনের হাতে পরীক্ষার আরেকটি কৌশল অবশিষ্ট রয়েছে।

ভাগ্যলিপির সম্মুখে মানব-প্রচেষ্টার ব্যর্থতাও প্রত্যক্ষ করো।’

কঠিন পরীক্ষা
নাসরুল্লাহর দল মাগরিব নামাযের সময় মাইনযুক্ত বেড়ার কিছু দূরে গিয়ে পৌঁছে। এখানে আবদুল গাফফার তাঁর মোর্চা বিধ্বংসী কামান বসিয়ে নামাযান্তে পোষ্টের মোর্চাসমূহের উপর ফায়ারিং আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। হাতে গোলা তুলে দেওয়ার জন্য তিনজন সাথী তাঁর সঙ্গে রয়ে যান। অবশিষ্টরা সম্মুখে অগ্রসর হন। তাঁরা দুশমনের ফায়ারিংয়ের মধ্যে বীরবিক্রমে অগ্রসর হয়ে জামাখোলা পোষ্টের এত নিকটে গিয়ে পৌঁছেন যে, সেখান থেকে তাঁরা দুশমনের উপর ক্লাসিনকোভ দ্বারা প্রতিরোধমূলক ফায়ার আরম্ভ করেন। নাসরুল্লাহর পিছনের বশীর আহমাদ সাবের ক্লাসিনকোভের দুল ম্যাগাজিন খালি করেছিলেন, এবার তৃতীয় ম্যাগাজিনের পালা।

সকল জানবাজ মুজাহিদ ফায়ার করতে করতে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিলেন, কিন্তু অন্ধকারের কারণে তাঁরা মাইনযুক্ত বেড়া দেখতে পাচ্ছিলেন না। অথচ ঐ বেড়ার উপর রকেট বর্ষণ করে তাঁদেরকে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার পথ করে নিতে হবে। বেড়ার জালে আটকে যাওয়ার বিষয়টি তাঁরা ঐ সময় জানতে পারেন, যখন গ্রুপ কমাণ্ডার নাসরুল্লাহ ভয়ংকর এক মাইন বিস্ফোরণে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যান এবং তাঁর নড়াচড়া করার মত অবস্থাও আর অবশিষ্ট থাকে না। তাঁকে উঠানোর জন্য সাবের সম্মুখে অগ্রসর হলে অপর একটি ভূমি মাইন তাঁর উভয় পায়ের মাঝখানে বিকট আওয়াজে

বিস্ফোরিত হয়। সেও আহত হয়ে পড়ে যায়। তারপর একাধারে কয়েকটি ভূমি মাইনের বিস্ফোরণ ঘটে আরও কয়েকজন সাথী মারত্মক আহত হয়ে পড়ে যান। ১৫ গজ চওড়া এ বেড়াটি তারযুক্ত মাইন দ্বারা এমনভাবে পূর্ণ করা হয়েছিল যে, কোথাও একটি পা রাখার মত জায়গাও মাইনযুক্ত ছিল না।

কিছু আফগান মুজাহিদ তখনও বেড়ার মধ্যে প্রবেশ করেননি, কিন্ত তাঁরাও এখন আর রকেট বর্ষণ করে রাস্তা তৈরী করার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারছিলেন না। কারণ, এতে করে এক রকেটেই অসংখ্য মাইন একই মুহূর্তে বিস্ফোরিত হয়ে এ সমস্ত আহত সাথীদের প্রাণ হরণ করবে, যাঁরা আহত হয়ে বেড়ার মধ্যে অসহায় অবস্থায় পড়ে রয়েছেন।

বশীর তো অল্পক্ষণ পর কোন রকমে নিজেই
এঁ বেড়া থেকে বের হতে সক্ষম হন, অবশিষ্ট আহতদেরকে আবদুল গাফফার এবং আফগান মুজাহিদরা জান বাজি. রেখে বের করে পিছনে নিয়ে আসেন। মোটকথা এ দলের একজন ও বেড়া অতিক্রম করতে সক্ষম হননি, তবে আবদুল গাফফার তার তোপ দ্বারা কমাণ্ডার যুবায়েরের বাহিনীকে সহযোগিতা করার জন্য ইশার নামায পর্যস্ত ফায়ার করতে থাকেন। তিনি অন্ধকারের মধ্যে ১৫/২০টি গোলা বর্ষণ করতে সক্ষম হন। ফলে দুশমনের কয়েকটি মোর্চা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এখন ভূমি মাইনের ভয়ংকর বেড়া অতিক্রম করার এবং জামাখোলা পোষ্টের উপর আক্রমণ করার জন্য শুধুমাত্র কমাপ্তার যুবায়েরের দুঃসাহসী বাহিনীই অবশিষ্ট থাকেন। আহত ইলিয়াস নদীর মধ্যে থেকে

ফাওয়ার কারণে এখন এঁদের দলে ছিলো আর মাত্র ২৯ জন মুজাহিদ। ধারা নিরবিচ্ছিন্ন অন্ধকার এবং দুশমনের এলোপাতাড়ি ফায়ারিংয়ের মধ্যে নিজেদেরকে . ভাগ্যের হাতে সপে দিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকেন। ওয়ারলেস সাথে না থাকার কারণে তাঁরাও অন্যান্য বাহিনীর অবস্থা জানতে পারছিলেন না এবং অন্যরাও তাঁদের সম্পর্কে জানতে পারছিলেন না।

***کون سی وادی میں ہے ، کون سی منزل میں ہے؟***

***عشق بلا خیز کا ، قافلہ سخت جاں***

“বিপদসংকুল প্রেমের কঠিন প্রাণ কাফেলা ,

কোন প্রান্তরে যে রয়েছে , আর কোন মনজিলে যে পৌঁছেছে ”

## চরম বিপদজনক পরিস্থিতি

ভূমি মাইনযুক্ত বেড়া নিকটে এসেছে মনে করে তাঁরা বেড়ার উপর রকেট বর্ষণ করার প্রস্তুতি নিয়েছেন , এমন সময় সম্মুখে অগ্রসর হতে হতে অকস্মাৎ একটি তারের সঙ্গে রহমাতুল্লাহ বাংলাদেশীর পা আটকে যায়। বিকট আওয়াজে মাইন বিস্ফোরিত হয়। তিনি মারাত্মকভাবে আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যান। তারপর একাধারে আরও কয়েকটি মাইন বিস্ফোরিত হয়। ফলে বেশ কয়েকজন মুজাহিদ আহত হয়ে পড়ে যান। তখন বুঝতে পারেন যে , তাঁরাও মাইনের বেড়ার মধ্যে জাটকে গিয়েছেন। এখন রকেট বর্ষণ করার' পরিকল্পনা আর বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছিল না। নিচে , সম্মুখে , ডানে , বামে

সর্বত্র মাইনের জাল বিছানো ছিলো। মাইনের এই জালের মধ্যে প্রত্যেক বিস্ফোরণের সাথে সাথে জানবাজ মুজাহিদরা আহত হয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। দুশমনের ফায়ারিংও জোরেশোরে চলছিলো। সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ এবং সকল পরিকল্পনা নিস্ফল হয়ে যায়। বাহ্যত এখন আর কারো বাঁচার সম্ভাবনা ছিল না।

এমন সময় ভূপতিত আহত মুজাহিদরা পশ্চাত থেকে অগ্রসরমান মুজাহিদদেরকে আওয়াজ দিয়ে বলেন যে, 'এখানে সর্বত্রই মাইন রয়েছে। মাটিতে পা রেখো না। আমাদের বুকের উপর পা রেখে সামনে অগ্রসর হও।" এ কথা বলে যাঁর যাঁর দ্বারা সম্ভব হয় সোজা হয়ে শুয়ে পড়েন। যেন অগ্রসরমান মুজাহিদদের পা মাইনের উপর না পড়ে।

অসহায় ও চরম নিরুপায় অবস্থায় সকল মুজাহিদ মহান আল্লাহর দরবারে আপাদমস্তক দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা এবং সর্ধাঙ্গ দিয়ে ফরিয়াদ করতে থাকেন এবং একান্তভাবে তাঁরই অপার রহমতের উপর ভরসা করে যে সমস্ত জানবাজ তখনও মাটিতে পড়ে যাননি, তাঁরা কেদে কেঁদে দুআ করতে থাকেন এবং -লাফিয়ে লাফিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকেন।

***عشق کی فریاد لازم تھی ، سو وہ بھی ہو چکی***

***آب ذرا دل تھام کر فریاد کر تاثیر دیکھ***

"প্রেম চেয়েছিল ফরিয়াদ, এবার তাও হয়েছে

এখন ধৈর্য ধরে ফরিয়াদের প্রতিক্রিয়াও প্রত্যক্ষ কর

গায়েবী নুসরাত ঘটনাটি যদি আমি নিজে সরাসরি সেই জানবাজ মুজাহিদদের নিকট থেকে 'তাওয়াতুরের' পর্যায়ে না শুনতাম তাহলে আমার নিজেরও একথা বিম্বাস করতে কষ্ট হতো যে, অবশিষ্ট এই মুষ্টিমেয় জানবাজ ' মুজাহিদ সেই বেড়া নির্দ্বিধায় লাফিয়ে পার হয়ে যায় অথচ তাদের পায়ের তলায় একটি মাইনও বিস্ফোরিত হয় না। যাঁরা বিস্ময়করভাবে এ বেড়া অতিক্রম করেন, তাঁরা হলেন কমাণ্ডার যুবাইর, মাওলানা আবদুর রহমান, আদিল আহমাদ ও খালেদ আহমাদ (করাচী) প্রমুখ ব্যক্তিবুযুর্গ।

ফায়সালাবাদের কৃশকায় আদিল-যিনি ১৯৮৫ ঈসায়ী থেকে এ পর্যন্ত প্রাণ হাতে নিয়ে রণাঙ্গনে বীরদর্পে জিহাদী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন- বলেন-

আমাদের সঙ্গে সরফরাজ নামের এক মুজাহিদ ভাই ছিলেন। তিনি অল্প কিছুদিন আগে তাবলীগে এক চিল্লা লাগিয়ে এসেছিলেন। লড়াইয়ের পূর্বে তিনদিন পর্যন্ত তিনি বারবার দু‘আ করতে থাকেন যে, ‘হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এমন নুসরাত করুন! এমন নুসরাত করুন! যে আপনার নুসরাত অবতীর্ণ হতে আমরা স্বচক্ষে দেখতে পাই।’

--মাইনের বেড়া অতিক্রমকালে বাস্তবিকই আমরা আল্লাহর নুসরাত স্বচক্ষে দেখতে পাই। আমাদের সম্মুখে এমন পথ খুলে যায় যে, তা আর কী বলবো! সে পথে মাইনের নাম গন্ধও ছিল না।”

নাসরুল্লাহ জিহাদ এর আরও বিস্তারিত ঘটনা বলেন যে , “যেই পথ ধরে মুজাহিদ সাথীরা বেড়াটি অতিক্রম করেছিলেন , পরদিন সকালে আমি সেই পথ চেক করি। সেখানে অসংখ্য মাইন দেখতে পাই। সেগুলোকে আমি অকেজো করে ফেলি। মুজাহিদরা ঐ সমস্ত মাইনের উপর দিয়ে পথ অতিক্রম করেছিলেন। ”

মোটকথা, অবশিষ্ট জানবাজ মুজাহিদগণ — যাঁদের মধ্যে মাওলানা আরসালান খান রহমানী প্রেরিত কিছু আফগান মুজাহিদও ছিলেন —যখন রক্ত প্রবাহিত ক্ষত নিয়ে সেই মৃত্যু উপত্যকা অতিক্রম করেন , তখনকার অবস্থা সম্পর্কে কমাণ্ডার যুবাইর বলেনঃ

“আমি মুজাহিদ সাথীদের দিকে তাকিয়ে দেখি তারা ১৫ জন। অবশিষ্টরা আহত হয়েছিল অথবা আহতদের সাথে পিছনে রয়ে গিয়েছিল। ”

***نقش حیرت بن□ □و□ تھ□ □م !***

***کیا بتائیں ک□ا س□ گزر□ □م؟***

আমরা মূর্ত বিস্ময়ে পরিণত হয়েছিলাম ***!***

কি যে পথ আমরা অতিক্রম করেছি , তা আর কি বলবো***!’***

পূর্ব দিকে আনুমানিক দুইশত মিটার দূরে জামাখোলার কেন্দ্রীয় পোষ্ট। তার একটি সহযোগী পোষ্ট ছিল তার দক্ষিণে , আর ২টি ছিল তার উত্তরে। এই চার পোষ্টের সমষ্টিকে জামাখোলা পোষ্ট বলে। সেগুলো উঁচু টিলার উপর প্রায় এক কিলোমিটার জায়গাব্যাপী বিস্তৃত ছিল।

বেড়া অতিক্রম করতেই এই পনের জন মুজাহিদ প্রধান পোষ্টের দিকে ধেয়ে যান। কয়েক কদম অগ্রসর হতেই তারা এ সড়কটি পেয়ে যান, যেটি সহযোগী পোষ্টসমূহের সঙ্গে কেন্দ্রীয় পোষ্টকে মিলিত. করেছে। এ সম্পূর্ণ এলাকা ছিল শত্রদের এলাকা। বিধায় এখানে মাইনের আশংকা তো ছিল না তবে সম্মুখের টিলাসমূহের উপর বিস্তৃত পোষ্টসমূহের_ চতুর্দিকের ভূগর্ভস্থ পাকাপোক্ত মোর্চাসমূহ থেকে দুশমনের ট্যাঙ্ক, দূরপাল্লার কামান, মর্টার তোপ ও বড় মেশিনগানসমূহ এলোপাতাড়ি গোলা বর্ষণ করছিলো। এটি ছিল এই মুষ্টিমেয় তরুণ মুজাহিদের সাহস ও সংকল্পের আরেকটি পরীক্ষা-_কমাণ্ডার যুবাইর তাঁর সাক্ষাৎকারে বলেন,

“তখন পর্যস্ত আমি কোন মুজাহিদকে ফায়ার করার অনুমতি দেইনি। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে গোলা-বারুদ খরচ করার জন্য তাঁদেরকে তাকিদ করা হয়েছিল। কারণ, আমাদের জানা ছিল না যে, পোষ্টের ভিতর প্রবেশ. করার পর সেখানে কত দীর্ঘ সময় লড়াই করতে হবে। সর্বাগ্রে ছিলাম আমি, আমার পিছনে আবদুর রহমান ফারুকী এবং তাঁর পিছনে আদিল আহমদ। আমি একটি মোর্চার একেবারে সম্মুখে চলে যাই। যেখান থেকে দুশমন সৈন্যরা মেশিনগান: চালাচ্ছিল। তার প্রত্যেকটি গুলি আমাদের আশপাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। আমি আদিলকে এ মোর্চার উপর রকেট নিক্ষেপের নির্দেশ দেই। সে মোর্চা তাক করে আর.পি.জি. ৭ নিক্ষেপ করে রকেট আঘাত

করতেই মোর্চা থেকে ফায়ারিং বন্ধ হয়ে যায়। ”

গুরুত্বপূর্ণ এই মোর্চাটি ধ্বংস হওয়ায় দুশমনের প্রতিরক্ষা দূর্গে বড় ধরনের ফাটল সৃষ্টি হয় এবং নির্ভীক মুজাহিদগণ এ দিক থেকে চর্টাও হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। মরহুম ভাইজানের ভাষায় —

***راستے کھلتے گئے ، عزم سفر کے سامنے***

***منزلیں ہی منزلیں، اب سفر کے سامنے***

“পথচলার দৃঢ় সংকল্পের মুখে পথ উন্মোচিত হতে থাকে ।

এবার দৃষ্টির সম্মুখে গন্তব্যই গন্তব্য দেখা দিতে থাকে ।’

## প্রধান পোষ্টের উপর চড়াও

কমাণ্ডার যুবাইর বজ্রকণ্ঠে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে ঐ মোর্চার দিকে ধাবিত হন। নিবেদিতপ্রাণ কিছু মুজাহিদ তাকবীর দিতে দিতে তাঁর সঙ্গী হন। অবশিষ্টরা বিভিন্ন দিক থেকে নীরবে ঐ টিলার উপর আরোহণ করতে থাকেন—গেরিলা মুজাহিদ খালেদ মাহমূদ (করাচী) – যিনি আজ তৃতীয় প্রহরে দুশমনের টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন করার জন্য নাটকীয় কর্ম সম্পাদন করেছিলেন, বলেন—

“আমি উপরে আরোহণের জন্য একটি কাঁচা পথ পেয়ে যাই। সেই পথ ধরে কিছু উপরে উঠার পর ডানদিকের একটি মোর্চাতে তিনজন সৈন্যকে উপবিষ্ট দেখতে পাই। তারা আমাদের অগ্রসরমান মুজাহিদদের উপর (কমাণ্ডার যুবাইর প্রমুখ) ক্লাসিনকোভ দ্বারা ফায়ার

করছিলো—আমি তাদের একেবারে নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। আমার আত্মগোপন করার কোন জায়গা ছিল না। তবে অন্ধকার হওয়ায় তারা আমাকে তাদের নিজেদের লোক বলে মনে করে। আমাকে দেখতেই তারা ফার্সি ভাষায় চিৎকার করে করে বলে--- “বেরাদার! বজন, বজন, ঈঁ তরফ আশরার হাসতান্দ” (ভাই! মারো, এদিকে সন্ত্রাসী (মুজাহিদ) রয়েছে)—আমি তাদের কথা শুনে আল্লাহর শোকর আদায় করতে করতে সম্মুখে অগ্রসর হই। কয়েকধাপ সম্মুখে একটি ভাঙ্গা কামরা দেখতে পাই। আমি দৌড়ে গিয়ে তার আড়ালে পজিশন গ্রহণ করি এবং ঐ সৈন্যদের উপর ক্লাসিনকোভ দ্বারা ব্রাষ্ট ফায়ার করি (যার ফলে ম্যাগজিনের পুরা ত্রিশটি গুলিই এক সাথে ফায়ার হয়ে যায়)—তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে মোর্চা থেকে বের হয়ে অন্ধকারে হারিয়ে যায়।”

নাটকীয়ভাবে তোপ দখল
খালেদ মাহমূদ পরবর্তী অবস্থা বর্ণনা
করে বলেন—

“আমার জানা ছিল যে, আমাদের বিপরীত
দিক অর্থাৎ পশ্চিম দিকে তাদের বড় তোপটি বসানো রয়েছে। আমি সেটি কব্জা করার জন্য অগ্রসর হই। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে তোপ বসানো মোর্চার একেবারে পশ্চাতে চলে আসি। মোর্চার মধ্যে চারজন সশস্ত্র সৈন্য বসা ছিল। তোপ চালক আগেই পালিয়েছিল। আমার দিকে তাদের পিঠ ছিল – অকস্মাৎ আমি লক্ষ্য করি যে, আমার ক্লাসিনকোভের ম্যগজিন তো (পূর্বের ব্রাষ্টে) শেষ হয়ে গিয়েছে--আমি সৈন্যদের একেবারে মাথার পিছনে দাঁড়ানো।

ম্যগজিন পাল্টানোর চেষ্টা করলে সামান্য শব্দেই তারা সতর্ক হয়ে যাবে। ফলে যতটুকু সময়ে আমি নতুন ম্যাগজিন সংযুক্ত করবো, ততক্ষণে তারা গুলি করে আমার দেহ ঝাঁঝরা করে দিবে --সাথে সাথে আমার মাথায় একটি বুদ্ধি এলো, আমি বিড়ালের মত নিঃশব্দে এগিয়ে তাদের আরও নিকটে গেলাম এবং পিছন থেকে পূর্ণ শক্তি দিয়ে বিকট আওয়াজে বললাম, 'তাসলীম শও” (আত্মসমর্পণ কর)। আল্লাহর কি কুদরত! আমার শব্দ শুনতেই তাদেরকে এতো ভীতি আচ্ছন্ন করে যে, তারা সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে বলে __তাসলীম, তাসলীম, আমরা অস্ত্র সমর্পণ করছি)। আমি পুনরায় (ফার্সী ভাষায়) বলি-_-সবাই উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে পড় এবং অস্ত্র দূরে নিক্ষেপ কর। তারা যন্ত্রচালিতের ন্যায় আমার নির্দেশ পালন করে _-আমি এই সুযোগে দ্রুত ম্যাগজিন পরিবর্তন করে সাথে সাথে, দু' চারটি ফাঁকা গুলি করি _তারা আরো সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তারপর আমার পকেট থেকে কয়েকটি ফিতা বের করে --যা এই নিয়তেই সাথে নিয়েছিলাম __তাদের নিকট নিক্ষেপ করে বলি যে, 'এই ফিতাগুলি তুলে নিয়ে দ্রুত একে অপরের হাত পিছমোড়া করে বেঁধে যেল।” সৈন্যারা বিনা বাক্য ব্যয়ে নির্দেশ পালন করলো। এবার আমি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তাদের ক্লাসিনকোভের ম্যাগজিনসমূহ বের করি এবং এ সৈন্যদেরকে তাদের অস্ত্রসহ সঙ্গে করে সম্মুখে অগ্রসর হই। ইতিমধ্যে অন্যান্য মুজাহিদরা চলে আসে”

***اس دور میں بھو مرد خدا کو ہے میسر***

***جو معجزہ پر بت کو بنا سکتا ہے رائی***

'এ যেও খোদা প্রেমিকগণের সেই মু 'জিযা রয়েছে ,

যা পর্বতকে ক্ষুদ্র সরিষাদানায় পরিণত করতে পারে ।"

## আফগান মুজাহিদদের কার্যকর আক্রমণ

কমাণ্ডার যুবাইয়েরের ওয়ারলেস সেট হারিয়ে যাওয়ার পর থেকে সমস্ত মুজাহিদ দলের সাথে ভার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। সর্বদিকে চরম অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা বিরাজ করছিল। মাওলানা আরসালান খান রহমানী যিনি তাঁর কেন্দ্রের অদূরে দেড়শ আফগান মুজাহিদ নিয়ে সম্পূর্ণ তৈরী অবস্থায় ছিলেন -_অন্যান্য মুজাহিদদলের সঙ্গে ওয়ারলেসে তাঁর যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। কমাণ্ডার যুবায়েরের দলের অবস্থা না জানতে পেরে তিনি চরম দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত ছিলেন।

"কাজী দূররার " পাহাড়ের উপর নাসরুল্লাহ জিহাদ ইয়ার এবং তাঁর সাথীরা তাঁদের মর্টার তোপের নিকটে ঘনিভূত অন্ধকারের মাঝে চরম অসহায় ও অস্থির অবস্থায় দূরবীনের সাঙ্থায্যে পোষ্টের অবস্থা পর্যবেক্ষণের সম্ভাব্য সকল চেষ্টাই করে যাচ্ছিলেন। কিছুসময় গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার পর তাঁরা সেখানকার ফায়ারিংয়ের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ , শব্দ এবং ফায়ারিংয়ের পরিববর্তিত দিক নির্ণয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত হন যে , কিছু মুজাহিদ পোষ্টের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছে এবং সেখানে হালকা অস্ত্র দ্বারা লড়াই

চলছে। নাসরুল্লাহ জিহাদ ইয়ার ওয়ারলেস যোগে মাওলানা রহমানীকে একথা অবহিত করেন। মাওলানা এ সংবাদ পাওয়া মাত্র জামাখোলা পোষ্টের পূর্বে অবস্থিত আফগান মুজাহিদদেরকে ওয়ারলেস যোগে একটি গোপন সিগনাল দেন, আর নিজে তাঁর জানবাজ মুজাহিদদেরকে জিপ ও ট্রাকে তুলে নিয়ে দক্ষিণ দিকের একটি নদী পার হয়ে উরগুন উপত্যকা অতিক্রম করে জামাখোলা পোষ্টের পূর্বদিক অভিমুখে রওয়ানা করেন।

পূর্ব দিক থেকে আফগান মুজাহিদগণ-_যাঁদেরকে সিগনাল দেওয়া তীব্র আক্রমণ করেন। মিসাইল, তোপ ও মেশিনগান ছাড়াও তাঁরা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে ক্লাসিনকোভ দ্বারা ভীষণ ফায়ারিং করেন। ভূমি- মাইনযুক্ত বেড়া এখানেও ছিল, ফলে এরা কেল্লার মধ্যে তো প্রবেশ করতে পারছিলেন না, কিন্তু তাঁদের আক্রমণ এতো মারাত্মক ছিল যে, “আলমখান কেল্লার সৈন্যদের প্রাণ বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়ে। “জামাখোলা পোষ্টের, কথা বিস্মৃত হয়ে তাদের সমস্ত শক্তি এই আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য ব্যয় করতে হয়। যথাসময়ের অত্যন্ত কার্ষকরী এই আক্রমণে কমাণ্ডার যুবাইর ও তার সাথীরা “জামাখোলা পোষ্টে" তাদের আক্রমণ ও তৎপরতা অব্যাহত রাখার সুযোগ পেয়ে যান।

কেন্দ্রীয় পোষ্ট দখল
কমাণ্ডার যুবাইর ও তাঁর সাথীরা ইতিমধ্যে সম্মুখের গুরুত্বপূর্ণ মোর্চাটি দখল করে

নেন। তাঁরা আবেগময় শ্লোগান দিতে দিতে অন্যান্য মোর্চার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। শক্রসেনাদের সর্বাধিক আস্থা ছিল মাইনযুক্ত বেড়ার উপর। তারা যখন এই বিস্ময়কর দৃশ্য দেখতে পেল যে, সে বেড়াও এঁদের পথ রোধ করতে পারেনি এবং এই “নিরাময়হীন ব্যাধি” সম্মুখের মোর্চাসমূহ ধবংস করে বিজয়ের শ্লোগান দিতে দিতে মাথার উপরে চলে এসেছে, তখন অনেক সৈন্য মোর্চা ছেড়ে পালাতে আরম্ভ করে। কমাণ্ডার যুবাইর বলেন_

“আমরা পোষ্ট থেকে আনুমানিক দশমিটার দূরে পৌঁছে দুশমনেরই শূন্যকৃত একটি মোর্চায় পজিশন নেই। আমাদের পিছনে “হিজবুল্লাহ আসছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরব মুজাহিদ “আবুল হারেছ"। তাঁরা দু'জন সেখানে পৌঁছে সম্মুখের ভবনের উপর সাতটি রকেট নিক্ষেপ করেন। যার দ্বারা জামাখোলার প্রধান কমাণ্ডার আহত হয়ে পালিয়ে যায়। তার পালানোর সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সৈন্যদেরও মনোবল ভেঙ্গে যায়। ফলে যে যেদিকে মুখ করেছিল, সে সেদিকেই পালিয়ে যায়।”

কিছু সাথী ভিতরে গিয়ে কামরাগুলো তল্লাশী করে। অবশিষ্টরা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে অপর একটি মোর্চার উপর রকেট নিক্ষেপ করে। বেশ কয়জন সৈন্য সেখানেই লাশের স্তূপে পরিণত হয়। যারা বেচে ছিল, তারা মোর্চার মধ্যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকে। বিজয়ী মুজাহিদরা তাদেরকে সাথে সাথে বন্দী করে নির্দেশ

দেয় যে, “আগে আগে চলো এবং রাস্তা বলে দাও।”

কয়েক দিক থেকে উপধূ্পরি এই আক্রমণের কারণে শত্রসেনাদেরকে এমন ভীতি আচ্ছন্ন করে যে, যে সামান্য কয়েকজন সেনা অবশিষ্ট ছিল, তারাও নিজ নিজ মোর্চা পরিত্যাগ করে পরিখার পথ ধরে পালিয়ে যায়। যারা পালানোর পথ পায়নি, তারা পোষ্টের ভূগর্ভস্থ কক্ষে আত্মগোপন করে। কক্ষগুলো ছিল কিছুটা দূরে দূরে। প্রত্যেক কক্ষের সম্মুখে অত্যন্ত নিচু ছাদের একটি করে বারান্দা ছিল। সেগুলো মোর্চা রূপে ব্যবহার করা হতো। বারান্দা পার হলে ভিতরে একটি করে ভূগর্ভস্থ কক্ষ ছিল। ভীরু সেনারা এখন সেই ভূগর্ভস্থ কক্ষসমূহে লুকিয়ে ছিল। মুজাহিদদের আজকের তীব্র গোলাবর্ষণে বেশ কিছু কক্ষের বারান্দা এবং মোর্চা পূর্বেই ধবংস হয়ে গিয়েছিল।

প্রত্যেক ভূগর্ভস্থ কামরা থেকে অন্য কামরায় যাতায়াতের জন্য ভূগর্ভেই পরিখা বানানো ছিল। মুজাহিদরা বিক্ষিপ্তভাবে ঐ সমস্ত ভূগর্ভস্থ কক্ষসমূহের উপর চড়াও হয়। যে কক্ষই সম্মুখে আসতো, তারা প্রথমে তার উপর রকেট বা হাতবোমা নিক্ষেপ করতো, তারপর ভিতরে প্রবেশ করে জীবিত সৈন্যদেরকে 'বন্দী করতো। এভাবে বহুসংখ্যক সৈন্যই নিহত, আহত ও বন্দী হতে থাকে-_এ সমস্ত তৎপরতার মাঝেই কিছু জানবাজ মুজাহিদ বড় তোপের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু সেদিক থেকে খালেদ মাহমূদকে-_যে পূর্বেই তা কব্জা করেছিল এবং সেখানের শক্র সেনাদের বন্দী করে হাঁকিয়ে নিয়ে আসছিল-_-আসতে

দেখতে পায়। অতএব সকল মুজাহিদ মিলে সমস্ত বন্দীদেরকে এক সাথে বেঁধে ফেলে।

আজ তৃতীয় প্রহর থেকে অকস্মাৎ এ আক্রমণে এখানকার সৈন্যদের মধ্যে কি পরিমাণ ভীতি ও সন্তস্ততা ছড়িয়ে পড়ে, তার কিছু উপাখ্যান এ সমস্ত কক্ষের কতিপয় দৃশ্য থেকে জানা যায়। খালেদ মাহমুদ বলেন যে, একটি কক্ষে টেবিলের উপর কাগজ এবং তার উপর একটি কলম পড়েছিল। কোন এক সৈন্য তার আত্মীয়ের নিকটে পুত্র লিখতে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু তার বাক্যও অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। একটি কক্ষে ভাতের প্লেট রাখা ছিল, তা থেকে মাত্র দুই-তিন চামচ খাওয়া হয়েছিল, চামচটিও সেখানে পড়েছিল। অপর একটি কক্ষে দুধের গ্লাস রাখা ছিল। তার মধ্য থেকে সম্ভবত মাত্র দুই ঢোক দুধ পান করা হয়েছিল। কয়েকটি কক্ষে তাসের কার্ড বিক্ষিপ্তাকারে পড়েছিল যা তাদের পতনের শিক্ষণীয় উপাখ্যান শুনাচ্ছিল।

## অলৌকিক ঘটনাবলী

আজকের লড়াইয়ে নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদগণ একদিকে যেমন বিভিন্ন প্রকারের কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখী হন, অপরদিকে পদে পদে আল্লাহ তাআলার গায়েবী সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতার বিরল-বিস্ময়কর কারিশমাও দেখতে পান। যার দ্বারা তাঁদের ঈমানে সজীবতা ও আবেগে নবশক্তির সঞ্চয় হয়। হযরত মুরশিদ আরেফী (রহঃ)এর ভাষায়_

***اک طرز التفات کرم ہے جفائے دوست***

***دل چاہتا ہے روز نیا امتحان رہے***

বন্ধুর কঠোরতা সে তো করুণার দৃষ্টি ক্ষেপণ ।

মন চায় প্রেমপথে নিত্য -নতুন পরীক্ষা হতে থাক ।”

অতি পুরাতন মুজাহিদ “হিজবুল্লাহ ডোগার” বলেন—

“আমি মাওলানা আবদুর রহমানের সঙ্গে ছিলাম। আরো সম্মুখে অগ্রসর হয়ে আমি তাঁকে হারিয়ে ফেলি। সম্মুখে একটি কক্ষ ছিল। আমি কক্ষের দরজা দিয়ে ভিতরে একটি রকেট নিক্ষেপ করি। কিন্তু রকেট বিস্ফোরণের শব্দ হলো না। আমি বিস্ময়াভিভূত ছিলাম যে, রকেট বিস্ফোরণের শব্দ তো অনেক জোরে হয়ে থাকে, কিন্ত এর বিস্ফোরগের শব্দ হল না কেন? ইতিমধ্যে একটি আহত লোক সেই কক্ষ থেকে বাইরে বের হয়ে আসে। তার পিছনে মাওলানা আবদুর রহমান এবং আরো দু'জন সাথী ছিলেন (যারা তাকে বন্দী করে বাইরে বের করে আনছিলেন) আমার জানা ছিল না যে, তাঁরাও এ কক্ষে রয়েছেন। আমি কক্ষের মধ্যে গিয়ে দেখি রকেটের গোলা ভেঙ্গে গেছে, বিস্ফোরিত হয়নি। সেটি বিস্ফোরিত হলে মাওলানা আবদুর রহমান এবং অন্য সাথীরাও আহত হতেন।”

হিজবুল্লাহ অপর একটি ঘটনা শুনান_

“আমি একটি কক্ষের ঘুলঘুলি দিয়ে ভিতরে একটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করি। গ্রেনেডটি ঘুলঘুলির মধ্যে গিয়ে আটকে যায়। সেটি

কক্ষের ভিতরেও যায় না এবং বিস্ফোরিতও হয় না। অথচ পিন বের করে গ্রেনেড নিক্ষেপ করলে তা" অবশ্যই বিস্ফোরিত হয়। ' বিস্ফোরণ থেকে তাকে কোনভাবেই রক্ষা করা যায় না __পরে জানতে পারি যে , এ ঘুলঘুলির নিকটেই আমাদের মুজাহিদ সাথী ছিলেন। আল্লাহর হুকুমে সেই গ্রেনেড বিস্ফোরিতই হয়নি। ”

সারকথা এই যে , হযরত কাইফী মরহুমের ভাষায় _

***ہجوم درد میں ہر بار یہ ہوا محسوس***
***اک ہاتھ قلب پہ آہستگی کے ساتھ آیا***

“বেদনার ভীড়ে প্রতিবারই অনুভূত হয়েছে
যে , বন্ধুর ) একটি হাত
নীরবে হৃদয়ে নেমে এসেছে ”

হিজবুল্লাহ এখানকার তৃতীয় আরেকটি ঘটনা শুনান _

“কমাণ্ডার যুবাইর আমাকে ও আদিলকে (কেন্দ্রীয় পোষ্টের ) তালা লাগানো কক্ষসমূহ তল্লাশী করার জন্য পাঠান। আমরা কক্ষের দরজায় একটি লাথি মারতেই তা ” ভেঙ্গে দূরে গিয়ে পড়তো। অথচ দরজাগুলি মজবুত এবং ঠিকঠাকভাবে বানানো ,ও লাগানো ছিল। আমার অন্তরে .খেয়াল জাগে যে , দরজাগুলি দুর্বল বিধায় এক লাথিতে ভেঙ্গে যাচ্ছে __তারপর আমি সম্মুখের দুরজায় লাথি মারি , কিন্তু তা , আর ভাঙ্গে না। দুই তিন বার জোরে লাখি মারি , তবুও তা ” ভাঙলো না। আদিলও খুব জোরে জোরে লাথি মারে , কিন্তু তা একটুও নড়াচড়া করে না। সফদরও এসে চেষ্টা

করে। তারপর আমরা তিনজন মিলে চেষ্টা করি , কিন্তু তবুও দরজাটি ভাঙলো না। আমরা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হলে আমার স্মরণ হয় যে, একটু পূর্বে আমার অন্তরে একটি ভ্রান্ত ধারণা এসেছিল , তাই হয়ত আর দরজা ভাঙ্গছে না, তখন আমি সাথে সাথে মনে মনে আল্লাহর কাছে মাফ চাই এবং বলি “হে আল্লাহ ! এই দরজা খুবই মজবুত। আমাদের দ্বারা এগুলো ভাঙ্গে না। আমরা তোমার নুসরাত কামনা করছি। " _- একথা বলে আমি লাথি মারি। সাথে সাথে দরজা ভেঙ্গে দূরে গিয়ে পড়ে ”

***صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم***

***کرتی ہے جو ہر زماں ، اپنے عمل کا حساب***

সেই জাতি ভাগ্যের হাতের তরবারী স্বরূপ

যারা প্রতি মুহূর্তে নিজেদের আমলের হিসাব করে ।”

## সহযোগী পোষ্টসমূহ দখল

কক্ষসমূহের তল্লাশীকালীনই কিছু মুজাহিদ উত্তরের সহযোগী পোষ্টসমূহ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এ পোষ্টদ্রয়ে শুধুমাত্র এক দুইটি করে কক্ষ ছিল। একটি মর্টার তোপ ও তিনটি বড় মেশিনগান পাকা মোর্চার মধ্যে বসানো ছিল। কেন্দ্রীয় পোষ্ট থেকে পলাতক সৈন্যরাও সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল। সেখানকার সৈন্যরা প্রধান পোষ্টের উপর দখল এবং আলমখান কেল্লার উপর আফগান মুজাহিদদের

জানবাজ মুজাহিদ

তীব্র আক্রমণে পূর্বেই ভীত হয়ে গিয়েছিল। পলাতক এই সৈন্যরা তাদেরকে নিজেদের দুরাবস্থার কাহিনী শুনিয়ে আরও হতভম্ত করে দেয়। তাই তাদের জন্য মুষ্টিমেয় মুজাহিদের মাত্র এক দুটি রকেটই যথেষ্ট হয়ে যায়। তারা বেদিশা হয়ে এখান থেকেও পালিয়ে যায়। কয়েকজনকে বন্দীও করা হয়।

মূল পোষ্টের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আসতেই কমাণ্ডার যুবাইর দক্ষিণের পোষ্টের উপর অভিযান চালানোর জন্য আদিল ও খালেদ কয়েকজন জানবাজ সহ প্রেরণ করেন। এ পোষ্টে দুটি মর্টার তোপ এবং ছুটি বড় মেশিন গানের মোর্চা ছিল। সেখান থেকে এখনও পর্যন্ত গোলা নিক্ষেপ করা হচ্ছিল। এ পোষ্টের দক্ষিণ প্রান্তে একটি দৈত্যাকৃতির রাশিয়ান ট্যাংক ভূগর্ভস্থ মোর্চার মধ্যে দাঁড়িয়েছিল। এটি সেই ট্যাংক, যা মুজাহিদদের ইতিপূর্বের সমস্ত আক্রমণের উত্তরে গোলা বর্ষণ করেছে। কয়েক মাস পূর্বে যখন আমরা পোষ্টের উপর আক্রমণ করি, তখনও সে আমাদেরকে লক্ষ্য বানানোর প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়েছে।

কমাণ্ডার যুবাইর সমস্ত বন্দীকে এক জায়গায় বেঁধে রেখে তাদের পাহারার জন্য আবদুল কারীম নদীম এবং আরও কিছু মুজাহিদকে সেখানে রেখে নিজেও দক্ষিণ দিকস্থ পোষ্টকে চূর্ণ করার জন্য গমন করেন। মেগাফোনযোগে তিনি ঘোষণা করেন যে, “সমস্ত সৈন্য অস্ত্র সমর্পণ কর। অন্যথায় সবাইকে যমের ঘাটে পৌঁছে দেওয়া হবে।

_ এখান থেকেও অনেক সৈন্য পালিয়ে যায়। অবশিষ্টরা অস্ত্র সমর্পণ করাকেই নিরাপদ মনে করে। যারা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তাদেরকে তার উপযুক্ত ফল ভোগ করতে হয়। মোটকথা রাতের আনুমানিক বারোটার মধ্যে চারটি পোষ্টই মুষ্টিমেয় এই মুজাহিদদের দখলে চলে আসে। পঞ্চান্ন জন শক্রসেনা বন্দী এবং বারোজন নিহত হয়। অবশিষ্টরা উরগুন ছাউনীর দিকে পালিয়ে যায়।

এখন পর্যস্ত এই বিজয়ী মুজাহিদদের যোগাযোগ অন্যন্য মুজাহিদ দলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ছিল এবং তাদের কেউই মাইনের বেড়া অতিক্রম করতে পেরেছিল না। একমাত্র আবদুল গাফফার কয়েক ঘন্টার অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে পথের মাইনসমূহকে একটি একটি করে অকেজো করে এগারোটার পর বিজয়ী মুজাহিদদের সঙ্গে এসে মিলিত হন।

শহীদ এরং আহত মুজাহিদগণ
চারটি পোষ্ট থেকেই ফায়ারিংয়ের শব্দ বন্দ হলে মাইনের মধ্যে ফেঁসে যাওয়া আহত মুজাহিদরা-যাঁরা এতোক্ষণ পর্যন্ত অবশিষ্ট মুজাহিদদের অভিযানে ব্যাঘাত না ঘটানোর জন্য চরম ধৈর্যের সাথে নীরব হয়ে পড়েছিলেন আওয়াজ দিয়ে নিজেদের দিকে অন্যান্য মুজাহিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আবদুল করীম নদীম ও বখতিয়ার হুসাইন তাঁদের আওয়াজ শুনে অপর একজন মুজাহিদকে বন্দীদের নিকট রেখে সেদিকে রওয়ানা হন।

এখানে এসে তাঁরা দেখেন যে, রিজার্ভ দলের প্রধান মাওলানা আবদুল কাইয়ুম এবং

মেশিনগান দলের আমীর আবুবকরও আহত অবস্থায় সেখানে পড়ে রয়েছেন। তাঁরা কমাণ্ডার যুবায়েরের দলের সঙ্গে এসে মিলিত হওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে মাইনের আঘাতে আহত বিস্ফোরিত হয়, যার আঘাতে আবদুল করীম এবং বখতিয়ারও আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যান এবং আবু বকর পুনরায় আহত হন। তাঁর সারা দেহে মারাত্বক ক্ষতের সৃষ্টি হয়। ইতিমধ্যে কমাণ্ডার যুবাইর সেখানে চলে আসেন। আহত মুজাহিদরা তাঁকে মাইনের নিকট আসতে বাধা দেন। কিন্ত তিনি যে কোন উপায়ে সেখানে পৌঁছে যান। তখন সুশৃংখলভাবে আহত মুজাহিদদেরকে উঠানোর কাজ আরম্ভ হয়। এ কাজে বন্দী সৈন্যদের থেকেও সহযোগিতা নেওয়া হয়।

রহমাতুল্লাহ বাংলাদেশী-__যিনি কমাণ্ডার যুবাইয়েরের দলের মাইন যুক্ত বেড়ায় সর্বপ্রথম আহত হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন, তাঁর পায়ের মধ্যে মাইনের তার জড়িয়ে গিয়েছিল। তাঁকে উঠানোর চেষ্টাকালে একই সময়ে আরও দুর্টটি মাইন বিস্ফোরিত হয়। এই দুর্ঘটনায় একদিকে আদিল, বখতিয়ার ও দু'জন বন্দী মারাত্মক আহত হন, অপরদিকে একটি হৃদয়.. বিদারক মর্মান্তিক ঘটনা এই ঘটে যে, রহমাতুল্লাহ পুনরায় আহত হয়ে শাহাদাতকে বুকে জড়িয়ে বরণ করে নেন। পরদেশী এই জানবাজ মুজাহিদ আজকের লড়াইয়ের একমাত্র শহীদ_ ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন-_হযরত সাইয়্যেদ নাফীস শাহ সাহেব এমন

মুজাহিদদেরকে সম্বোধন করে ঈর্ষাকাতর ঢংয়ে বলেন ___

***مجاهد! ناز کر اپنے مقدر پر کہ توکل کو***

***شهيدان احد كا هم پيالہ هونے والا ہے***

‘হে মুজাহিদ ! তুমি তোমার মহাসৌভাগ্যের জন্য গর্ব কর । কেননা তুমি .

আগামীকাল উহুদের শহীদদের সঙ্গে একই দস্তরখানে আহার করবে ।’

## মাওলানা আরসালান খান রহমানীর দুশ্চিন্তা

মাওলানা আরসালান খান রহমানী ও অন্যান্য মুজাহিদগণ যখন দূর থেকে দেখলেন যে, পোস্টের উপর গুলি বিনিময়ের পর সেখানে নীরবতা ছেয়ে গেছে এবং কমাণ্ডার যুবায়েরের বাহিনী এখন পর্যন্ত যোগাযোগ করেনি, তখন তাঁরা নিশ্চিত হয়ে যান যে , তাঁরা সবাই হয়তো শহীদ হয়েছেন , না হয় বন্দী হয়েছেন। সুতরাং মাওলানা আরসালান খান - রহমানী নিতান্ত দুশ্চিন্তার মধ্যে তাঁর দেড়শ জানবাজ মুজাহিদকে সঙ্গে নিয়ে জামাখোলা পোষ্ট এবং আলমখান কেল্লার মধ্যবর্তী সড়কের নিকট মোর্চা গেড়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। যেন কমিউনিষ্ট সৈন্যরা বন্দী মুজাহিদদেরকে এখান থেকে উরগুনের দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় তাদের উপর আক্রমণ করে মুজাহিদদেরকে ছাড়িয়ে নিতে ' পারেন। ঠিক এমন . সময় কমাণ্ডার যুবাইর মাওলানা আবদুল কাইয়ূমের নিকট থেকে (যাঁকে এইমাত্র আহত অবস্থায় উঠানো

হয়েছে) তাঁর ওয়ারলেস সেট নিয়ে মাওলানা আরসালানের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।.

কমাণ্ডার যুবায়ের বলেন-__ “যোগাযোগ হতেই মাওলানা প্রথম কথা এই বলেন--খালেদ তূমি কোথায়? ভাল আছো তো?” উত্তরে আমি বললাম, “শায়েখ, বিজয় মুবারক"_আবেগে আমার আওয়াজ কেঁপে উঠেঁ_আমি বললাম, 'হযরত আমি এখন জমাখোলা পোষ্টের ট্যাংকের উপর দীড়িয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলছি। সমস্ত পোষ্ট জয় হয়েছে। আপনারা আলমখানের সড়ক ধরে এগ্রিয়ে আসুন। আমরা আপনাদের জন্য সেখান থেকে (বন্দী সৈন্যদের দ্বারা) মাইন অপসারণ করাচ্ছি।”

কমাণ্ডার যুবায়ের তারপর বলেন_

“মাওলানা এসে পৌছলে তিনি আবেগাতিশয্যে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন এবং অনেকক্ষণ পর্যস্ত আদর করতে থাকেন।”

পোষ্টে অবস্থান করায় আমাদের উপর আকাশপথে দুশমনের আক্রমণের আশংকা ছিল। তাই গনিমত স্বরাপ প্রাপ্ত অবিলম্বে স্থানাত্তর যোগ্য অস্ত্রশস্ত্র এবং সামান-রসদ মালে গনিমতেরই একটি ট্রাকে বোঝাই করে যে পথ ধরে মাওলানা আরসালান খান এসেছিলেন সে পথ ধরে “মড়জগাহর" মুজাহিদ ক্যাম্পে প্রেরণ করা হয়। সে ট্রাকেই আহতদেরকে সেখানে পৌছিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। যার ব্যবস্থাপনা পূর্বেই করে রাখা হয়েছিল। মুজাহিদদের বড় একটি দল আলম খান কেল্লা এবং জামাখোলা পোষ্টের মাঝখানে প্রতিবন্ধক হয়ে অবস্থান গ্রহণ করে; যেন দুশমন পুনরায় এই

পোষ্টের দিকে অগ্রসর হতে না পারে – এসর্ব ব্যবস্থাপনার কাজেই অবশিষ্ট রাত অতিবাহিত হয়ে যায়।

শহীদ রহমাতুল্লাহ (রহঃ)
সবারই পূর্ব থেকে ধারণা ছিল যে, এতিহাসিক এ লড়াইয়ে বহুসংখ্যক মুজাহিদ শহীদ হবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আজকের এই মহাসম্মান বাংলাদেশের ১৯ বছর বয়সী সম্ভাবনাময় তরুণ “রহমাতুল্লাহর” ভাগ্যে লিখেছিলেন। তিনি ছিলেন ঢাকার এক মহিমান্বিত দ্বীনি ও ইলমী পরিবারের চোখের মণি এবং হৃদয়ের প্রদীপ। তাঁর পিতা জনাব আহমাদুল্লাহ বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ জামে' মসজিদ বাইতুল মুকাররমের গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্বশীল রয়েছেন। তাঁর দাদা হযরত মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ (রহঃ) হাকীমুল উম্মাত হযরত.মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)এর খলীফা। বাংলাদেশের প্রখ্যাত আলিম ও মাশায়েখদের মধ্যে তিনি বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী। তিনি “হাযেজ্জী হুযূর, উপাধিতে সমধিক পরিচিত।

শহীদ রহমাতুল্লাহ (রহঃ) জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন করাচীতে অধ্যয়নরত ছিলেন। শাহাদাতের মাত্র একমাস পূর্বে তিনি জিহাদে শরীক হন। তারপর করাচী ফিরে আসেন, কিন্তু জীবনের সর্বাধিক স্বাদপূর্ণ এই আমল তাঁর ভেতর ঈমানের এমন মধুরতা এবং কুরবানীর এমন আবেগ সৃষ্টি করে যে, কয়েক দিন পরেই সেপ্টেম্বরে রণাঙ্গনে এসে পূর্ণ এক বৎসর জিহাদ করার জন্য নাম লেখান। তারপর পীড়াপীড়ি করে কমাণ্ডার

যুবায়েরের এই বাহিনীতে শামিল হন__যাকে আজকে সর্ধাধিক বিপদজনক এবং চূড়ান্ত কর্তব্য পালন করতে হবে__-তিনি শাহাদাতের মহাপুরস্কার লাভ করে বিজয় আনন্দ সাথীদের জন্য ছেড়ে যান।

শহীদ রহমাতুল্লাহ (রহঃ) শাহাদাতের তিনদিন পূর্বে স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, “তাঁর দাদা তাঁকে বিবাহ করিয়েছেন,। স্বপ্নটি তিনি তাঁর বন্ধু বখতিয়ারকে শাহাদাতের দিন সকালে শুনিয়ে বলেছিলেন_-“এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমার এই মনে হয় যে, "আজকের লড়াইয়ে আমি অবশ্যই শহীদ হবো, তুমি পিছু হটবে না। আমার বাড়ীর লোকদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে তাদেরকে সাত্ত্বনা দিবে।”

শহীদের পিতাকে যখন ঢাকায় ফোনে তাঁর শাহাদাতের সংবাদ অবহিত করা হয়, তখন তিনি আবেগঘন কণ্ঠে বলেন_-“আমি তাঁর শাহাদাতের বিষয়টি একটি স্বপ্নের মাধ্যমে পূর্বেই অনুমান করতে পেরেছিলাম। আমি ফোনে কথা আরম্ভ করার পূর্বেই উপস্থিত লোকদেরকে আমার মুজাহিদ ছেলের শাহাদাতের খবর দিয়েছি।”

মুজাহিদগণ শহীদের লাশ এ্যাম্বুলেন্সে করাচী পৌঁছান। তারপর বিমানযোগে ঢাকা নিয়ে যাওয়া হয়। জামে” মসজিদ “বাইতুল মুকাররম' ঢাকায় উলামায়ে কেরাম এবং বিশিষ্ট ও সাধারণ লোকদের বিশাল জমায়েত শহীদের জানাযা নামায পড়েন। তাঁকে তাঁর মহিমান্বিত দাদার সমাধি পার্শ্বে সমাহিত করা হয়।

[illegible]

[illegible]

لِلشَّهيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دفعةٍ وَيُرَى مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيُأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَيُحَلَّي حُلَّةُ الْاِيْمَان , ويزوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ, وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ اِنْسَانًا مِنْ أَقْرِبَائِهِ .

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][1]

[1] [illegible]

৫. ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হুরদের সঙ্গে তাঁকে বিবাহ করানো হয়।

2

৬. তাঁর সত্তরজন আত্ত্রীয়ের ব্যাপারে তাঁর সুপারিশ কবুল করা হয়। (ইবনে মাজা শরীফ)

মহাবিজয়
উরগুনের মেরুদণ্ড “জামাখোলা পোষ্ট” বিধবস্ত হওয়ার পর শত্রুপক্ষের জন্য উরগুনে দাঁড়িয়ে থাকা আর সম্ভব ছিল না। তারা এই পরিষ্কার সত্যটি উপলব্ধি করতেই পরদিন সকালে--পহেলা অক্টোবরে__ “আলমখান কেল্লা" থেকে এবং ১২ই অক্টোবরে “নেক মুহাম্মাদ পোষ্ট, এবং পার্শ্ববর্তী অপরাপর পোষ্টসমূহ থেকেও পালিয়ে যায়।

এখন উরগুন ছাউনীর উপর আক্রমণ করতে কোন পোষ্ট প্রতিবন্ধক ছিল না। সুতরাং নতুন পরিকল্পনা মত ১৩ই অক্টোবর মুজাহিদগণ উরগুন ছাউনীর উপর চূড়ান্ত আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেন, ইতিমধ্যে কাবুল থেকে হেলিকপ্টার এসে রাতারাতি ছাউনী থেকে রাশিয়ানদেরকে এবং সেনা অফিসারদেরকে তুলে নিয়ে যায়। অবশিষ্ট বারশ' সৈন্য পলিটিক্যাল এজেন্ট “মাহবুব”, মিলিশিয়া কমাণ্ডার “তাকড়া” এবং ছাউনীর ইনচার্জ ও অন্যান্য অফিসারের সঙ্গে “মোটাখানের' দিকে পায়ে হেটেই পালিয়ে যায়।

2 মুসনাদে আহমাদের রেওয়ায়াতে সেই হুরের সংখ্যা বাহাত্তর জন বলা হয়েছে।

“মোটাখান" 'শারানার” আগের সেনা হেড কোয়ার্টার। হতভাগ্য এই কাফেলা 'ছেরোজার' নিকটে পৌঁছতেই সেখানে ওঁৎপেতে থাকা মুজাহিদ বাহিনী চতুর্দিক থেকে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। শত শত সৈন্য প্রাণ হারায়। অনেককে বন্দী করা হয়। শুধুমাত্র দুইশ" সৈন্য “মোটাখানের" দিকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

ভাগ্য বিড্ম্বিত এই সৈন্যরাও “মোটাখানের' নিকটে পৌঁছে গার্দেয থেকে ওয়ারলেসে নির্দেশ পায় যে, “মোটাখান, একদিন পূর্বেই মুজাহিদরা দখল করে নিয়েছে বিধায় তোমরা এখনকার মত কোথাও পজিশন নিয়ে জান বাঁচাও। আমাদের হেলিকপ্টার তোমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারে।”

মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তি কি না করে থাকে! তারা একটি ভবনে মোর্চা গেড়ে আধাঘন্টা পর্যন্ত আক্রমণকারী মুজাহিদদের সঙ্গে মুকাবেলা করে। তারপর সবাই অস্ত্র সমর্পণে বাধ্য হয়__সারকথা এই যে, উরগুন থেকে পলায়নপর বারশ" সৈন্যের মধ্য থেকে শত শত সৈন্য ও অফিসারকে মেরে ফেলা হয়, অবশিষ্টদেরকে বন্দী করা হয়।

এদিকে উরগুন ছাউনীতে এবং শহরে দলে দলে মুজাহিদ প্রবেশ করে। পলায়নপর সৈন্যরা মাত্র অল্পকিছু হালকা অস্ত্র, ক্লাসিনকোভ, রকেট লাঞ্চার, গ্রেনেড ইত্যাদি সাথে নিয়ে যেতে পেরেছিল। সমস্ত ট্যাংক, সাঁজোয়া গাড়ী, তোপ, মেশিনগান, অসংখ্য হালকা অস্ত, গোলা বারুদ এবং কোটি কোটি টাকার সাজ-সরঞ্জামে পরিপূর্ণ গুদাম অক্ষত অবস্থায় মুজাহিদদের হস্তগত হয়।

"পাকতিকা" প্রদেশের অবশিষ্ট অঞ্চলসমূহ পূর্বেই আযাদ হয়েছিল। ১৩ই অক্টোবর উরগুন বিজয়ের মাধ্যমে এ সম্পূর্ণ প্রদেশ কুফরীর নাপাক পাঞ্জা থেকে মুক্তিলাভ করে।

মুহতারাম , সাইয়্যেদ নাফীস শাহ সাহেব অপর একটি রণাঙ্গনে মুজাহিদদের এমনতর বিজয় দেখে বলেছিলেন —

***بحمد اللہ ، حق کا بول بالا ہونے والا ہے***

***سیاہی چھٹ رہی ہے، اب اجالا ہونے والا ہے***

***یہ کام اہل جنون کا ہے، وہی اسکو سمجھتے ہیں***

***یہ کام اہل خرد سے بالا بالا ہونے والا ہے***

***کوئ کابل میں جا کر یہ نجیب اللہ سے کہہ دے***

***ترا اے روسیاہ! منہ اور کالا ہونے والا ہے***

"আলহামদুলিল্লাহ ! সত্যের ধ্বনি সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ।

এটি খোদাপ্রেমিকদের কাজ , এ কাজ তাঁরাই বুঝে ।

বুদ্ধিমানদের দ্বারাই এ কাজ সম্পন্ন হবে ।

কেউ কাবুলে গিয়ে নাজিবুল্লাহকে বলে দিক যে ,

হে পোড়ামুখী তোর মুখ আরও কৃষ্ণবর্ণ হবে ।

## শরিয়তের বিধানমত গনিমতের মাল বন্টন

এ মহান বিজয়ের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার যে গনিমতের মাল মুজাহিদদের হাতে

আসে, তার বিশেষ বিশেষ সংখ্যা ও পরিমাণ তো পরবর্তীতে আপনারা কমাণ্ডার যুবাইর সাহেবের পত্রে পাঠ করবেন। আমি এখানে এ বিষয়টি তুলে ধরতে চাচ্ছি যে, গনিমতের মাল আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের জন্য পবিত্র এবং হালাল করে দিয়েছেন। কুরআন ও হাদীসে গনিমতের মাল বন্টনের বিস্তারিত বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। যার সারকথা এই যে, সব্পপ্রকার মালে গনীমতের সমষ্টিকে সমান পাঁচ ভাগে ভাগ করে চার ভাগ লড়াইয়ে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে দিবে। অফিসার এবং অধিনস্থ সৈন্য সমান অংশ পাবে। অবশিষ্ট এক-পঞ্চমাংশ বাইতুল মাল অর্থাৎ সরকারী কোষাগারে জমা হবে। জামাখোলা পোষ্ট এবং উরগুন ছাউনী থেকে যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র, ধন-দৌলত ও সাজ-পরঞ্জাম লাভ হয়, সেগুলোকেও শরীয়তের বিধান অনুযায়ী বন্টন করা হয়।

গনীমতের মাল অর্থাৎ যুদ্ধলকু সম্পদ. থেকে চুরি করা- শরীয়তের পরিভাষায় যাকে 'গুলুল' বলা হয় এটা (যুদ্ধলব্ধ মাল আত্মসাতকরণ)__ মারাত্মক গোনাহ। এমনিভাবে কারও জন্য-_-এমনকি খোদ মুজাহিদদের জন্যও__যে যা হাতে পেলো তা নিয়ে নেওয়া জায়েয নাই। এখানে ইমামুল মুজাহিদীন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বিষয়ের একটি হাদীস সুধী পাঠকের সম্মুখে পেশ করছি। অবস্থা ও অবস্থানের দিক থেকে পবিত্র এ হাদীসটির একটি বিরল বৈশিষ্ট্য এই যে, এটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী প্রথম কাবুল বিজেতা হযরত আবদুর

[illegible]

**عَنْ اَبِيْ لَبِيْدٍ قَالَ , كُنَّا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمنِ
بْنِ سَمُرَةَ بِكَابُلٍ, فَاَصَابَ النَّاسُ غَنِيْمَةً,
فَانْتَهَبُوْهَا’ فَقَامَ خَطِيْبًا , فَقَالَ " سَمِعْتُ
رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَنْهَي عَنِ
النُّهْبَي " فَرَدُّوْا مَا اَخَذُوْا , فَقَسَّمَهُ بَيْنَهُمْ"**

[illegible]

কমাণ্ডার যুবায়েরের অবিস্মরণীয় পুত্র আমি উরগুন বিজয়ের মাত্র আটদিন পর কমাণ্ডার যুবাইয়েরের স্বহস্তে লেখা চিঠিটি পাই। সেই চিঠিতে এমনকিছু ঘটনাও লিপিবদ্ধ ছিল, যা এখনও আমি আপনাদেরকে শুনাইনি। সুধী পাঠক, এবার পুত্রটি পাঠ করুন এবং তাঁর বিনয় ও নম্রতার পরিধিও উপলব্ধি করুন__

“মুহতারামুল মাকাম ওয়াজিবুল ইহতিরাম মুকাররমী জনাব

- মুফতী মৃহাম্মাদ রফী” উসমানী যীদা মাজদুহু

আস্সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ

আজ আমি উরগুন ছাউনীর পাদদেশে বসে এই চিঠি লিখছি। হৃদয়ের আকুল বাসনা এই যে, আপনাকে বুকে জড়িয়ে ধরে এই মহান সুসংবাদ আপনাকে শুনাই।. কারণ, উরগুনের প্রকৃত বিজয়ী তো আপনারা । আমি ইতিপূর্বে একটি পত্রে এবং তারও পূর্বে রণাঙ্গনে আপনার উপস্থিতিতে ভাঙ্গাচুরা কয়েকটি বাক্যে বলেছিলাম--“যে ভূখণ্ডে আপনাদের পদধূলী পড়েছে, সেখানে দুশমনের অপবিত্র দেহ' অধিককাল অবস্থান করবে, তা" এ ভূখণ্ড এখন আর কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। আপনাদের সেই পবিত্র পদধুলির বরকতে মুজাহিদগণ বিস্ময়করভাবে উরগুন ছাউনী জয় করেছেন। আপনার সম্মুখে উরগুনের এ মহাবিজয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরার পূর্বে হৃদয়ের এ আকুতিও পেশ করা জরুরী মনে করছি

যে, আপনারা উরগুনের এই ভ্খণ্ডের তৃষ্ণা নিবারণ করুন, যে ভূখণ্ড আজ থেকে কয়েক মাস পূর্বে আপনাদের পদধূলি গ্রহণের জন্য অস্থির ছিল। কিন্তু দুশমনের নাপাক অস্তিত্বের কারণে ভূখণ্ডের এই অংশ আপনাদের দর্শন লাভ করা থেকে বঞ্চিত হয়। আজ ভূখণ্ডের এই অংশ অভিযোগে মূর্তিমান হয়ে উঠেছে। সে কাতরকন্ঠে প্রশ্ন করছে যে, আমার প্রকৃত বিজয়ীরা কোথায়, ধাদের জন্য আমি বহুকাল্ ধরে ছটফট করছি? সেই পবিত্র পদ আমি কবে চুম্বন করতে পারবো?

আমি চাচ্ছি যে, আপনি প্রথম অবকাশেই বিজিত এলাকায় ভ্রমণ করুন এবং উরগুন ছাউনী পরিদর্শন করে অবলোকন করুন যে, কেমন বিরল বিস্ময়কর প্রানিংয়ের মাধ্যমে এই ছাউনী তৈরী করা হয়েছিল। বাস্তবিকপক্ষে ছাউনী দেখার সময় এখনই, পরে তো এগুলো সর্ব ধ্বংসস্তূপে পরিণত হকে_-এবার লড়াইয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরছি।

৩০শে সেপ্টেম্বর শুক্রবারে আমি আমার কয়েকজন জানবাজ মুজাহিদকে সঙ্গে করে জামাখোলার চারটি পোষ্টের উপর যেগুলো উরগুন ছাউনীর পথের শক্তিশালী বাধা ও প্রতিবন্ধক ছিল__ আক্রমণ করি। তিন ঘন্টা ভীষণ লড়াই চলে। পরিশেযে আল্লাহ রাববুল ইজ্জত আপনাদের দুআর বদৌলতে দুশমনকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। আমরা বিজয়ীরূপে পোষ্টে প্রবেশ করি। এ লড়াইয়ে আপনার রূহানী সন্তানেরা বিস্ময়কর কৃতিত্ব সম্পাদন করে, যা নিঃসন্দেহে আপনাদের জন্য শত গর্বের ব্যাপার। হরকতের নিভীকি এক মুজাহিদ

জানবাজ মুজাহিদ
রাশিয়ান সেনাদের উর্দী পরে পোষ্টের মধ্যে প্রবেশ করে এবং ধোকা দিয়ে সমস্ত সৈন্যকে অস্ত্রসমর্পণ করতে বাধ্য করে। একজন কাশ্মীরী মুজাহিদ দুশমনের আসে। এ জাতীয় আরো অনেক ঘটনা ঘটে।
প্রচণ্ড এই লড়াইয়ে একজন মুজাহিদ শহীদ এবং উনির্দেশজন আহতহন। মুজাহিদরা পোষ্টের মধ্যে প্রবেশ করে শত্রদেরকে বন্দী করে এবং সমস্ত রসদপুত্র দখল করে। এ লড়াইয়ে দুশমনের ক্ষয়ক্ষতি এবং গনীমতের মালের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো__
নিহত সৈন্য. ১২ জন
বন্দী সৈন্য ৫৫ জন
ক্লাসিনকোভ ৪৩টি
এন্টিএয়ার ক্রাফট গান ৪টি
বড় কামান ১টি রকেট লাঞ্চার ৩টি ওয়াব্লেস সেট ৬টি

গ্রেনেড ৩০০টি খঞ্জর ৯০টি
বড় গাড়ী ২টি সীজোয়া গাড়ী ১টি তেলের ট্যাংকার ১টি
নগদ টাকা ৪ লক্ষ আফগানী

এতদ্যতীত অসংখ্য এমুনেশন, যা আনুমানিক বিশ ট্রাকেরও বেশী হবে। এর মধ্যে সেনা রসদ, উদী হেলমেট, তুষার বস্ত্র, খাট, কম্বল, বিছানা ও পানাহার সামগ্রী রয়েছে।

. বন্দী সৈন্যদের মধ্যে এগারোজন সেনা অফিসার, একজন 'খাদ-এর এজেন্ট এবং একজন গোয়েন্দা অফিসার রয়েছে। মৃতদের মধ্যে দশজন অফিসার রয়েছে।

জামাখোলার মহাবিজয়ের পর দুশমন ভীত-সন্ত্স্ত হয়ে পড়ে। পরের দিন আরও দুর্টি পোষ্ট তারা খালি করে দেয়। এই বিজয়ের আনন্দে মুজাহিদগণ আরও সম্মুখে অগ্রসর হলে সুপার পাওয়ার শয়তান রাশিয়ার গোমস্তারা দশ বছর সময়ে নির্মাণকৃত দূর্গ সদৃশ উরগুন ছাউনীতেও টিকতে পারেনি। এমনকি তৃতীয় দিনে “আশরেহা, দুর্গ এবং উরগুন ছাউনীতে আযানের ধ্বনি গুপ্তরিত হয়। উরগুন ছাউনীতে প্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সামানার সঠিক অনুমান করা কারো জন্য সম্ভবপর নয়। তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই__

ট্যাংক ১৫টি, সাঁজোয়া গাড়ী ২০টি, অন্যান্য গাড়ী ৮০টি, সেনা রসদের গুদাম, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, তেলের বড় বড় ডিপো, অসংখ্য হালকা অস্ত্র, অগণিত এমুনেশন এবং নিহত সৈন্য শত শত, সশস্ত্র বন্দী ৭০০।

এ সর্ব কিছু আপনাদের আণ্মমন এবং আপনাদের বিশেষ দু'আর বদৌলতে লাভ হয়েছে। আমি আবারও আপনাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছি যে,

প্রথম অবকাশেই বিজিত এলাকাসমূহ পরিদর্শন করুন। ওয়াসসালাম

যুবাইর আহমাদ খালিদ

সিপাহসালার, হরকাতুল জিহাদিল ইসলামী

১২. ১০. ৮৮ ঈসায়ী

প্রায় একমাস পর তেরই নভেম্বর উরগুনের এই মহান বিজেতা-_ লাহোরের পরিচালকের দপ্তরে নতমস্তকে দু'হাটু গেড়ে বসা ছিলেন। তখন তাঁর দর্শনার্থী এবং তাঁর কথা শ্রবণকারীদের দ্বারা কক্ষ ঠাসা ছিল। তিনি কথায় কথায় আল্লাহর শোকর আদায় করতে করতে সেই লড়াইয়ে তাঁর সাথীদের কৃতিত্বের কথা নিম্ন স্বরে বর্ণনা করে শুনাচ্ছিলেন। তাঁর মুখমণ্ডলে সেই নির্মল পবিত্র হাসি, নয়ন যুগলে একই প্লাবন, প্রতিটি শব্দ পরিপূর্ণ আস্থা, ভক্তি ও শ্রদ্ধায় ঢেলে গড়া। পুরো বর্ণনায় কোথাও অহংকার তো দূরের কথা নিজের কোন কৃতিত্বের কথা ইঙ্গিতেও উল্লেখ করেননি__তার যে সমস্ত কৃতিত্বের কথা এ পর্যস্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল এবং ছড়িয়ে পড়েছিল, সেগুলো আমরা তাঁর সাথীদের নিকট থেকে জানতে পারি। এখানে হরকাতুল জিহাদিল ইসলামীর দুইদিন ব্যাপী বার্ষিক ইজতেমায় তাঁরা প্রায় সকলেই আগমন করেছিলেন।

আমাদের প্রশ্নের উত্তরে কমাণ্ডার যুবাইর সাহেক বলেন যে, বর্তমানে' আমাদের

কিছু সাথী গার্দেযে, কিছু খোস্ত এবং কিছু গজনীর রণাঙ্গনে রয়েছে। আমি নিজেও গজনীর "হাকীম সুনায়ী' এলাকায় ছাউনী করে রয়েছি। তিনি সেখানকার লড়াইয়ের অবস্থা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন।

পরদিন ইজতেমা শেষে সমস্ত পাকিস্তানী মুজাহিদকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তাঁরা আগামী কাল ১৫ই নভেম্বর ১৯৮৮ ঈসায়ী থেকে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় ও প্রাদেশিক এসেম্বলীর নির্বাচনসমূহে ভোট দানের পরই নিজ নিজ রণাঙ্গনে চলে যাবে। কারণ, ভোট দেওয়াও একটি আমানত, যা শরীয়তের বিধানে জরুরী।

আমি কমাণ্ডার সাহেবের সঙ্গে বিদায়ী মুসাফাহা করতে করতে জিজ্ঞাসা করি, 'আপনি কোন্ রণাঙ্গনে যাবেন?'

তিনি বললেন, "সীমান্তে পৌঁছে যে রণাঙ্গনে অধিক প্রয়োজন বোধ করবো, সেখানেই চলে যাবো"

এবারেও "আয়াতুল কুরসী" পড়ে তার উপর দম করেছিলাম কিনা তা আর এখন স্মরণ নেই। তবে প্রাচ্যের কবির এই কবিতা জিহ্বার আগায় এসেও কেন যেন থেমে যায় —

***نہیں ساحل تری قسمت میں اے موج***

***ابھر کر جس طرف چاہے نکل جا***

"হে তরঙ্গ ! কুলের সাক্ষাৎ তোমার ভাগ্যলিপি নয়

তাই মস্তক উত্তোলন করে যেদিকে ইচ্ছা চলে যাও !"

শক্রপক্ষের তৃতীয় আঘাত
মুসলিম বিশ্বের হাত থেকে আফগান জিহাদের বিশ্বব্যাপী ফলাফলকে হাইজ্যাক করার জন্য দুশমন শক্তিসমূহ ইতিপূর্বে দটি আঘাত করেছিল। তার প্রথমটি ছিল “জেনেভা সমঝোতা” এবং দ্বিতীয়টি ছিল 'ভাওয়ালপুরের দুর্ঘটনা”। এবার তারা পূর্বের দুটর ন্যায় তৃতীয় চাপিয়ে দিয়ে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মরহুম জেনারেল মুহাম্মাদ জিয়াউল হক তাঁর শাহাদাতের কিছুদিন পূর্বে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনের জন্য ১৬ই নভেম্বর ১৯৮৮ ঈসায়ী তারিখ ঘোষণা করেন। তাঁর শাহাদাতের ৩ মাস পর সেই তারিখেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্ত প্রেসিডেন্ট জিয়াকে রাস্তা থেকে হটিয়ে ইসলামের দুশমনদের আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহ অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে এবং গায়ের জোরে এই নির্বাচনকে ইসলাম, পাকিস্তান ও আফগান জিহাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। নির্বাচন ছিল পাকিস্তানীদের এবং তা" অনুষ্ঠিত হচ্ছিল পাকিস্তানে, কিন্তু নির্বাচনী তৎপরতা চালানো হচ্ছিল আমেরিকা, বৃটেন, 'রাশিয়া ও ভারতে। তাদের শক্তিশালী প্রচার মাধ্যমসমূহ সম্পূর্ণ নির্ভীকভাবে তাদের কাংখিত দলের প্রচারাভিযান পূর্ণ জোরেশোরে চালিয়ে যাচ্ছিল। তাদের গোমস্তারা পাকিস্তানে নিজেদের দক্ষতা দেখিয়ে যাচ্ছিল। ভীতি প্রদর্শন, লোভ দেখানো এবং শৈল্পিক প্রোপাগাণ্ডার এমন কোন অস্ত্র হয়তো বাদ ছিল না, যা তারা

প্রয়োগ করেনি। বরং নির্বাচনের পরেও ঠিক সরকার গঠনের সময় আমেরিকার দু'জন মন্ত্রী ইসলামাবাদে ডেরা ফেলে বসেছিল। এ সমস্ত কোন্ পথে চেষ্টা চালিয়ে নিজেদের কাংখিত সরকারকে অতি মামুলী, বরৎ তথাকথিত সংখ্যা গরিষ্ঠতার নামে পাকিস্তানের উপর চাপিয়ে দেয় সে এক শিক্ষণীয় উপাখ্যান। মুসলিম বিশ্বের জন্য প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের শাহাদাতের আঘাতের চেয়ে এ আঘাত কোনভাবেই কম ছিল না। কারণ, এর মাধ্যমে পাকিস্তানের উপর ত্রিমুখী আক্রমণ করা হয়েছিল।

আক্রমণের প্রথম দিক ছিল এই যে, একটি মুসলিম দেশ দ্বারা তার ইতিহাসে এই প্রথমবার ইসলামী রাজনীতি আইনের সুস্পষ্ট এ মূলনীতির বিরুদ্ধাচারণ করানো হয় যে, “কোন নারীকে সরকার প্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধান বানানো জায়েয নাই।”

আক্রমণের দ্বিতীয় দিক ছিল এই যে, পাকিস্তানের মত মতাদর্শের ধারক এবং খোদাপ্রদত্ত এই দেশের উপর অত্যন্ত চতুরতা ও নির্লজ্জতার সাথে একটি সেকুলার সরকার চাপিয়ে দেওয়া হয়। যা দেশ ও জাতির মতাদর্শ ও লক্ষ্যসমূহের সঙ্গেই যে শুধু সঙ্গতিহীন ছিল তা নয়, বরং তা ছিল এখানকার আইন ও এঁতিহ্যেরও পরিপন্থী। জনসাধারণের প্রকৃত সমস্যার সমাধান ও তাদের ইচ্ছার বাস্তব্য়নের পরিবর্তে তাদের দৃষ্টি ছিল ভিনদেশী “কৃপাশীলদের' প্রতি নিবদ্ধ।

তৃতীয় দিক ছিল এই যে, আফগান জিহাদের ফলাফলকে এর মাধ্যমে অতি দ্রুত নিচ্ক্রিয় করা হতে থাকে। পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে মুজাহিদদেরকে নির্বান্ধব ছেড়ে

দেওয়া হয়। পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমসমূহের মত এখানকার প্রচার মাধ্যমসমূহও মুজাহিদদের ইতিহাস বিনির্মাণকারী তৎপরতাসমূহকে ব্লাক আউট করে রাখে। যার মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে একথা বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করা হয় যে , আফগানিস্তানের জিহাদ কোনরূপ ফলাফল অর্জন না করেই পুরাতন কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। এভাবে পাকিস্তান ও মুজাহিদদের মাঝে ভ্রাতৃসুলভ সম্পর্ককে নষ্ট করার এবং পাকিস্তান বরং মুসলিম উম্মাহকে এই জিহাদের ফলাফল থেকে বঞ্চিত করার অপকৌশল চালানো হয়। .

কিন্তু চরম অসহায়ত্ব ও ধৈর্যসংকুল জটিলতা সত্ত্বেও মুজাহিদদের দৃঢ় প্রত্যয়ে কোনরূপ পার্থক্য সৃষ্টি হয়নি। তাঁদের দৃঢ়সকল্পে সামান্য কোন অব্যাহত থাকে। ছোট ছোট বিজয়ও লাভ হতে থাকে। তাদের অগ্রগতি অবশ্যই শিথিল হয় এবং শহীদ ও আহতদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে , কিন্তু তাঁরা জান বাজি রেখে অগ্রগামিতা অব্যাহত রেখে মুসলিম বিশ্বকে বরাবর এই পয়গাম দিতে থাকে _

***مانا کہ وفا جرم ہے اس دور ہوس میں***
***ہم اہل جرم یہ کرتے ہی رہیں گے!***

“স্বীকার করি যে , প্রবৃত্তির আনুগত্যের
এই যুগে “অফাদারী ’ অপরাধ বটে।

কিন্তু আমরা 'অফাদাররা ” এ অপরাধ করতেই
থাকবো।”

উরগুন বিজয়ীদের সঙ্গে শেষ সাক্ষাত
২৭শে ডিসেম্বর ১৯৮৮ ঈসায়ীর দিনটি
আগমন করলে আফগান ভাইদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশের জন্য 'হারকাতুল জিহাদিল ইসলামী” করাচীর একটি হোটেলে পরের 'দিন জিহাদ কনফারেন্সের আয়োজন করে। (কেননা রাশিয়ার হিং সৈন্যরা নয় বৎসর পূর্বে এ তারিখেই আফগানিস্তানে প্রবেশ করেছিল।)

এতদিনে রাশিয়ার বেশীর ভাগ সৈন্য আফগানিস্তান থেকে পলায়ন করেছিল। অবশিষ্ট সৈন্যরাও রাশিয়ার ঘোষণাকৃত প্রোগ্রাম অনুযায়ী ১৫ই যেব্রুয়ারী ১৯৮৯ ঈসায়ীর মধ্যে “বাড়ী যেরার" জন্য অস্থির এবং পথের বিপদের ভয়ে কম্পমান ছিল। কারণ, পথে পথে মুজাহিদদের চাবুক এ পলাতকদের উপরও দ্রুত বর্ষিত হচ্ছিল।

“ করাচীর এই কানফারেন্সে আমার দৃষ্টি এমন একজন মুজাহিদকে অন্বেষণ করে ফিরছিল, যে এইমাত্র রণাঙ্গন থেকে এসেছে এবং সেখানকার নগদ খবরাখবর বলতে পারে। আশাতীতভাবে আমি দেখতে পাই যে, ইশার নামাযের সময় আমার বয়ান শেষ হতেই কমাণ্ডার যুবাইর সাহেব স্মিত হাস্যে দ্রুত এগিয়ে আসছেন। আমার নিকট -এসে তিনি আদবের সঙ্গে সালাম করেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুআনাকা করেন। অপ্রত্যাশিত এই সাক্ষাত লাভে অন্তরে যে অপার্থিব আনন্দ ও পুলকের তরঙ্গ দোল খায়, তা” ভাষায় ব্যক্তি করা সম্ভব নয়_-তাঁকে

এখনই মুজাহিদদের অপর একটি সমাবেশে যোগদানের জন্য “আল্লামা বানূরী টাউন” যেতে হবে।

সকালবেলায় আমার বাংলাদেশ সফরে যাত্রা পূর্ব নির্ধারিত ছিল। সেজন্য আমি এ সমাবেশে অংশগ্রহণ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছিলাম। তিনি স্বভাবসুলভ হাসি-খুশী ও প্রশান্ত ছিলেন। পাকিস্তানের হৃদয়বিদারক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রসমূহের কারণে কোন হতাশা তাঁর মধ্যে ছিল না। তাঁকে পূর্বাধিক দৃঢ় সংকল্প দেখতে পাই। তাঁর বক্তব্য এই ছিল যে,. সমগ্র বিশ্বের তাবৎ শক্তিসমূহ একত্রিত হয়ে যত ষড়যন্ত্র করুক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে অবিচল থাকার সৎসাহস থাকবে এবং শাহাদাতের বাসনা জীবন্ত থাকবে, ততক্ষণ পর্যস্ত এ সমস্ত শক্তি একত্রিত হয়েও জিহাদকে বন্ধ করতে পারবে না এবং বিজয় শাহাদাতের প্রেমে উন্মত্তদেরই পদচুম্বন করবে।

তিনি বলেন যে, তাঁর সমস্ত সাথীদেরকে__যারা উরগুন বিজয়ের পর থেকে গজনী, গার্দেয ও খোস্তের রণাঙ্গনসমূহে যুদ্ধরত আছেন-_ খোস্তের রণাঙ্গনে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যেন সেখানকার অগ্রাভিযানের গতি বৃদ্ধি করা যায়। কারণ, গজনী এবং গার্দেযের পূর্বে খোস্তকে মুক্ত করা জরুরী। এটি অত্যন্ত কঠিন রণক্ষেত্র অবশ্যই, কিন্ত এটি বিজয় হলে সম্মুখের পথ সুগম হবে।

তিনি বলেন যে, আজই তিনি রণাঙ্গন থেকে করাচী এসে পৌঁছেছেন। সকালের বিমানে মুলতান যাবেন। কয়েকদিন বাড়ীতে অবস্থান করে খোস্ত চলে যাবেন। সেখানে বড় ধরনের একটি আক্রমণের জোর প্রস্তুতি চলা অবস্থায় তিনি চলে এসেছেন।

তখনো তিনি কথা বলছেন এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলে যে, নিচে সাথীরা গাড়ীর মধ্যে বসে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। আমরা বাধ্য হয়ে উঠে দাঁড়াই। মুয়ানাকা করে তাকে বিদায় জানাই। তাড়াহুড়ার মধ্যে আয়াতুল কুরসী পড়ার কথাও ভুলে যাই।

রাশিয়ার অধিকৃত মুসলিম দেশসমূহ কমিউনিজম. ও সোশালিজম- যা মানব প্রকৃতি, সুস্থবুদ্ধি ও সমস্ত দ্বীন-ধর্মের পরিপন্থী একটি চরমপন্থী ও অত্যাচারী জীবন ব্যবস্থা। যার ভিত্তিই রাখা হয়েছে আল্লাহকে অস্বীকার, শ্রেণীভিত্তিক শক্রতা ও বিদ্বেষ এবং ব্যক্তি স্বাধীনতাকে গলা টিপে হত্যা করার উপর। বিধায়, স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে কোথাও এ ব্যবস্থাকে গ্রহণ করা হয়নি। সর্বপ্রথম সোশালিষ্ট বিপ্লব_যা রাশিয়ায় জার শাহীকে সিংহাসনচ্যুত করে ১৯১৭ ঈসায়ীতে ঘটানো হয়__নিজেই জুলুম ও হিংস্রতার লোমহর্ষক এমন এক উপাখ্যান যে, তার সম্মুখে জারশাহীর জুলুম-নির্যাতনও লজ্জায় মুখ লুকায়। ঐ সময় থেকে আরম্ভ করে আফগানিস্তানে সৈন্য প্রবেশ করানো পর্যন্ত রাশিয়ান কমিউনিষ্টরা যে সমস্ত দেশ ও জাতিকে লুণ্ঠন করে, তার মধ্যে

ধোকাবাজি এবং চরম পর্যায়ের রক্তারক্তিকেই সর্ববৃহৎ “কর্মকৌশলের” গুরুত্ব দেওয়া হয়।

রাশিয়ান কমিউনিজম এই অস্ত্রদ্বয়কে প্রয়োগ করার মাধ্যমেই এশিয়া ও ইউরোপের লক্ষ লক্ষ বুযুর্গকিলোমিটারব্যাপী বিস্তৃত ২৯টি মুসলিম দেশকে অপহরণ করে। এ সমস্ত দেশ কৃষি ও খনিজ উপাদানসমূহে সমৃদ্ধশালী হওয়া ছাড়াও মুসলিম বিশ্বের উচ্চস্তরের মানবপ্রসবা এলাকা সম্বলিত। তার মধ্য থেকে পাঁচটি দেশ “মাওয়ারাউন নাহার, এর (মধ্য এশিয়ার), তেরটি ককেশাশ এলাকার এবং অবশিষ্ট এগারোটি এশিয়ার অন্যান্য এলাকা ও ইস্টররোপে অবস্থিত। অধিকৃত এ সমস্ত দেশ থেকে মুসলমানদের বীজ (বংশ) মেরে ফেলার জন্য প্রাণাস্তকর প্রচেষ্টা চালানো সত্বেও আলহামদুলিল্লাহ মুসলমানগণ আজও এ সমস্ত দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এ সমস্ত অঞ্চল থেকে ইসলামী এতিহ্যসমৃহ এবং মুসলিম সভ্যতার নিদর্শন ও প্রতীকসমূহকে সম্ভাব্য সকল অত্যাচার সত্ত্বেও বিলুপ্ত করা যায়নি।

তবে বিগত সত্তর বছর ধরে এ সগ্স্ত ইসলামী ভূখণ্ডে জুলুম-অত্যাচারের যে নিকষ অমানিশা আচ্ছন্ন হয়ে আছে, সেই অন্ধকারে লুটেরা দল তাদের বর্ণলিপি পর্যন্ত পরিবর্তন করে ফেলে, যেন মুসলমানদের যোগসূত্র তাদের মর্যাদাপূর্ণ অতীত ইসলামী ঐতিহ্যসমূহ এবং বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম দেশ্সমূহ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে । বংশ ও গোত্রের ভিত্তিতে একেকটি দেশকে খণ্ড খণ্ড করে সেগুলোর নাম

পরিবর্তন করে ফেলা হয়। যেসর্ব দেশের পুরাতন নাম বহাল রয়েছে সেগুলির সীমানা পরিবর্তন করা হয়। ডাকসহ সর্বপ্রকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে তাদেরকে স্বাধীন বিশ্ব থেকে এমন মারাত্মকভাবে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয় যে, মুসলিম বিশ্বের বর্তমান প্রজন্ম তাদের অনেকগুলির নাম সম্পর্কেও অবগত নয়। এমনকি চেষ্টা-তদত্ত করে সে সমস্ত দেশ সম্পর্কে অবগত হওয়াও সহজসাধ্য নয়।

রক্তাক্ত হৃদয়ে এখানে এ সমস্ত মুসলিম দেশসমূহের নাম সংক্ষিপ্ত পরিচিতিসহ বিশ্বের বর্তমান মানচিত্র অনুপাতে লিপিবদ্ধ করছি। যাতে করে আমরা আমাদের জীবনে সেগুলিকে স্বাধীন হতে দেখতে না পেলেও এবং এসর্ব দেশের কাজে আসতে না পারলেও কমপক্ষে মহান আল্লাহর দরবারে অনুতাপের অশ্রু প্রবাহিত করার যোগ্য হই।

3

3

. রাশিয়ার অধিকৃত মুসলিম দেশ এবং রাজ্যসমূহের এই তালিকা প্রস্তুত করতে আমার ব্যক্তিগতভাবে জানা তথ্যসমূহ এবং অন্যদের থেকে সংগৃহীত তথ্যসমূহ ছাড়া নিম্নোদ্ধত উৎসসমূহ থেকে সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে-_
ইসলামী বিশ্ব কোষ --- উর্দূ, ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, মাসিক ‘চেরাগে রাহ’ করাচী__সোশালিজম সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৬৭ সংখ্যা-১০, ভলিউম ২১, রাবেতায়ে আলমে ইসলামী কর্তৃক প্রকাশিত "মুসলিম বিশ্বের মানচিত্র' জিলহজ্জ ১৩৯৩ হিজরী ডিসেম্বর ১৯৭৩ ঈসায়ী ও বিশ্বের অন্যান্য ভৌগলিক মানচিত্র ও এটলাস।

ককেশাশ অঞ্চলের মুসলিম দেশ ও রাজ্যসমূহ
১. আজারবাইজান, রাজধানী বাকু।
২. কারাবাখ (কোরাবাগ)।
৩. নখচোয়ান।
৪. শিশান (চেচনিয়া), রাজধানী গজনী।
৫. অঙ্গাশ জেঙ্গাশতিয়া), রাজধানী নজরান।
৬. ইসিতিয়া (ওয়াস্তিন)।
৭. দাগিস্তান, রাজধানী মহজকেল্লা। (
৮. কাবরদা (কবারদিয়া)।
৯. কারাচায়ী।
১০. চারফিসিয়া আল জারকাসিয়া)।
১১. আর্মেনিয়া, রাজধানী ইরিওয়ান।
১২. জারজিয়া, রাজধানী তিফিলিস।
(চেচনিয়ার প্রধান মুফতী শাইখ মুহাম্মাদ হুসাইন আমাকে সরাসরি বলেন যে, এখন এই দুটি দেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু রয়েছে, অথচ রাশিয়ানরা দখল করার পূর্বে তারা সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল।)
১৩. ক্রাসনোদার।(KRASNODAR)
ককেশাশ অঞ্চলের দেশসমূহের সর্বমোট অধিবাসী এক কোটি এবং মুসলিম অধিবাসী ৬২% (

4
)

4 এখানে উল্লেখিত জনসংখ্যা এবং এই তালিকায় উল্লেখিত অন্যান্য জনসংখ্যাসমূহও “নকশায়ে আলমে ইসলাম" মুসলিম বিশ্বের মানচিত্র) থেকে সংগৃহীত। যা বিশ্ববিখ্যাত আন্তর্জাতিক ইসলামী সংগঠন

মধ্য এশিয়ার মুসলিম দেশসমূহ

ক্রমিক নং- দেশ -- রাজধানী – প্রসিদ্ধ শহর -- মোট জনসংখ্যা মুসলিম জনসংখ্যা

১৪. উজবেকিস্তান, তাসখন্দ, ফারগানা, তিরমিয, ৮৫,০০,০০০, ৮৮%

১৫. তাজিকিস্তান, দোশাম্বে, ৩,০০,০০০, ৯৮%

১৬. তৃর্কেমেনিস্তান, এশ্কাবাদ, মরভ, ২০,০০,০০০, ৯০%

১৭. কাজাকিস্তান, আলমায়াতা, ৯০,০০,০০০, ৯৮%

১৮, কার্গেজিস্তান, ফ্রুন্স,৩৫,০০,০০০, ৯১%

অন্যান্য মুসলিম দেশসমূহ

ক্রমিক দেশ রাজধানী প্রসিদ্ধ মোট মুসলিম

নং শহর জনসংখ্যা জনসংখ্যা

রাবেতায়ে আলমে ইসলামী ১৯৭৩ ঈসায়ীতে বৈরুত থেকে প্রকাশ করে। এছাড়া অন্যান্য উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যসমূহের উদ্ধৃতি যথাস্থানে তুলে ধরা হয়েছে।

১৯. উত্তুরাখান(

5

) উত্তরাখান
৩,১৯,২৭৮ ৫৩%

(দেশ ও রাজধানীর নাম একই)

২০. আওরনবরগ আওরনবরগ (ঐ) ১০,০০,০০০

মুসলমানদের
নাম ভিন্নভাবে লেখা নেই।

২৯ বাশকিরিয়া আওফা ৪,০০,০০০ ৬০%

২২. তাতারিয়া কাজান ৩৫,০০,০০০ ৬৫%

২৩. উমরাতিয়া ২০,০০,০০০ ৫৫%

২৪. মারিয়া (মারি ৭,৫০,০০০ ৫৫%

২৫. মারদুভিয়া (মারদোভ) ১২,৫০,০০০ ৫২%

২. চৌভাশ ১৫,০০,০০০ ৬০%

২৭. কারিমিয়া ৫০,৫০,০০০ ৫৩%

5 উত্তরাখানের জনসংখ্যার এই পরিমাণ আরবী বিশ্বকোষ (পৃষ্ঠা ৩৮৮ ভলিউম ৩), ১৮৬৭ ঈসায়ী এর আদম শুমারী অনুযায়ী দিয়েছে। বর্তমানের জনসংখ্যা নিশ্চয়ই এর চেয়ে অনেক বেশী হবে। সুতরাং উর্দু ইসলামী বিশ্বকোষ পৃঃ ৫৭৮ স্ব-২ শুধুমাত্র তার রাজধানীর জনসংখ্যা ১৯৩৯ উসায়ীর আদম শুমারী অনুযায়ী ২৫৩,৬৫৫ উল্লেখ করেছে।

(যা ইউরোপের ইয়ুক্রাইন এর সঙ্গে সংযুক্ত)

এই সাতাশটি মুসলিম দেশ ও রাজ্যকে রাশিয়ানরা সোভিয়েত - ইউনিয়নের অংশ বানিয়েছে। এছাড়া ইউরোপে আরও দুটি মুসলিম দেশ রয়েছে। একটি আলবেনিয়া ও অপরটি বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা। এই দুই দেশে এখনও মুসলমানরা সংখাগরিষ্ঠ। চারশ, বছরের অধিক কাল মুসলমানরা সেখানে শাসন চালিয়েছে। বলকানের যুদ্ধের পর (৯১২-১৩) এই দুই দেশ উসমানী খেলাফতের হাতছাড়া হয়ে যায়। নতুন অমুসলিম সরকারসমূহের অযোগ্যতা ও অবিচারের ফলে দীর্ঘদিন পর্যন্ত দেশটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুরাবস্থার শিকার থাকে। যারফলে এখানে ক্রমশ কমিউনিজমের প্রভাব পড়ে। অতঃপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে ১৯৪৫ ঈসায়ীতে রাশিয়ার সাহায্যে তাদের উপরও কমিউনিষ্ট পার্টির রক্তাক্ত শাসন চেপে বসে। আইনও মৌলিকভাবে রাশিয়া থেকেই নেওয়া হয়। লোমহর্ষক নির্যাতনের যে রক্তাক্ত যাতাকলে রাশিয়ার অন্যান্য অধিকৃত দেশসমূহ নিষ্পেষিত হচ্ছিল এরাও সেই একই রকম নির্যাতনের শিকার হয়। তবে এদেরকে রাশিয়ান ফেডারেশন বা সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি।

আলবেনিয়ার রাজধানী “তিরান, (11576) সেখানকার মুসলিম অধিবাসী ৭০%। এই দেশটিকে ১৯৬০ ঈসায়ী পর্যন্ত সেখানকার কমিউনিষ্ট ছিন্ন করে ১৯৬৩ ঈসায়ী থেকে ১৯৭৮ ঈসায়ী পর্যন্ত চীনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। ১৯৭৮ ঈসায়ীতে একে নতুন আইনের

অধীনে “পিপলস সোস্যালিষ্ট রিপাবলিক, সাব্যস্ত করা হয়। শাসন ক্ষমতা তখনো কমিউনিষ্ট বাহিনীর হাতেই থাকে।

বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার উপর ১৯৪৫ ঈসায়ীতে মার্শাল টিটো__যে কট্টর কমিউনিষ্ট ছিল--দখল বসিয়ে তাকে যুগোশ্লাভিয়া ফেডারেল রিপাবলিক এর অঙ্গ বানায়। এই রিপাবলিকটি কমিউনিষ্ট পার্টির অধীনে নিম্নোদ্ধৃত গণতান্ত্রিক দেশসমূহের সমনৃয়ে ছিল। ১. বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা ২. সার্বিয়া ৩. ক্রোয়েশিয়া 8. স্লোভেনিয়া ৫. মাউন্টিনিগ্রো ৬. মাখদুনিয়া। মার্শাল টিটো ছয়টি দেশের সম্মিলিত যুগোশ্লাভিয়ার ডিক্টেটর সাব্যস্ত হয় এবং পরবতীঁতে “জোট নিরূপেক্ষ আন্দোলনের, প্রতিষ্ঠাতা হয়।

বসনিয়া ও হার্জেগোভিনায় ১৯৫৩ ঈসায়ীর আদমশুমারী অনুযায়ী

জনসংখ্যার হার ছিল নিম্নরূপ__(6

)

6 ইসলামী বিশ্বকোষ উর্দু ধাতু “বসনিয়া' পৃঃ ১৮ খ-
৫। এখানে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দেওয়া জরুরী যে, এই আদম শুমারীতে ১০.৩/ লোক জাতীয়তা পরিচয় বহির্ভূত লিপিবদ্ধ রয়েছে। এদের প্রায় সবাই মুসলমান। তারা নিজেদেরকে সার্ব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করতেও প্রস্তুত নয় এবং ক্রোট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত করতেও রাজী নয়। এরা পৃথক মুসলিম সম্প্রদায়ের দাবিদার। কিন্তু টিটোর সরকার ধর্মের ভিত্তিতে কোন জাতীয়তাকে স্বীকার করতো না বিধায় আদম শুমারীতে এদেরকে সম্প্রদায় বহির্ভূত ঘরে লিপিবদ্ধ করা হয়। যদিও পরবর্তীতে মুসলিম জাতির পৃথক অস্তিত্ব মেনে নেওয়া হয়। '

১. মুসলমান ৪২.৬% (7

)

২. সার্ব ৩৫.১% (এরা অর্থোডক্স স্বীষ্টান দলের অন্তর্ভূক্ত। তারা “ক্রোটস' এর ধর্মীয় ও বংশীয় শত্রু)

৩. ক্রোট ২১.৪% (এরা রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান দলের অন্তর্ভূক্ত) অবশিষ্টরা অন্যান্য জাতির লোক।

সারাজিভো (988/45 ০) এ দেশের রাজধানী এবং বাহাচ ত্রাউংক, মুস্তার ও তাজলা এখানকার প্রসিদ্ধ শহর।

সারকথা এই যে, অনেক খোঁজাখুজির পর
আমি উপরোক্ত মোট ২৯টি দেশ ও রাজ্য সম্পর্কে খোঁজ পেয়েছি, যেগুলো রাশিয়ান কমিউনিজমের অন্ধকার ও সংকীর্ণ পিঞ্জিরায় বন্দী রয়েছে। আরও অনুসন্ধান করলে এ ধরনের আরও কিছু দেশ ও রাজ্য উদঘাটিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এ সমস্ত দেশ-ও রাজ্যে কমিউনিজমকে পদে
পদে তীব্র প্রতিরোধের মুখোমুখী হতে হয়েছে। যদিও সেখানকার মুসলিম শাসকগণ. তাদের সম্মুখে অস্ত্র সমর্পণ করেছে, কিন্তু সেখানকার জনসাধারণ উলামায়ে হকের নেতৃত্বে তাদের সঙ্গে বছরের পর বছর ধরে

7 এতে এ সমস্ত মুসলমান অন্তর্ভূক্ত রয়েছে, যাদেরকে ১৯৫৩ ঈসায়ীর আদম শুমারীতে জাতীয়তা বহির্ভূত লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল এবং এর মধ্যে এ সমস্ত মুসলমানও শামিল রয়েছে, যারা নিজেদেরকে বংশগতভাবে সার্ব বা ক্রোট বলে থাকে কিন্তু ধর্ম ও বিশ্বাসের দিক থেকে মুসলমান দাবী করে।

লড়াই করেছে। এ কারণেই রাশিয়ার রক্তপায়ী ভল্লুকদেরকে আফগানিস্তান পর্যস্ত পৌঁছতে ৬২ বছর সময় লেগেছে। তারা এখানে এসে পৌঁছতে পৌঁছতে রাশিয়ান কমিউনিজম বার্ধক্য উপনীত হয়।

এ সমস্ত এলাকা শত শত বছর ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতির লালন কেন্দ্র এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের পতাকাবাহী ছিল। বিশেষত মধ্য এশিয়ার (মাওয়ারাউন নাহার) ভূখণ্ড তো স্পেনের চেয়েও অধিক অগ্রসর হয়ে শত শত বছর ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র ছিল। কিন্তু এ সমস্ত এলাকাকেও স্বাধীন বিশ্ব থেকে এমন মারাত্মকভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল যে, স্পেনের বিপরীতে তাকে সমবেদনা জ্ঞাপনের জন্য একথা বলারও কেউ ছিল না —

***پهر تیر□ حسینوں کو ضرورت □□ حنا کی؟***

***باقی □□ ابهی رنگ مر□ خون جگر میں!***

"তোমার রূপসীদের কি মেহেদীর প্রয়োজন রয়েছে?

আমার কলিজার লহুছতে এখনও রঙ অবশিষ্ট রয়েছে"

মাওয়ারাউন নাহার এলাকা “মাওয়ারাউন নাহার, আরবী শব্দ, যার অর্থ 'নদীর ওপার,। “ নাহার" নেদী) দ্বারা এখানে আমুদরিয়াকে বুঝানো হয়েছে। যার প্রাচীন নাম ছিল “জাইহুন'। এই নদীটি আফগানিস্তানকে রাশিয়ার হাতিয়ে নেওয়া মুসলিম রাজ্যসমূহ থেকে পৃথক করে দিয়েছে। নদীর দক্ষিণে আফগানিস্তান এবং উত্তরে “নদীর ওপার, মোওয়ারাউন নাহার) এর দেশসমূহ-_যথা, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান ও তৃর্কেমেনিস্তান। এগুলোর পশ্চাতে উত্তরে কাজাকিস্তান এবং কার্গেজিস্তান। মধ্য এশিয়ায় অবস্থিত'এই পাঁচটি দেশকে রাশিয়ার আধিপত্যের পূর্বে পশ্চিম তৃর্কিস্তান বলা হতো।

8

এ সমস্ত অঞ্চল খনিজ সম্পদ, কৃষিজাতদ্রব্য এবং টেকনোলজি দ্বারা সমৃদ্ধশালী হওয়া ছাড়াও ইসলামের ইতিহাসের যুগ নির্মাণকারী মহান ব্যক্তিত্বদের মাতৃভূমি ছিল। মহামানবপ্রসবা এ সমস্ত অঞ্চল থেকে মুসলমান দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক, জগৎবিখ্যাত শাসক, রাজনৈতিক নেতা, সেনা

8 অপরদিকে পূর্ব তুর্কিস্তান, যার নাম দেওয়া হয়েছে “সিংকিয়াৎ' কমিউনিষ্ট চীনের দখলদারিত্বে রয়েছে। তার প্রাচীন প্রসিদ্ধ শহর কাশগার ও খতন এবং রাজধানী উরুমুচী। এখন এটিকে চীনের সর্ববৃহৎ প্রদেশ বলে গণ্য করা হয়, বরং এটিকে বিম্বের সর্ববৃহৎ প্রদেশ বলা হয়। এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ_-যারা মূলত তৃকী,বংশধর-__মুসলমান। একেও গণ্য করা হলে কমিউনিষ্ট দখলদারিত্বের শিকার মুসলিম দেশসমূহের সংখ্যা দাঁড়ায় ত্রিশ (৩০)।

প্রধান এবং বরকতপূর্ণ আল্লাহর ওলীগণ জন্ম নিয়েছেন। যাঁরা পৃথিবীর ইতিহাসে নিজেদের অস্লান চিত্র অংকন করেছেন। মাওয়ারাউন- নাহারের আলেমগণের জ্ঞানগবেষণা দ্বারা সমগ্র বিশ্বের ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার, গ্রন্থাগার এবং মাদরাসাসমূহ আজও আলোকোজ্জ্বল রয়েছে।.

জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখা এবং জীবনের প্রত্যেক ময়দানে এখানকার বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের তালিকা এতো দীর্ঘ যে, তার জন্য একটি বৃহদাকারের স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রয়োজন। তবে নিয়প্রদত্ত দৃষ্টাত্তসমূহ দ্বারা এখানকার ব্যক্তিত্বদের সম্পর্কে কিছুটা ধারণা জন্মাবে__

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহঃ। যিনি হাদীস ও ফেকাহের বিখ্যাত মুজতাহিদ ইমাম। তৃর্কমেনিস্তানের প্রসিদ্ধ শহর “মরভ" তাঁর মাতৃভূমি হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে।

২ ইমাম সুসলিম রহঃ এর উত্তাদ মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন কাহজাজ মরভেরই গৌরবময় সম্তান।

৩. ইমাম বুখারী রহঃ যিনি' পবিত্র কুরআনের পর ইসলামের বিশুদ্ধতম কিতাব “সহীহ আল-বুখারী'র সংকলক। তিনি উজবেকিস্তানের শ্বরতাঙ্গ_-এ তাঁর মাযার রয়েছে।

8. ইমাম তিরমিযী রহ. ঘিনি হাদীসের বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ “জামে? আত-তিরমিধী-

এর সংকলক। তাঁর মাতৃভূমি উজবেকিস্তানের তিরমিয নগরী। এ শহরটি “আমুদরিয়া'র উত্তর তীরে আফগানিস্তানের একেবারে নিকটে অবস্থিত। শুধুমাত্র নদীটি উভয়ের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। আফগানিস্তানের জেহাদ চলাকালে রাশিয়ান সৈন্যরা এই শহরকে তাদের রসদপত্রের এবং আফগানিস্তানের উপরে আকাশপথের আক্রমণের প্রধান কেন্দ্র বানিয়েছিল।

৫. আবুল লাইস সমরকন্দী, সদরুশ শহীদ, আল্লামা মারগীনানী (হেদায়ার গ্রন্থকার) এবং আল্লামা সাক্কাফী (বাদাইউস সানায়ে'র লেখক) এর মত সূক্ষ্ম জ্ঞান সম্পন্ন হানাফী ফকীহগণ. এই উজবেকিস্তানের মাটি থেকেই জন্ম নিয়েছেন।

৬. শাইখ আবু মানসূর মাতুরিদী রহঃ), যিনি কালাম শাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম। তাঁর মাতৃভূমিও ছিল সামরকন্দ এবং সেখানেই তাঁর মাযার রয়েছে।

৭. সিলসিলার' প্রতিষ্ঠাতা এবং বিখ্যাত ওলীআল্লাহ। তাঁকে ধারণ করার সৌভাগ্যও সমরকন্দ ভূখণ্ডই লাভ করে।

৮. আবু নাসর ফারাবী এবং ইবনে সীনার মত বৈজ্ঞানিক দার্শনিক এবং আলগবেগের মত জ্যোতির্বিজ্ঞান ও সৌরবিজ্ঞানের পণ্তিতও এই ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকাশকে আচ্ছন্ন করে ফেলেন।

এখানে মুসলমানদের অধঃপতনকালেও কমিউনিষ্টদের দখলদারিত্বের পূর্বে কোন শহর এবং গ্রাম-গঞ্জ ছ্বীনি শিক্ষা কেন্দ্র থেকে খালি ছিল না। শুধুমাত্র

বুখারাতেই আটশত মাদরাসা ছিল। যেগুলোতে প্রায় ৪০ হাজার তালিবে ইলম বিনা বেতনে শিক্ষা অর্জন করত। এটিই কারণ যে , ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার রাশিয়ার সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা সত্বেও সেখানকার যে পরিস্থিতি এখন সম্মুখে এসেছে ত ‘ □□-

***روئ□ یمن آج بھی (    ) □واؤوں میں***
***□□***

***رنگ حجاز آج بھی(    ) نواؤں میں □□***

“তার বায়ুতে আজও ইয়ামানের সুগন্ধ রয়েছে □

তার সঙ্গীতে আজও হেজাযের রঙ রয়েছে □”

## এখানের মুসলমানদের উপর যে নির্যাতন চালানো হয়

রাশিয়ান কমিউনিষ্টরা এ সমস্ত অঞ্চলের উপর হিংস্র ব্যাঘ্রের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯২০ উসায়ীতে তারা “খিওয়া ” ও 'বুখারা , অঞ্চল অধিকার করে। পবিত্র কুরআন প্রকাশ করা ও প্রচ্পর করা এবং ধর্মীয় শিক্ষাকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। সে সমস্ত মুসলিম দেশে প্রচলিত আরবী ও ফার্সী বর্ণলিপির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রাশিয়ান বর্লিপি চাপ্লিয়ে দেওয়া হয়। যেন মুসলমানরা তাদের অতীত থেকে এবং বর্তমান মুসলিম বিশ্ব থেকে জ্ঞান - বিজ্ঞানের লাইনে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কোন মুসলমানকে আল্লাহর নাম নিতে দেখা গেলে তাকে সর্বচেয়ে বড়

অপরাধী “রূহানী ” আখ্যা . দিয়ে কালো আইন প্রয়োগের মাধ্যমে নাগরিক অধিকারসমূহ থেকে বঞ্চিত করা হয়। হজ্জের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদেরকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করার জন্য এ সমস্ত এলাকায় বহুসংখ্যক রাশিয়ানকে এনে তাদের বসতি স্থাপন করা হয়। মুসলমানদের বিরুদ্ধে গুপ্তচর বৃত্তির জন্য দুর্বল ঈমানদারদেরকে খরিদ করা হয়। বেশির ভাগ মসজিদ এবং মাদরাসাকে বিধবস্ত করা হয়। অথবা ক্লাব , গুদাম , আস্তাবল , বাসস্থান ও বিনোদন কেন্দ্রে পরিণত করা হয়। সামান্য যে কয়টি মসজিদ তাদের হাত থেকে বেচে যায় , সেগুলোতে আযান বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং বড় অংকের কর আরোপ করা হয়। ঐ সমস্ত মসজিদে নামায আদায়কারীদের উপর 'নামাযী ট্যাক্স ” বসানো হয়।

যে সমস্ত সাহসী মুসলমান ট্যাক্স প্রদান করেও মসজিদে আসতে থাকে , তাদেরকে পুঁজিবাদী ” আখ্যা দিয়ে নানারকম শাস্তি দেওয়া হয়। ফলে তারা হয়তো শহীদ হয়ে যায় অথবা সাইবেরিয়ার তুষারপূর্ণ “জাহান্নামে - যেখানে তাপমাত্রা চল্লিশ মাইনাস সেন্টিগ্রেট পর্যন্ত নেমে যায় __এমনভাবে দেশান্তর করা হয় যে , তাদের পরিবারের লোকেরা তাদের পরিণতি সম্পর্কে আর কখনো জানতে পারেনি। এই প্রলয়ংকর অবস্থাতে হাতেগোনা মসজিদসমূহের অবস্থা এছাড়া আর কি হতে পারে ?

***مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازیں نہ رہے***

“মসজিদসমূহ নামাযীর অভাবে মাতম করছে।’

এ সমস্ত এলাকায় যখন রাশিয়ান আগ্রাসন আরম্ভ হয়, তখন এখানকার হকপন্থী উলামায়ে কেরাম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, তাঁরা মুসলমানেদরকে এ অবস্থায় ফেলে রেখে কোথাও না গিয়ে. এখানে অবস্থান করে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কৃফরী শক্তির মোকাবেলা.করবেন। হাজারো দ্টসংকল্পী মুজাহিদ এ সমস্ত উলামায়ে রববানীর নেতৃত্বে পাহাড়ে পাহাড়ে মোর্চা গেড়ে বসে বারো বছরের অধিক কাল পর্যস্ত গেরিলা আক্রমণের মাধ্যমে কমিউনিষ্টদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যেরে। এ সমস্ত মুজাহিদের গুপ্তচর বৃত্তির ব্যবস্থাপনাও দীর্ঘদিন পর্যন্ত কাজ করতে থাকে। যখনই তারা অবগত হতেন যে, আজ অমুক শহর বা কসবায়মুসলমানদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ করা হবে অথবা বন্দী উলামায়ে কেরামকে সর্বসম্মুখে হত্যা করা হবে, তাঁরা সেখানে দুশমনের উপর বিদ্যুতের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়তেন এবং অনেককে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতেন।

কিন্তু সোশ্যালিষ্ট সরকার ধীরে ধীরে
এ সমস্ত এলাকায় দুনিয়াদার আলেমদের বিরাট এক দল তৈরী করে ফেলে, যারা কমিউনিষ্টদেরকে মুক্তিদাতা প্রমাণিত করে আসমান জমিনকে একাকার করে ফেলে। মুসলমানদেরকে নিত্য নতুন শাখা মাসআলাসমূহে বিতর্কে লিপ্ত করে পরস্পরের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে দেয়! তারা. উলামায়ে হকের বিরুদ্ধে অনলবর্ষী বক্তব্য ঝাড়তে থাকে।

নতুন প্রজন্মকে বিভিন্ন প্রকার রঙিন স্বপ্ন দেখিয়ে হীন এবং উলামায়ে দ্বীনের

প্রতি অনীহা সৃষ্টি করে। হকপন্থী আলেমদের উপর লোমহর্ষক নির্যাতন চালানো হয়। যে সমস্ত হক্কানী আলেম এমন নির্যাতনের শিকার হন ১৯৪০ ঈসায়ী পর্যন্ত তাদের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারে গিয়ে দাঁড়ায়।

অসংখ্য সাধারণ লোক নিজেদের জান এবং ঈমান বাঁচিয়ে আফগানিস্তান, ইরান, হিন্দুস্তান ও সৌদী আরব প্রভৃতি দেশে হিজরত করতে বাধ্য হন। আমি নিজেও এমন কয়েকজন মুহাজির, ভাদের পুত্র ও প্রৌপুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি এবং তাদের মুখেই তাদের নির্যাতনের কাহিনী শুনেছি--দারুল উলুম করাচীতেও এমন বেশ কিছু মুহাজির শিক্ষারত রয়েছে।

একজন মুহাজিরের নির্যাতিত হওয়ার কাহিনী
জনাব আযম হাশেমী নামক একজন সাইয়েদ বংশের লোক-_ঘিনি করাচী ইউনিভার্সিটিতে সম্ভবত প্রযেসর ছিলেন কখনো কখনো আমার আববাজান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব (রহঃ)এর নিকট আসতেন। আমাদের সঙ্গেও অত্যন্ত মুহাববতের আচরণ করতেন। তাঁর সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাত হয় আনুমানিক ১৯৭২ ঈসারীতে, যখন তাঁর বয়স ছিল ষাটের কাছাকাছি। তিনি “আন্দযান” (উজবেকিস্তান)এর একটি প্রসিদ্ধ আলেম পরিবারের চোখের মণি ছিলেন।

- ১৯৩১ ঈসায়ীতে যখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ষোল বছর এবং পরিবারের প্রায় সকল

পুরুষই কমিউনিষ্টদের হাতে শহীদ হয়েছেন,তখন তাঁকে বিধবা মাতার পীড়াপীডিতে রাতারাতি. হিজরত করতে হয়। কমিউনিষ্টরা তাঁর রক্তের পিয়াসী ছিল। তাঁর মাতাকেও “রূহানী” আখ্যা দিয়ে নাগরিকত্বের সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। জ্ঞানী-গুণী শিক্ষিতা মায়ের মমতা বাধ্য হয়ে নিজের কলিজার টুকরাকে একথা বলে চিরদিনের জন্য বিদায় করেছিল--

"বেটা! তুমি আমার বার্ধক্যের লাঠি
এবং সকল বাসনার কেন্দ্রবিন্দু কিন্তু তুমি নিজেই দেখছ যে, প্রিয় মাতৃভূমিতে অবস্থান করে একজন মুসলমানরূপে তুমি আমার খেদমত করতে পারবে না। আমি তোমাকে দ্বীন ও ঈমানের খাতিরে স্বাধীন কোন দেশে চলে ঘাওয়ার জন্য হুকুম করছি।”

সেই নিশিথে লষ্ঠনের ক্ষীণ আলোকে তিনি তাঁর ঘুমন্ত অচেতন ছোট ভাইবোনদেরকে শেষবারের মত দর্শন করে অজানার পথে যাত্রা করেন। বিধবা মা তাঁকে জরুরী উপদেশ দান করতে করতে পারিবারিক বাগানের প্রান্তে চলে আসেন। তারপর শেষবারের মত স্নেহ-পিয়ার করে বিদায় দেন।

তিনি কয়েক ধাপ অগ্রসর হতেই পিছনে কিছু একটা পড়ে যাওয়ার শব্দ হয়। পিছন দিক তাকিয়ে দেখেন মা অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছেন, চরম অস্থির অবস্থায় পুত্র মায়ের মুখে পানির ছিটা দিয়ে তাঁকে ডাকেন।

জ্ঞান ফিরে আসতেই মা রাগান্বিত হয়ে প্রশ্ন করেন_বেটা! তৃমি ফিরে এসেছো কেন?

আল্লাহর ওয়াস্তে তোমার মনজিলকে খাটো করো না। তুমি এখনই রওয়ানা হয়ে যাও ”

মাকে চৌকিতে পৌঁছে দিয়ে এই ইয়াতিম বালক অশ্রু প্রবাহিত নয়ন , প্রকম্পিত হৃদয় এবং ভারী পদক্ষেপে অজ্ঞাত মনজিল অভিমুখে যাত্রা করেন।

বহু মাস ধরে এই মাওয়ারাউন নাহারেরই বিভিন্ন শহর __খোকান্দ , . বুখারা ও সমরকন্দ প্রভৃতিতে তিনি ভীত -সন্ত্রস্ত অবস্থায় দ্বারে দ্বারে ফিরতে থাকেন। কিন্তু বিশাল আয়তনের এ ভূখণ্ড মুসলমানদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে আসে। পরিশেষে অজ্ঞাত এক ব্যক্তি কোন রকমে তাঁকে আমুদরিয়া পার করে দেয়। তিনি হিজরত করে প্রথমে আফগানিস্তান এবং সেখান থেকে হিন্দুস্তান চলে আসেন। তারপর প্রাকিস্তান হওয়ার পর করাচী এসে বসবাস শুরু করেন। তারপর সারাটি জীবন মা ও ভাইবোনদেরকে একনজর দেখার 'জন্য হাজার বার চেষ্টা করেন , কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। তিনি একথাও জানতে পারেননি যে , তাঁরা বেচে আছেন , নাকি তাঁদেরকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে। কারণ , সোভিয়েত ইউনিয়নের অধিকৃত সমস্ত দেশ ও রাজ্যসমূহকে বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের উপর এমন মোটা লোহার আবরণ লাগিয়ে দেওয়া হয় যে , ভিতরের শব্দ বাইরে এবং বাইরের শব্দ ভিতরে আসতে পারতো না। ডাক ও যোগাযোগের সমস্ত পথ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়।

***یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت***

***پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات***

এই জ্ঞান , এই বিজ্ঞান , এই কৌশল, এই ক্ষমতা
মানব লু পান করে , আর সাম্যের শিক্ষা দান
করে।”

আফগানিস্তান এসে পৌঁছার পূর্বে হিজরতের এই সফরে তাঁর নিজের উপর বিপদাপদের কি ধরনের কিয়ামত আপতিত হয়েছে এব এবং উলামায়ে .কেরামের উপর কি ধরনের লোমহর্ষক নির্যাতনের জাগ্রতকারী তার পুস্তিকা “সামারকন্দ ও বুখারার রক্তাক্ত উপাখ্যান -এ বর্ণনা করেন। পুস্তিকাটি ১৯৭০ ঈসায়ীতে “মাকতাবা উর্দু ডাইজেস্ট " সমনআবাদ, লাহোর থেকে ছেপে বের হয়েছিল। পুস্তিকাটি এখন আমার সম্মুখেও রয়েছে।

এ সমস্ত রাজ্যের নিকট অতীতের ইতিহাস আমাদের বিশেষভাবে অধ্যয়ন করা উচিত। এ ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারবো যে , মুসলমানদের কোন দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে এবং কি কি ষড়যন্ত্র চালিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করতে সফল হয়েছে।

এমনকি পরিশেযে তাদের এমন করুণ পরিণতি হয়েছে যে , সেখানকার আকাশে--যা শত শত বছর পাঁচ ওয়াক্ত আযানের মনোমুগ্দকর ধ্বনিতে মুখরিত হতো --ভয়ংকর নীরবতা ছেয়ে যায়। যে সমস্ত এলাকা শত শত বছর ইসলামের আলোকে শুধু উদ্‌তাসিতই ছিল না, বরং সেখানকার বিচ্ছুরিত আলোকমালা মুসলিম বিশ্বকে আলোকিত করে এসেছে , তাদের উপর বিপদ ও দুর্যোগের এমন নিকষ অন্ধকার চেপে বসে , যার অরুণ দীপ্তি প্রভাতের অপেক্ষায় প্রতীক্ষা করতে করতে সেখানকার কয়েক

প্রজন্ম দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে। তবে সেখানকার নির্যাতিত ও নিপীড়িত মুসলমানদের দৃঢ় ঈমানের জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ দেই যে, তারা কুফর ও অত্যাচারের এই ঘন অমানিশার মাঝেও ঈমানের প্রদীপকে এক মুহূর্তের জন্যও নির্বাপিত হতে দেননি। তারা নিজ নিজ ঘরের মধ্যে লুকিয়ে লৃকিয়ে নামায আদায় করতে থাকেন এবং বাচ্চাদেরকে তা" শিক্ষা দিতে থাকেন। জানবাজি রেখে পবিত্র কুরআনের যে সমস্ত কপি তারা রক্ষা করেছিলেন, তা জীবনভর তাঁদের সর্বাধিক মূল্যবান পুঁজি বলে বিবেচিত হয়।

সত্তর বছরের এ দীর্ঘ সময়ে সেগুলোর পাতা জীর্ণ-শীর্ণ ও মলিন হলেও সেগুলোর তিলাওয়াত এবং শিক্ষার ধারাবাহিকতা গৃহ প্রকোষ্ঠে লুকিয়ে লুকিয়ে চালু থাকে। হাদীস, ফিকাহ এবং ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞানের যে সমস্ত গ্রন্থ তারা কোনভাবে রক্ষা করেছিলেন, সেগুলোও তার! নিজের জানের মত করে হেফাজত করেন। যে সমস্ত উলামায়ে কেরাম কোনভাবে জীবনে বেচৈ গিয়েছিলেন, তাঁরা রাতের অন্ধকারে ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষাদানের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখেন। মোটকথা, দ্বীন ও ঈমানের অমূল্য এ পুঁজি প্রত্যেক বিদায়ী প্রজন্ম ভবিষ্যত প্রজন্মের হাতে তুলে দেয় এবং তাদের অন্তরে অনুপ্রবেশ করায়, যার ফলে আলহামদুলিল্লাহ আজও সেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। আগও সেখানে উলামায়ে কেরামের অস্তিত্ব বিদ্যমান। বিরাট সংখ্যক মুসলমান নামায, রোযা এবং ইসলামী প্রতীকসমূহের অনুসারী।

বিস্ময়কর ও ঈমান উদ্দীপক এ সমস্ত ঘটনা আমি উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান ও কার্ণিজিয়ার মসজিদসমূহের ইমামদের সেই প্রতিনিধিদল থেকে অবগত হই, যাঁরা অতি সম্প্রতি দারুল উলূম করাচীতে এসেছিলেন,([9]) যেই বিপদ ও দুষোগের মুখোমুখী মধ্য এশিয়ার মুসলমানদেরকে হতে হয়েছে এবং যে ধরনের কুরবানী করে এখানকার মুসলমানগণ নিজেদের দ্বীনের হেফাজত করেছেন, রাশিয়ার অধিকৃত অন্যান্য দেশসমূহের অবস্থা অধ্যয়ন করলেও জানা যায় যে, সেখানেও মুসলমানগণ আজ পর্যন্ত এমন দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতির মোকাবেলা করে চলছেন [10]এবং বিশ্ববাসীকে নিজেদের দৃঢ় সংকল্প দারা জানিয়ে দিচ্ছেন —

***مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلماں کہ ہے***

***اس کی اذانوں سے فاش سر کلیم و خلیل***

---

[9] ১. আমি উলামায়ে কেরামের একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গী হয়ে প্রথমে ১৯৯১ ঈসায়ীতে এবৎ পরে ১৯৯২ ঈসায়ীতে উজবেকিস্তান সফরে যাই, সেখানে গিয়ে কমিউনিষ্টদের নির্যাতন এবং ইসলামের মুলোৎপাটনের জন্য রাশিয়ার অসংখ্য চেষ্টার যে বৃত্বান্ত অবগত হই, সেগুলো বর্ণনা করার জন্য পৃথক এক পুস্তক দরকার।

[10] ১. পরবতীতে আফগান জিহাদের ফলে এ সমস্ত দেশের মুসলমানরা যখন বহির্বিশ্বে গমনাগমনের কিছুটা সুযোগ লাভ করে এবং তাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়, তখন নির্যাতনের যেসব কাহিনী কিতাবে পাঠ করেছিলাম তার চেয়ে অধিক ভয়ংকর পরিস্থিতি তাদের মুখ থেকে শুনে অবগত হই।

মর্দে মুসলমান কখনই নিঃশেষ হতে পারে না, কারণ, তার আযানে ঘোষিত হয় সা মূসা কালিমুল্লাহ ও ইবরাহীম খলীলুল্লাহর রহস্য"।

## রুশ কমিউনিষ্টদের "অনুপ্রবেশ রীতি"

মধ্য এশিয়ার মুসলিম রাজ্যসমূহে এবং আফগানিস্তানে রাশিয়ানদের "অনুপ্রবেশ রীতি" এইরূপ ছিল যে, তারা নিজেদের "বিজয়" তৎপরতাকে সাধারণত তিনটি স্তরে পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করে।

১. প্রথম স্তরে তারা দরিদ্র ও দুস্থ জনসাধারণের প্রকৃত কষ্ট ও বিপদাপদের জন্য মায়াকান্না করে সোশ্যালিজম ও কমিউনিজমের "দরিদ্র পালন' এর রঙিন স্বপ্ন দেখিয়ে বিশ্বাস করায় যে, আমরা শ্রমিকদেরকে কলকারখানার মালিক এবং কৃষকদেরকে জমিজমার মালিক বানাতে চাই। আমাদের উদ্দেশ্য দুস্থ জনসাধারণের বিপদ দূর করা, শিক্ষা ব্যাপক করা, নারীদের "অধিকার সংরক্ষণ" করা এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের "স্বাধীনতার পৃষ্ঠপোষকতা" করা। দ্বীন-ধর্মের সঙ্গে আমাদের কোন শত্রুতা নেই। আমরা শুধু 'পুঁজিবাদী ও জায়গীরদারীর ব্যবস্থা নিশ্চিহ্ন করতে চাই। এই স্তরে তারা গাকর্সবাদী সোশ্যালিজমকে ইসলামের সাম্য ও ন্যায়বিচার এবং খেলাফতে রাশেদার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ বলে রঙিন করে তুলে ধরে। এরা এই ধোকা দেওয়ার সুসংহত প্রচেষ্টা চালায়

ঘে, সোশ্যালিজম ইসলামের সঙ্গে সামগ্রস্যপূর্ণ। কপটতাপূর্ণ ধারাবাহিক এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে তারা সাদা দিলের গরীব জনসাধারণের সহমর্মিতা লাভ করে সমাজ ও রাজনীতির অঙ্গনে নিজেদের শক্তি প্রতিষ্ঠা করে এবং দ্বীনদার ও শিক্ষিত শ্রেণীকেও অনেকটা প্রতারণার ফাঁদে আবদ্ধ করে। এ স্তরে তারা লেনিনের শিক্ষা দেওয়া এই কৌশলকে বাস্তবায়ন করে যে, প্রাচ্যে ধর্মের দরজা দিয়ে প্রবেশ করো।’

২.দ্বিতীয় স্তরে তারা মুসলিম রাজ্যসমূহের শিক্ষাকেন্দ্র,রাজনৈতিক ও আধা রাজনৈতিক সংগঠন, পুত্র-পত্রিকা, চলচ্চিত্র ও সাহিত্য সংগঠনসমূহ এবং কবি- সাহিত্যিকদের মধ্যে নিজেদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত করে। এরা শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে ছাত্রদেরকে এবং প্রচার মাধ্যম দ্বারা জনসাধারণকে কখনও সোশ্যালিজম ও কমিউনিজমের নাম নিয়ে আর কখনো বেনামে তার প্রচার করতে থাকে এবং বিরাট সংখ্যক তরুণকে মন_মানসিকতার দিক থেকে কমিউনিষ্ট বানাতে থাকে।

নাটক, কবিতা, উপন্যাস, পুত্র-পত্রিকার প্রবন্ধ. এবং বক্তৃতার মাধ্যমে সমগ্র জাতির মানসিকতা তৈরী করে। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্থানীয় শাসকদের সঙ্গে যোগ-সম্পর্ক বৃদ্ধি করে নিজেদের জন্য অধিকতর সুযোগ-সুবিধা অর্জন করে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে নতুন প্রজন্মকে নগ্নতা ও অশ্রীলতার কাজে জুড়ে দেয়। গণতন্ত্রের নামে জনসাধারণকে বিভ্রান্তি, অরাজকতা, অবাধ স্বাধীনতা ও আইন লংঘনের প্রতি

উদ্বুদ্ধ করে। রাশিয়ান নর্তকীদের আগমন ঘটতে থাকে। নীতি-নৈতিকতার মুল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক এঁতিহ্যসমূহের সঙ্গে ব্যঙ্গ-বিদ্ধপ আরম্ভ করে। এগুলোকে 'পশ্চাতপদতা* আখ্যা দেয়।

“অর্থনৈতিক সহযোগিতা'র নামে
স্থানীয় শাসক ও নীতি-নির্ধারক বোকা বানিয়ে নিজেদের আজ্ঞাবহে পরিণত করা হয়। যখন তারা অর্থনীতি ও প্রতিরক্ষা অঙ্গনে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে স্বনির্ভরতার পথে অবিচল হওয়ার পরিবর্তে ভিনদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন তাদের দ্বারা জাতীয় লক্ষ্য, জনসাধারণের আশা-আকাজক্ষা এবং দেশের প্রয়োজনের পরিপন্থী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করানো হয়। অপরদিকে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ রাজনৈতিক লিডার ও জনসাধারণকে সরকারের বিরুদ্ধে উসকানী দেওয়া হয়। এভাবে ৮-"র জনসাধারণ থেকে যতই বিচ্ছিন্ন হতে থাকে ততই দুর্বল হতে থাকে।

সাথে সাথে ইসলামী আকীদা-বিম্বাস এবং ধর্মীয় প্রতীকসমূহের উপর সূক্ষ্ম কটাক্ষ করতে থাকে৷ হকপন্থী আলেমদের সঙ্গে খোলামেলা বিদ্রাপ আরম্ভ করে। দুনিয়াদার আলেমদেরকে তাদের বিরুদ্ধে সুসংগঠিত করে। নানারকম জুলুম-অত্যাচারের মাধ্যমে তাঁদের জীবনকে সংকীর্ণ করে ফেলে।

অতীতের মুসলিম শাসকদের ভোগ-বিলাসিতার কিছু সত্য আর বেশীর ভাগ মনগড়া কাহিনী শুনিয়ে জনসাধারণের অন্তরে তাদের অতীত এঁতিহ্য ও ধর্মীয় পথপ্রদর্শকদের সম্পর্কে অনিহা সৃষ্টি করে। তাদেরকে

পরস্পরে কোথাও দলাদলির ভিত্তিতে আর কোথাও ভাষা, অঞ্চল বা বংশীয় সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে আত্মকলহে লিপ্ত করে দেশকে মারাত্মকভাবে দুর্বল করে ফেলে।

৩. তৃতীয় স্তরে যখন তারা লক্ষ্য করে
যে, আভ্যন্তরীণ মাঠ তাদের সেনা অভিযানের অনুকূল হয়েছে এবং বড় ধরনের প্রতিরোধের কোন আশংকা নেই, তখন তাদের ট্যাংক ও লোক-লশকর সমস্ত ওয়াদা অঙ্গীকার, চুক্তি- সন্ধি ও “রঙিন স্বপ্র“কে পদদলিত করে সে সমস্ত দেশে প্রবেশ করে। সর্বপ্রথম এ সমস্ত অযোগ্য শাসকদেরকে হত্যা করে, যাদেরকে বোকা বানিয়ে তারা এখানে এসে পৌঁছে। দেশের উপর চরম জালিম ও অত্যাচারী ডিক্টেটরশিপ (স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা) চাপিয়ে দেয়।

সাধারণত দেশের এ সমস্ত আত্মবিকৃত রাজনৈতিক নেতারা ডিক্টেটর মনোনিত হয়, যাদেরকে এ লক্ষ্যে পূর্ব থেকে প্রস্তুত
করা হয়, তাদের নাম যদিও তাদের বাপ-দাদাদের দেওয়া মুসলমানের নামই থাকে, কিন্তু বিশ্বাসের দিক থেকে তারা নিজেদেরকে কট্টর এবং আল্লাহ্র অস্তিত্বকে অন্বীকারকারী প্রমাণ না করা পর্যস্ত তাদেরকে এ পদ দেওয়া হয় না। কল-কারখানা, দোকানপাট ও জমিজমা সো শ্যালিক্ট আমলাগণ দখল করে বসে।
আর দরিদ্র জনসাধারণ ও কিষাণ-মজুর, যাদেরকে
রঙিন পন দেখিয়ে এই রক্তাক্ত নাটক মঞ্চস্থ করা হয়, তারা বোকার মত তাকিয়ে দেখতে থাকে। তাদের দুর্দশা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এখন তারা অনেক সময় এক টুকরা শুকনো রুটির জন্য হা-হুতাশ করতে থাকে। ধমীয়

স্বাধীনতা , সাংগঠনিক তৎপরতা , রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং পেশ্য ও কর্মের স্বাধীনতা বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়।

যে সমস্ত মসজিদ বা মাদরাসা থেকে সোশ্যালিজম বা তার ডিক্টেটরশিপের বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠার আশংকা করা হয় , তার উপর বুলডোজার চালানো হয়। কেউ মুখ খুললে তাকে চিরদিনের জন্য গায়েব করে দেওয়া হয় এবং এমন সমস্ত উপাখ্যানের সেখানে পুনরাবৃত্তি করা হয় , যার ভীতি আজও তিরমিয , ফারগানা , বুখারা ও সামারকন্দের , অলিগলিকে নিস্তব্ধ করে রেখেছে।

***اس کے آب لالہ گوں کی خون دہقاں سے کشید***

***تیرے میرے کھیت کی مٹی ہے اس کی کیمیا***

***اس کے نعمت خانہ کی ہر چیز ہے مانگی ہوئی***

***دینے والا کون ہے؟ مرد غریب و بے نوا***

“তাদের রঙিন ফুল ও ফল গরীবের রক্তে সিঞ্চিত হয়েছে

তাদের রসায়ন উপকরণ তোমার আমার ক্ষেতের মৃত্তিকা

তাদের ভাণ্ডারের সর্বকিছুই যাচ্ঞা করা

যার দাতা হলো দুস্থ ও নিঃস্ব লোকেরা

আফগানিস্তানে তৃতীয় স্তরের করুণ পরিণতি
রাশিয়ানরা মধ্য-এশিয়ার মুসলিম দেশসমূহকে লুণ্ঠন করার পর অনতিবিলম্বে আফগানিস্তানেও তাদের অনুপ্রবেশের প্রথম স্তর আরম্ভ (৯৭২ ঈসায়ী পর্যন্ত)। আর তার পূর্ণতা সাধিত হয় দাউন খানের শাসনকালে (১৯৭৮ ঈসায়ীর ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত)। এ সময়ে এখানকার বহুসংখ্যক মুসলমানকে__যারা, ইলমে দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল-_ কমিউনিষ্ট বানানো হয়। আর তারাই সরকারী শিক্ষা কেন্দ্রসমূহের উপর চেপে বসে।

উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য বাছাই করে এমন তরুণদেরকে রাশিয়া পাঠানো হয়__যারা পূর্ব থেকে কমিউনিষ্ট ছিল,.বা যাদের সম্পর্কে তাদের আত্মবিশ্বাস ছিল যে, তারা কট্টর কমিউনিষ্ট হয়ে ফিরে আসবে। দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহ, রাজনীতি এবং সেনাবাহিনীর উপর কমিউনিষ্টরা চেপে বসে। এভাবে তাদের “দ্বিতীয় স্তরের” সমস্ত তৎপরতা পরিপূর্ণ হয়ে যায়। তৃতীয় স্তরের সূচনা করা হয় “স্বাধীনতা বিপ্লাবের" নামে। যার উদ্দেশ্য ছিল আফগানিস্তানকে পরিপূর্ণরূপে বুখারা ও সামরকন্দ বানানো। ২৭শে এপ্রিল ১৯৭৮ ঈসায়ীতে এখানকার কমিউনিষ্ট প্রেসিডেন্ট দাউন খানকে হত্যা করে এবং প্রেসিডেন্টের গদি দখল করে এই বিপ্লব ঘটায়।

রাশিয়ার ধারণা ছিল যে, আফগানিস্তানকে পরিপূর্ণরূপে একা পরিণত করার জন্য নূর মুহাম্মাদ তারাকায়ী, তার “খল্ক পার্টি,

এবং তার রাশিয়ান উপদেষ্টা ও “বিশেষজ্ঞরা” যথেষ্ট হবে, বিধায় তখন সে তার সেনাবাহিনী প্রেরণ করেনি। সুতরাং তারাকায়ী আফগানিস্তানে কমিউনিষ্ট বিপ্লব ঘটাতে তৎক্ষণাৎ যে সমস্ত কর্ম সম্পাদন করেছিল তা ছিল নিম্নরূপ__

১. জাতীয় পত্তাকার রঙ লাল করা হয়।
লাল পতাকা উজ্ডিন করা উপলক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান করা হয়।

২. ১৫ হাজার মুসলমানকে আন্দোলনের প্রথম দিকেই শহীদ করে / ফেলা হয়। যাদের মধ্যে বহুসংখ্যক আলিমও ছিলেন।

৩. ইসলামের বিরুদ্ধে কয়েকটি আইন জারী করা হয়।

৪. যে সমস্ত মুসলমান তাদের বিরুদ্ধে কথা বলেছে, তাদের অনেকেরই মালিকানাধীন সম্পদসমূহ বাজেয়াপ্ত করা হয়।

৫, রেডিওতে সম্প্রচারিত ধমীয় প্রোগ্রাম সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

৬. সরকারী শিক্ষা কেন্দ্রসমূহ থেকে ইসলাম ও এতদ্বিষযয়ক বিষয়সমূহ বাদ দিয়ে সোশ্যালিজম ও কমিউনিজমের শিক্ষাকে আবশ্যকীয় করা হয়।

৭. কৃষক, শ্রমিক ও নারীদের জন্য সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামসমূহে অংশগ্রহণকে আবশ্যক করা হয়।

৮. আল্লাহর অস্তিত্বকে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে অস্বীকার করা হয়।

(নাউযুবিল্লাহ)। কমিউনিষ্ট নেতারা ভরা মজমায় হাত উঁচু করে মুসলমানদেরকে চ্যালেঞ্জ করে যে, “তোমাদের আল্লাহর অস্তিত্ব থাকলে আমার এ হাত নিচু করে দেখাও ।»

এভাবে আফগানিস্তানে পরিপূর্ণভাবে কমিউনিষ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত করার আয়োজন প্রায় সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু আফগানিস্তানে কমিউনিজমকে ইসলামের জন্য প্রাণবিসর্জনকারী এমন এক যুগে ইসলামে দিক্ষীত হওয়ার পর থেকে আজ পর্যস্ত একদিনের জন্যও নিজেদের উপর বিধমীদের দাসত্বের কালিমা লেপন হতে দেয়নি। উপরস্ত তারা তাদের প্রতিবেশী মুসলিম রাজ্যসমূহে কমিউনিজমের জুলুম-নির্যাতন বিগত কয়েক দশক ধরে প্রত্যক্ষ করে আসছিল। বিধায় তাদেরকে ধোকা দেওয়া সম্ভব ছিল না।

এখানকার সচেতন উলামায়ে কেরাম সোশ্যালিজম ও কমিউনিজমকে শুরু থেকেই মুসলিম আফগানিস্তানের জন্য বিপদ ঘন্টা বলে অবহিত করে আসছিলেন। যখন জহির শাহের শাসনকালে “সাংস্কৃতিক বিপ্রুব” নামে ইসলামের মূলোৎপাটনের জন্য সুসংহত তৎপরতা আরম্ভ হয়, তখন তারা ভবিষ্যত দুর্যোগের পদধ্বনি আঁচ করতেই তাদের বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা আরম্ভ করেন।

নূর মুহাম্মাদ তারাকায়ীর সেই “লাল বিপ্রুব' জ্বলস্ত অগ্নির উপর তেল দেওয়ার মত কাজ করে। ফলে কয়েক দিন পরেই এখানকার সত্যপস্থী আলেমদেরকে এই কাযের সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করতে হয়। তারাকায়ীর তথাকথিত সরকার পবিত্র এ

জিহাদকে নিষ্পেষিত করার জন্য পরিপূর্ণ সামরিক শক্তি ব্যবহার করে। কাবুলের জগতজোড়া কুখ্যাত ‘পুলচারখী’ কারাগারের বুলডোজার দিবস-রজনী গণকবর খননের কাজে লিপ্ত থাকে, যেগুলোর মধ্যে নিষ্পাপ মুসলমানদেরকে কাফন-দাফন ছাড়া মাটি চাপা দেওয়া হয়।

তাদের এ সমস্ত জুলুম-অত্যাচারের ফলে মুসলমানদের জিহাদী জযবা অধিক পরিমাণে জ্বলে উঠে। তারা উপধু্পরি গেরিলা আক্রমণের মাধ্যমে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সেনাবাহিনীর এমন দুরাবস্থা করে দেয় যে, তারা ট্যাংক ও সীজোয়া গাড়ীর বাইরে বের হতে আর সাহস করে না।

রাশিয়া তারাকায়ী সরকারকে
নিঃসম্বল মুজাহিদদের হাতে চরমভাবে অপদস্ত হতে দেখে “খাল্ক পার্টিরই, অপর এক লিডার হাফিজুল্লাহ আমীনকে সম্মুখে অগ্রসর করায়, তখন সে প্রধানমন্ত্রী ছিল। সে তারাকায়ীকে হত্যা করে গদি দখল করে নেয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে রাশিয়া সরকার বুঝতে পারে যে, হাফিজুল্লাহ আমীন তাদের বিশ্বাসভাজন নয়। কারণ, সে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালাতেও অস্বীকার করে।

সুতরাং ১৯৭৯ ঈসায়ীর ২৭শে ডিসেম্বর পঙ্গপালের ন্যায় রাশিয়ার সেনাবাহিনী আফগানিস্তানে প্রবেশ করে। তারা সর্বপ্রথম হাফিজুল্লাহ আমীনকে খতম করে এবং তদস্থলে 'পার্চাম. পার্টির" প্রসিদ্ধ কমিউনিষ্ট নেতা “বাবরাক কারমাল”কে

চেকোস্লাভাকিয়া থেকে আনিয়ে পুতুল সরকার গঠন করে।

'বাবরাক কারমাল' যখন রাশিয়ান সেনাবাহিনীর পরিপূর্ণ শক্তি ও আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্র দিয়েও কয়েক বছর সময়ে জিহাদকে স্তিমিত করতে সক্ষম হলো না, তখন রাশিয়া তাকেও বরখাস্ত করে তাদের ষষ্ঠ গুটি ডঃ নাজিবুল্লাহুর মাধ্যমে চাল দেয়। তারপর যা কিছু হয় তা বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করছে।

সারকথা এই যে, রাশিয়ার অনুপ্রবেশের এই তৃতীয় স্তরই আফগান জিহাদের কারণ হয়, যা পরিশেযে রুশ সাম্রাজ্যের মৃত্যুর পয়গাম বয়ে আনে।

আত্মমর্যাদাশালী আফগান মুজাহিদগণ ১৫ লক্ষ শহীদের খুন প্রবাহিত করে শুধু নিজেদেরকেই কমিউনিজমের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেনি, বরং তাঁরা জানবাজি রেখে গোপনভাবে রাশিয়ার অধিকৃত দেশসমূহের মধ্যেও পৌঁছে যায়। তাদের নিকট ইসলামী জ্ঞান-সাহিত্য ও পবিত্র কুরআনের কপিসমূহ পৌঁছিয়ে দেয়। আফগান জিহাদের পট ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অবহিত করে তাদের মধ্যে স্বাধীনতার দুর্দমনীয় তরঙ্গ প্রবাহিত করে। বরং এ কাজটি এ সমস্ত সৈন্যও বিরাট আকারে সম্পাদন করে, যাদেরকে রাশিয়া অধিকৃত রাজ্যসমূহ থেকে একথা মনে করে ভর্তি করেছিল যে, এরা নিজেদের পিত্পুরুষদের ধর্মবিস্মৃত হয়েছে এবং কমিউনিজমের ছাঁচে গড়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে কিছু সৈন্য এমন অবশ্যই ছিল, যাদের এতটুকুমাত্র স্মরণ ছিল যে, তাদের

মাতাপিতা মুসলমান ছিলেন। কিন্তু বিরাট সংখ্যক সৈন্য এমন ছিল , যারা ভিতরে ভিতরে এখনও দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

এ সমস্ত সৈন্য যখন আফগানিস্তান এসে মুসলমানদের অবস্থা , তাদের উপর নির্যাতনের বর্বর কাহিনী , তাদের ঈমান এব ঈমান উদ্দীপক জিহাদ প্রত্যক্ষ করে , তখন তাদেরও ঈমান জেগে উঠে। তাদের সহমর্মিতা মুজাহিদদের জন্য নিবেদিত হয়। এমনকি কতক স্থানে তো তারা নিজেদের অস্ত্র পর্যন্ত ঘুজাহিদদেরকে দিয়ে দেয়।

রাশিয়া এ পরিস্থিতি দেখতেই তাদেরকে ফিরে ডেকে পাঠায় , কিন্তু জাগ্রত ঈমান স্বাধীনতার যে তাজা প্রাণ তাদের মধ্যে জীবন্ত করে , তা ধ্বংস করার কোন ক্ষমা কারও নিকটেই ছিল না।

আফগানিস্তানের চোরাবালিতে ফেঁসে গিয়ে রাশিয়া যে শিক্ষণীয় অর্থনৈতিক দুরাবস্থা ও ভাঙ্গাচুরার শিকার হয় এবং তার অধিকৃত রাষ্ট্রসমূহে যে দ্রুতগতিতে পরিস্থিত্তির পরিবর্তন ঘটে তা " থেকে এই সুসংবাদই ভেসে আসে -_

***عام حریت کا جو دیکھا تھا خواب اسلام نے***

***اے مسلماں ! آج تو اس خواب کی تعبیر دیکھ***

“ইসলাম সকলের স্বাধীনতার যে স্বপ্রু দেখেছিল ,

হে মুসলমান ***!*** আজ তুমি সেই স্বপ্নের বাস্তবতা প্রত্যক্ষ কর ***।”***

আফগান কমিউনিষ্ট
এ কথা তো খুবই প্রসিদ্ধ যে, আল্লাহর মেহেরবানীতে আফগানিস্তানের মুলমানগণ ইসলামের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী একটি জাতি। কিন্তু একথা খুব কম মানুযেরই জানা আছে যে, এখানকার যে সমস্ত লোক কমিউনিষ্ট হয়েছে, তারা যদিও সর্বসাকুল্যে ১; বা ২% -এর অধিক নয়, কিন্তু তারা কট্টর কমিউনিষ্ট এবং আল্লাহ তাআলার নিকৃষ্টতম দুশমন। তাদের অনেকেই নিজেদের এ জঘন্য অবস্থা প্রকাশ করেছে আর অনেকেই তা অন্তরালে লুকিয়ে রেখেছে।

খোস্তের কমিউনিষ্টদেরকে অধিকতর কট্টর মনে করা হয্প। কারণ তারা কমিউনিজমকে কোন লালসায় পড়ে নয়, বরং মতাদর্শরূপে গ্রহণ করেছিল। এ জন্য বহু বছরের পরিশ্রম ও সায়েন্টিফিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের মগজ ধোলাই করা হুয়। তাদের বেশীর ভাগই প্রচণ্ড লড়াইয়ের সময়ও অস্ত্র সমর্পণ করে না, রাশিয়ান সৈন্যরা তো বাহাদুর প্রমাণিত হয় না, কিন্তু এরা শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যায়। মুজাহিদদের হাতে গ্রেপ্তার হলে আত্মহত্যা করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। যে সমস্ত শহর এখনও পর্যস্ত তাদের দখলে রয়েছে, সেগুলোর শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে মাস ও লেনিনের মতাদর্শই এখনো শিক্ষা দেওয়া হয়।

এ সমস্ত আফগান কমিউনিষ্টের ইসলামের সঙ্গে শক্রতার অনেক ঘটনা আমি নির্ভরযোগ্য মুজাহিদদের থেকে নিজে শ্রবণ করেছি। যেমন মুসলমানদের বিরান জনপদের মধ্য দিয়ে অতিক্রমকালে তাদের মসজিদসমূহকে

সম্মিলিতভাবে__নাউযুবিল্লাহ-_টয়লেটরূপে ব্যবহার করা এবং পুরা মসজিদ নাপাক করা, পবিত্র কুরআনের পাতার উপর (ওদের মুখে মাটি পড়ুক) পেশাব-পায়খানা করা, কুরআন শরীফের পাতা দিয়ে পেশাব_পায়খানা পরিষ্কার করা এবং বন্দী মুজাহিদদেরকে কথায় কথায় এরূপ বলা যে, “ডেকে আন তোর খোদাকে, খোদা থাকলে তোদের সাহায্যে এগিয়ে আসছে না কেন?" ইত্যাদি ইত্যাদি (নাউযুবিল্লাহ।)

এ প্রসঙ্গে মাওলানা রৃহমাতুল্লাহ হক্কানীর স্বচক্ষে দেখা একটি ঘটনা তিনি বর্ণনা করেছেন। তিনি পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র “দারুল উলুম হক্কানিয়া, আকুড়া, খটক (সীমান্ত প্রদেশ) থেকে শিক্ষা সমাপন করেছেন। তিনি বিগত আট বছর ধরে আফগানিস্তানে লড়াইরত আছেন। তিনি বলেন (সারাংশ উদ্ধৃত করছি)-

“উরগুনের একটি লড়াইয়ে আমাদের ত্রিশজন শহীদের লাশ দুশমন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। আমাদের মুজাহিদগণ উরগুনের কমিশনারের নিকট শহীদদের লাশ ফিরিয়ে দেওয়ার দাবী জানায়। তখন সে অহংকার ভরে এ দাবীকে প্রত্যাখ্যান করে। তখন আমাদের কমাণ্ডার সাহেব বললেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সাহায্য করবেন।’ উত্তরে কমিশনার বলল, ‘তোমরা নিজেরাও আস, তোমাদের রাসূলও আসুক এবং তোমাদের খোদাও আসুক। সবাইকে নিয়ে আসো, আমার চ্যালেঞ্জ রইলো যে, তোমরা কোন শহীদের একটি পশমও আমার থেকে ছাড়িয়ে নিতে পারবে না?”

তার এই চ্যালেঞ্জ সম্পূর্ণ বিফল হয়। কারণ, মুজাহিদগণ ত্রিশজন মুজাহিদ শহীদের লাশই শুধু ফিরিয়ে আনেনি--বরং যখন মুজাহিদরা তাদের অবস্থানস্থলে মিসাইলের আঘাত হানে, তখন তারও একটি পা কাটা পড়ে, কিন্তু কমিউনিজমের বেড়ি এখনও তার গলার হার হয়ে আছে।" ( মাসিক আল হক, আকুড়া, খটক, সংখ্যা ৬ )

আফসোস এই যে

***فیض فطرت نے تجھے دیدۂ شاہیں بخشا***

***جس میں رکھ دی ہے غلامی نے نگاہ خفاش***

প্রকৃতির দান তোমাকে ঈগলের দৃষ্টি দিয়েছিল, কিন্তু দাসত্ব সেখানে চামচিকার দৃষ্টি স্থাপন করেছে।"

## ডঃ নাজিবুল্লাহর ধর্ম

আফগানিস্তানের বর্তমান পুতুল ডিক্টেটর নজিবুল্লাহর ধর্ম ও মাযহাব কি? এ প্রসঙ্গে তারই আপন ভাই "সিদ্দীকুল্লাহ রাহী, এর বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করাই উত্তম হবে। যা করাচী থেকে প্রকাশিত "দৈনিক জং পত্রিকা, তারিখ ২রা মুহাররামূল হারাম, ১৪০৯ হিজরী (মঙ্গলবার, ১৬ই আগষ্ট ১৯৮৮ ঈসায়ী) এর প্রথম পৃষ্ঠায় সচিত্র প্রতিবেদন আকারে প্রকাশিত হয় __ -

"পেশওয়ার (জং প্রতিনিধি), আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট ডঃ নজিবুল্লাহর ভাই রাহী অভিযোগ করেছেন যে, ডঃ নজিবুল্লাহ

একজন জালেম ব্যক্তি, সে সর্ব সময় আমাকে শাসিয়ে থাকে। সে তার পিতাকে হত্যা করেছে। ৩৪ বছর বয়সী সিদ্দীকুল্লাহ সোমবারে প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনকে সম্বোধন করে বলেন, “আমাদের পিতা নজিবুল্লাহর বিরোধী ছিলেন। উনি সামান্য অসুস্থ হন। হাসপাতালে ভর্তি হলে তাঁকে হত্যা করা হয়। তখন আমি পশ্চিম জার্মানীতে পালিয়ে যাই। সেখানে আমাকে নেশাকর ওঁষধ খাওয়ানো হয়। আমার হুশ হলে দেখি, আমাকে পূর্ব জার্মানীতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সেখান থেকে কাবুল নিয়ে আসা হয়।' তিনি বলেন, “আমরা চার ভাই দুই বোন। এর মধ্যে তিন ভাই কমিউনিষ্ট আর আমি এবং আমার বোনরা কমিউনিষ্ট নই”

ঘরের গোপন কথার এ বর্ণনা দ্বারাও এ সর্ব লোকের চোখ খোলা দরকার, যারা আফগানিস্তান থেকে রুশবাহিনীর পশ্চাদপদতার পর এখন আফগানিস্তানের পবিত্র জিহাদকে “মুসলমানদের গৃহযুদ্ধ, আখ্যা দিচ্ছে।

খোস্ত রণাঙ্গন
খোস্ত আফগানিস্তানের পূর্বদিকের প্রদেশ 'পাকতিয়া’র প্রসিদ্ধ শহর। গার্দেয তার রাজধানী। আফগানিস্তানে প্রদেশকে “বেলায়েত, বলা হয়। পাকতিয়া প্রদেশ ও কাবুল প্রদেশের মাঝখানে শুধুমাত্র “লোগার” নামক ছোট একটি প্রদেশ রয়েছে। অন্যান্য সমস্ত প্রদেশের ন্যায়

এই প্রদেশত্রয়ের। নববই শতাংশ এলাকা এখন মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। মাত্র কয়েকটি শহর ও ছাউনী কমিউনিষ্টরা দখল করে রেখেছে।

রাশিয়ানরা দখল করার পূর্বে পাকতিয়া অনেক বড় একটি প্রদেশ ছিল। রাশিয়ানরা তার দক্ষিণের এলাকাসমূহকে পৃথক একটি প্রদেশ বানিয়ে তার নামকরণ করে “পাকতিকা"। এই নতুন প্রদেশের প্রসিদ্ধ শহর উরগুন” এবং তার রাজধানী “শারানা_যার বিজয়ের পূর্ণ বিবরণ ইতিপূর্বে বিবৃত হয়েছে। এই দুই প্রদেশের পূর্ব সীমান্ত-_“আযাদ কাবায়েলী' (পাকিস্তানের স্বাধীন গোত্র শাসিত) এলাকা—উত্তর উজিরিস্তান ও দক্ষিণ উজিরিস্তানের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। খোস্ত পাকিস্তানের এই সীমান্ত থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দুরে গারদেয ও কাবুলের দিকে অবস্থিত।

আফগানিস্তানের ছোটবড় প্রায় চারশ' রণাঙ্গনে লড়াই চলছে, কিন্ত খোস্ত ও উরগুন এদিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, কমিউনিষ্টরা এই সীমান্ত শহর দুটিকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অন্যতম কেন্দ্র বানিয়ে রেখেছে। তারা এ সম্পূর্ণ এলাকাকে স্বতন্ত্র প্রদেশের মর্যাদা, সুবিধা ও উপকরণসমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ করেছে। যেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এ সমস্ত এলাকা থেকে পরিপূর্ণ ও শক্তিশালী তৎপরতা পরিচালনা করা যায়। "খাদের" প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সন্ত্রাসীদেরকে বেশির ভাগ এদিক দিয়েই পাকিস্তানে প্রবেশ করানো হয়।

পাকিস্তানের উজিরী গোত্রসমূহকেও এখান থেকেই পাকিস্তান ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে উস্কানী দিয়ে ভর্তি করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়াও এখান থেকে পাকিস্তান ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম তৎপরতা চালানো হয়। উরগুন বিজয়ের পর এখন এদিকে খোস্তই সমস্ত ষড়যন্ত্রের একমাত্র কেন্দ্র। -

ভৌগলিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব ছাড়াও খোস্তের আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই যে , বড় বড় কমিউনিষ্ট লিডাররা পাকতিয়া ও খোস্তেরই অধিবাসী। হাফিজুল্লাহ আমীন, বাবরাক কারমাল, ডঃ নজীব, শাহ নেওয়াজ তানায়ী , আরও বেশ কয়েকজন বড় বড় জেনারেল এখান থেকেই জন্ম নিয়েছে। এছাড়াও এ সমস্ত এলাকায় আফগানী কমিউনিষ্টদের সংখ্যা অধিক। তারা নিজেদের সেনাবাহিনীর পক্ষে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের গুপ্তচর বৃত্তির কাজ করে থাকে।

এ সমস্ত কারণের ভিত্তিতে কাবুলের কমিউনিষ্ট সরকার খোস্তের হেফাজতকে নিজেদের মান _মর্যাদা ও জীবন _মরণ সমস্যা মনে করে। খোস্তের ছাউনী , বিমান বন্দর , রেডিও ষ্টেশন , ইউনিভার্সিটি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধিদপ্তর সহ সমস্ত উপকরণ পাকিস্তান ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে বহু বছর ধরে পূর্ণ তৎপর রয়েছে। ডঃ নজীবের এ বিবৃতি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে যে, 'খোস্ত অপরাজেয় ভূমি। মুজাহিদরা এখানেও জয়লাভ করলে আমি পদত্যাগ করবো। ”

***افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو !***

**دیکھ نے تیر آنکھ نے فطرت کے اشارات**

"আফসোস! শত আফসোস! তুমি ঈগল হলে না
তোমার দৃষ্টি প্রকৃতির ইশারা দেখতে পেল না"

## কঠিনতম রণাঙ্গন

খোস্তের প্রতিরক্ষার জন্য দুশমন যে পরিমাণ যত্নবান ছিল তাতে বাহ্যত এটি বাস্তবিকই একটি অপরাজেয় ভূমি ছিল। নৈসর্গিক সৌন্দর্যভরা এই শহর ও তার ছাউনী শামিল নদীর উত্তর তীরের বিরাট প্রশস্ত ও খোলা ময়দানে অবস্থিত। নদীটি এদিক থেকে খোস্তের প্রতিরক্ষার প্রাকৃতিক উপাদান। এই শহরের সর্বদিকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার পর্যন্ত ময়দান এলাকা। যার মধ্যে জায়গায় জায়গায় দুশমনের সেনা চৌকি, অবস্থান কেন্দ্র, ট্যাংক ও মোর্চা রয়েছে। তারপর এই খোলা ময়দানকে সর্বদিক থেকে দীর্ঘ পাহাড় সারি ঝেষ্টন করে রেখেছে। এ সমস্ত পাহাড় ও টিলার উপর দুশমন রহুসংখ্যক বড় বড় চৌকি (পোষ্ট) নির্মাণ করেছে। সেগুলো সর্বধরনের অশ্ত্র-শস্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম ও শত্রুসেনা দ্বারা পরিপূর্ণ। প্রত্যেক বড় চৌকির অধীনে আশেপাশের ছোট ছোট পাহাড় ও টিলার উপর অসংখ্য ছোট ছোট চৌকি ও মোর্চা রয়েছে। যেগুলোর আশেপাশের সমস্ত এলাকা লক্ষ লক্ষ মাইন দ্বারা পরিপূর্ণ। এভাবে সম্পূর্ণ খোস্ত এলাকা -_যার দৈর্ঘ্য প্রায় ৭০ কিলোমিটার ও প্রস্থ প্রায় ৫৫ কিলোমিটার -__দুশমনের দখলে রয়েছে।

এই মাইলকে মাইল বিস্তৃত প্রতিরক্ষা প্রাচীরের বাইরে সর্বদিক থেকে পাহাড়ের মধ্যে মাওলানা জালাল উদ্দীন হক্কানীর নেতৃত্বে মুজাহিদগণ বছরের পর বছর ধরে অবিচল রয়েছেন। তারা এ সম্পূর্ণ এলাকাকে অবরোধ করে রেখেছেন। যার অর্থ এই যে , মুজাহিদদের জন্য রণাঙ্গনটি শত শত কিলোমিটার বিস্তৃত। একথা বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না যে , এটি আফগানিস্তানের কঠিনতম রণাঙ্গন। কারণ , খোস্ত শহর ও ছাউনী পর্যন্ত পৌঁছতে সর্বপ্রথম ভয়ংকর পাহাড় সারি বাধা হয়ে রয়েছে , ঘার প্রত্যেকটি টিলা ও পাহাড় থেকে দুশমনের দূরপাল্লার কামানসমূহ মুজাহিদদের উপর রাতদিন অগ্নি ও ধাতব বর্ষণ করে থাকে , তার সম্মুখের প্রায় ১৫ কিলোমিটার পর্যন্ত উন্মুক্ত ময়দান। যা দুশমনের চৌকি , মোর্চা , ট্যাংক ও ভূমি মাইন দ্বারা পরিপূর্ণ। তারপর দক্ষিণ দিক থেকে শামিল নদী অতিক্রম করাও একটি বড় ধরনের সমস্যা। এটিও অতিক্রম করা হলে খোস্তের বিশাল ও শক্তিশালী ছাউনী জয় করা সহজ ব্যাপার 1 ছল না। উপরন্ত দুশমন আকাশপথের পূর্ণ সহযোগিতা সর্বদাই লাভ করছিলো। আর মুজাহিদদের নিকট আকাশ পথের সহযোগিতা তো দূরের কথা , আকাশপথের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার মতও উল্লেখযোগ্য কোন সরঞ্জাম ছিল না। তবে মরহুম ভাইজানের ভাষায় __

***عقل تو سود و زیاں کے فکر میں الجھی رہی***

***جم گئے اہل جنوں خوف و خطر کے سامنے***

"বুদ্ধি তো লাভ লোকসানের চিন্তাতে আটকে রইলো"

আর প্রেমিকগণ বিপদ ঝঞ্চার সম্মুখে অবিচল রইলো।”

## অকুতোভয় বীর মুজাহিদ

শত মুবারকবাদ মুজাহিদদের দৃঢ় সংকল্পী ঈমানের জন্য যে, এ সমস্ত ধৈর্যসংকুল বাধা -বিপত্তি সত্ত্বেও তাঁরা সর্বদিক থেকে খোস্ত অভিমুখে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখেন। খোস্তের চতুর্দিকে তাঁদের অবরোধ সংকীর্ণ হতে থাকে। তাঁদের ঝষ্টনী প্রতি বছর ১৫ /২০ কিলোমিটার করে চেপে আস্তে থাকে। তাঁদের গতি মন্থর ছিল অবশ্যই , কারণ তারা বহু সপ্তাহ ও বহু মাস ব্যাপী পরিকল্পনা তৈরী করে এবং প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং অনেক জান কুরবানী করে কোন এক পাহাড় জয় করতেন , কিন্তু সাথে সাথে দুশমনের আকাশপথের আক্রমণের কারণে তাদেরকে পাহাড় ছেড়ে চলে আসতে হতো। তবে এ সমস্ত বিজয়ের এ উপকার অবশ্যই হতো যে , দুশমনের অনেক সৈন্য পৌছতো , অনেকে আহত হতো এবং অনেকে বন্দী হতো। সাহস দমে যেত এবং মুজাহিদদের সাহস বৃদ্ধি পেত। মুজাহিদগণ গনিমত স্বরাপ বিপুল পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র ও পানাহার সামগ্রী লাভ করতেন। কিন্তু তাঁদের প্রত্যাবর্তনের পর দুশমন পূর্বাধিক সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে পুনরায় সেই পাহাড় দখল করে বসতো।

এহেন কঠিন পরিস্থিতিতে এটি একটি আশ্চর্যের ব্যাপারই ছিল যে , ১৯৮৮ ঈসায়ীর শেষ পর্যন্ত মুজাহিদগণ পাহাড় সারির অধিকাংশ এলাকা দখল করে সেখানে নিজেদের

শক্তিশালী ক্যাম্প ও মোর্চাসমূহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

পাহাড়সারির মধ্যে তিনটি পাহাড় ছিল সর্বচেয়ে উঁচু ৯ . তোরগোড়া ২ . রাগবেলী ৩ . মানিকণড়ু। মুজাহিদগণ "রাগবেলী " ও 'মানিকণ্ডু 'র উপর দখল বিস্তার করে সম্মুখস্থ দুশমনের অধিকতর শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বহকে অনেকটাই তছনছ করে দিয়েছিলেন এবং অবরোধকে এমন শক্তিশালী করেছিলেন যে , স্থলপথে খোস্তের নিকট কোন প্রকার রসদ পৌঁছার সম্ভাবনা তাঁরা বাকি রাখেননি। প্রথম দিকে খোস্তকে রসদপুত্র পৌঁছানোর জন্য দীর্ঘ দিন বিরতি দিয়ে দিয়ে সেনা কাফেলা আসতে থাকে। কিন্তু মুজাহিদগণ এ সমস্ত কাফেলাকেও তছনছ করে ফেলেন, তাদের সর্বশেষ হতভাগ্য কাফেলা ছিল এটি , যেটি ৮৭ ঈসায়ীর শেষ দিকে এসে ধবংস ও বরবাদ হয়েছিল। তারপর আর কোন কাফেলা এদিকে মুখ করতে পারেনি। এখন খোস্ত শুধু মাত্র আকাশপথেই রসদ পাচ্ছে। যার জন্য খোস্তের বড় বিমান বন্দরটি রাত-দিন ব্যস্ত থাকে।

"তোরগড়া " বিজয় না হওয়া পর্যন্ত এবং তার চূড়া মুজাহিদরা দখল না করা পর্যন্ত বিমানবন্দরটিকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করার কোন পথ ছিল না। তোরগোড়ার চূড়া থেকে বিমান বন্দর পরিম্কার দেখা যেত। আমেরিকার পক্ষ থেকে ট্রিংগার মিসাইল জোগান দেওয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া লা দুর পার জতিয়ালেই মুরামনের ১৭টি বিমান কোন না কোন ভাবে শিকার করতেন।

***منزل ہے دور پھر بھی مسرت یہ کم نہیں***

***ے۔ کمی فاصلوں میں ،ے۔ ہوئی بڑھی ہمت***

গন্তব্য যদিও দূরে তবুও এটি কম আনন্দের ব্যাপার নয় যে ,

সাহস উর্ধ্বমুখী রয়েছে , আর দূরত্ব হ্রাস পেয়ে চলেছে ”

## কারামত কখন প্রকাশ পায় ?

ধৈর্যসংকুল এ রণাঙ্গনে জিহাদের দীর্ঘ এক যুগ সময়ে মুজাহিদরা আত্মনিবেদন , সংকল্প ও বীরত্বের ইতিহাস বিনির্মাণকারী যে সমস্ত দৃষ্টান্ত পদে পদে অংকন করেছেন , সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার গায়েবী মদদের যে সমস্ত বিস্ময়কর ঘটনা ও কারামত প্রকাশ পেয়েছে , তার সমস্ত ঘটনা গ্রস্থাকারে লেখা একেতো সম্ভব নয় , ঘদি সর্বকিছু লেখা কোনভাবে সম্ভব হতও তাহলে এ জন্য বৃহদাকার কয়েক ভলিউম যে প্রয়োজন হতো , তাতে মোটেও কোন অতিরপ্জন নেই। এ সম্পর্কিত কিছু ঘটনা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে , ইনশাআল্লাহ পরেও আসবে।

এখানে এ বিষয়টি তুলে ধরা জরুরী ঘে , অলস অকর্মন্য লোকদের জন্য “কারামত, প্রকাশ পায় না। যে সমস্ত 'শায়খচুল্লী ' নিচ্কর্ম বসে থেকে অলৌকিক ঘটনার আশা করে থাকে তাদের ভাগ্যে এ সমস্ত নেআমত জোটে না। কুরআন-হাদীসের শিক্ষা এবং ১৪শ ' বছরের ইতিহাস এবং খোদ আফগানিস্তানের এই প্রস্তরময় রণাঙ্গন এ বাস্তবতার সাক্ষী যে কেবলমাত্র এঁ সমস্ত দৃঢ়সংকল্পী খোদাপ্রেমিকদের হাতেই কারামত বা অলৌকিক

**ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ**

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ**

জানবাজ মুজাহিদ

বান্দা যখন স্বীয় রবের পক্ষ থেকে এ সমস্ত করুণাবারীর বর্ষণ দেখতে পায়, তখন তার আশা জেগে ওঠে, আল্লাহর উপর বিশ্বাস এবং ভরসা আরো দৃঢ় হয়। তখন ঈমানের এমন মধুরতা লাভ হয় যে, আল্লাহর পথের কষ্টের স্বাদের সামনে পৃথিবীর যাবতীয় স্বাদ তুচ্ছ হয়ে যায়। সে' তখন আল্লাহর সাহচর্য স্পষ্ট উপলব্ধি করতে আরম্ভ করে। চরম দুযোগপূর্ণ মৃহূর্তেও হতাশ হয় না। বরং স্বীয় রবের নামে প্রাণ বিলিয়ে দিয়ে শাহাদাত লাভের বাসনাই তার জীবনের পুঁজি হয়ে যায়।

11

11 ১. ফিলিস্তিনের বিখ্যাত আলিম মুজাহিদ ডঃ আবদুল্লাহ আযযাম__যিনি অনেক বছর আফগান জিহাদের 'বিপদসংকুল লড়াইসমূহে সর্বাগ্রে অবস্থান করেন, বিভিন্ন রণাঙ্গনে মুজাহিদ কমাণ্ডারদের সঙ্গে নিশিদিন সুক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ ও গভীর দৃষ্টিতে এই জিহাদকে অধ্যয়ন করেন_আফগান জিহাদ বিষয়ক তাঁর বেশ কয়টি গবেষণামূলক গ্রন্থ আরবী ভাষায় বার বার ছেপে বের হয়েছে। তিনি দু'বার দারুল উলুম করাচীতেও তাশরীফ আনেন। তাছাড়াও আফগান জিহাদের ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আমার বেশ কয়েকবার সাক্ষাত ঘটে__তিনি তাঁর জীবনকে জিহাদের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছেন। মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের শাহাদাতের পর যখন কতিপয় আফগান সংগঠনের উর্ধতন নেতার মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়, তখন তিনি তাদের মধ্যে সমঝোতা করানোর জন্য রাতদিন অবিরাম পরিশ্রম করেন। তাঁর এ বিষয়েরই একটি সফল প্রচেষ্টার পরপরই পেশওয়ারে ২৫শে রবিউস সানী, ১৪১০ হিজরী, শুক্রবার ২৪শে নভেম্বর, ১৯৮৯ ঈসায়ী) জুমুআর নামাযের জন্য তাঁর দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ীতে করে বাইরে আসা মাত্র একটি বোমার আঘাতে তাঁদের তিনজনকেই শহীদ করা হয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। বাহ্যত এটি এ সমস্ত বহির্দেশীয় সন্ত্রাসীদের অপতৎপরতা ছিল, যাদের মিশনই হলো মুজাহিদদের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করা।

***اے رہرو فرزانہ ، بے جذب مسلمانی***

***نے راہ عمل پیدا ، نے شاخ یقین نمناک***

**“**হে বুদ্ধিমান পথিক ***!*** খাঁটি মুসলমানের আবেগ ছাড়া

---

মরহুম শহীদ ডঃ আবদুল্লাহ আযযামের একটি গ্রন্থ 'আয়াতুর রহমান ফি জিহাদিল আফগান" অর্থাৎ “আফগানিস্তানের জিহাদে আল্লাহর বিস্ময়কর নিদর্শনাবলী ,। গ্রন্থটি এ সমস্ত বিস্ময়কর ঘটনাবলী ও কারামত সম্বলিত , যা এই জিহাদে বিভিন্ন স্থানে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি এ সমস্ত ঘটনাকে যেভাবে যাচাই করেছেন এবং সেগুলো উদ্ধৃত করার ক্ষেত্রে যেই পরিমাণ সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন করেছেন, সে প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি লেখেন_

“এ সমস্ত ঘটনাকে আমি নিজে মুজাহিদদের নিকট থেকে শ্রবণ করে লিখতাম। কেবলমাত্র তার ঘটনাই গ্রহণ করতাম , স্বয়ং যার সঙ্গে ঘটনাটি ঘটেছে , কিংবা যে স্বচক্ষে ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছে এবং ঘটনাগুলো যাচাই করতে করতে আমার নিকট 'তাওয়াতুরের ” পর্যায়ে পৌঁছেছে। ঘটনা বর্ণনাকারী মুজাহিদের নিকট থেকে বেশির ভাগ সময় আমি শপথও নিতাম। শহীদদের বিস্ময়কর ঘটনাবলী , ফেরেশতা ও অদৃশ্য শক্তিসমূহের জিহাদে অংশগ্রহণ করা, গুলি লাগা সত্ত্বেও অনেক সময় কাপড় পর্যন্ত না ফাটা , দুশমনের বর্ষণ করা গুলি অকার্যকর হওয়া __এ জাতীয় ঘটনাবলী “তাওয়াতুরে মা ‘নবী " দ্বারা অর্থাৎ এত অধিক সংখ্যক লোক দ্বারা একথা বর্ণিত হয়েছে , যাদের সবার মিথ্যার উপর একমত হওয়াকে বিবেক সায় দেয় না ) প্রমাণিত হয়েছে। ”

ডঃ সাহেব মুজাহিদ কমাণ্ডার আবদুল হামিদ সাহেবের এ কথাও তুলে ধরেছেন __

“যে সমস্ত বোমা , মিসাইল ও গোলা আফগানিস্তানে মুজাহিদদের উপর বর্ষণ করা হচ্ছে , তা যদি এ

আমলের পথও সৃষ্টি হয় না , বিশ্বাসের শাখাও সজীব হয় না ৭’

## মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী

খোস্ত রণাঙ্গনের প্রধান কমাণ্ডার মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী নিজেই এই জিহাদের এক জীবন্ত কারামাত। জিহাদের সূচনা থেকে আরম্ভ করে এ পর্যস্ত তিনি যে সমস্ত প্রলয়ংকর ঘটনা অতিক্রম করে কমিউনিষ্টদের জন্য “দুরারোগ্য ব্যাধিতে পরিণত হয়েছেন , সেজন্য তাঁকে একটি বিস্ময় বা জিহাদের “কারামতই' বলা সম্ভব। আফগানিস্তানের বর্তমানের নামেমাত্র প্রেসিডেন্ট ডঃ নজীবের মাতৃভূমি 'পাকতিয়া ,। প্রত্যেক যেরাউনের জন্য মুসা রয়েছে ”, মূলনীতির ভিত্তিতে তিনিও পাকতিয়ারই সেই মরদে মুমিন। ১৩৮৯ হিজরীতে

---

প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করত , বাস্তবে যা করার কথা ছিল, তাহলে মুজাহিদদের জন্য এক সপ্তাহকালও জিহাদ অব্যাহত রাখা সম্ভব হতে না। ”

অপর এক মুজাহিদ মৌলভী নাঈম সাহেবের এ কথাও তিনি উদ্ধৃত করেছেন _

“আমি যখন শত্রুপক্ষের বিমান দেখেছি , তার নিচে অবশ্যই “পাখি দেখেছি। আমি মুজাহিদদেরকে বলতাম__তোমরা খুশি হও , আল্লাহর সাহায্য চলে এসেছে। (এটি সেই বিরল -বিস্ময়কর পাখি , যার আলোচনা অনেক পূর্বে এই কিতাবে এসেছে _-রফী" উসমানী ) (আয়াতুর রহমান ফি জিহাদিল আফগান , পৃঃ ৩৫ -৩৬)

জানবাজ মুজাহিদ

তিনি পাকিস্তানের সুপ্রসিদ্ধ মাদরাসা দারুল উলুম হক্কানিয়া (আকুড়া, খটক) থেকে শিক্ষা সমাপন করেন। এ মাদরাসার নামের সঙ্গে সংযুক্ত করেই তিনি নিজের নামের সঙ্গে 'হাক্কানী' লেখেন। তিনি প্রসিদ্ধ মুজাহিদ সংগঠন “হিযবে ইসলামী” ইউনুস খালেছ গ্রুপ এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

তিনি এ সমস্ত খাঁটি আল্লাহওয়ালা আলিমদের প্রথম সারির অন্তর্ভূক্ত, যাঁরা কমিউনিজমের বিরুদ্ধে এ সময়ই তৎপরতা আরম্ভ করেন, যখন রাশিয়ানরা তাদের মিত্র জহির শাহ ও দাউদ খানকে বোকা বানিয়ে আফগানিস্তানে তাদের অনুপ্রবেশের দ্বিতীয় স্তর অতিক্রম করছিল। তারপর তারাকায়ী যখন দেশে কমিউনিষ্ট বিপ্লুব_ঘটায় তখন তিনি এ সমস্ত মহান ও দৃঢ় সংকল্প উলামায়ে কেরামের অগ্রভাগে ছিলেন, যাঁরা এ কাযের সরকারের বিরুদ্ধে সাথে সাথে সশস্ত্র লড়াই আরম্ভ করেছিলেন। তিনি নিজ গৃহকে বিদায় জানিয়ে পাহাড়ের মধ্যে মোর্চা গেড়ে বসেছিলেন। এটি রাশিয়ান সেনাবাহিনীর আগ্রাসনেরও প্রায় দেড় বছর পূর্বের কথা। সেদিনেও এবং আজকের দিনেও এই পাহাড় আর পাহাড়ী চাটানসমূহই এ সমস্ত ঈগলদের আবাস।

৫২ বছর বয়সী এই দরবেশ প্রকৃতির আলিমে দ্বীন মরদে মুজাহিদকে দেখে প্রথম যুগের মুসলিম সিপাহসালাহদের ছবি দৃষ্টির সম্মুখে ভেসে ওঠে। কৃশ দেহ, মধ্যম গঠন, লাল-সাদা মিশ্রিত গায়ের রং, নূরানী চেহারার উপর গাভির্ষপূর্ণ দাড়ি, ছোট তীক্ষ নয়নযুগল, মাথায় বিশাল পাগড়ী,

পার্শ্বদেশে ঝুলন্ত পিস্তল , বক্ষ গুলির পেটি দ্বারা সজ্জিত , হাতে ক্লাসিনকোভ , দৃঢ়সংকল্পী , আস্থাশীল কিন্তু বিনয় ও নম্রতার প্রতিচ্ছবি। __একবার তিনি দারুল উলূম করাচীতেও তাশরীফ আনেন। আমাদের আবেদনে তিনি আফগান জিহাদ বিষয়ের উপরই বক্তব্য রাখেন। নিজেও কাঁদেন , অন্যদেরকেও কাঁদান।

***کبھی تنہائی کو� و دمن عشق***

***کبھی سوز و سرور انجمن عشق***

***کبھی سرمایۂ محراب و منبر***

***کبھی مولا علی خیبر شکن عشق***

"কখনো প্রেমের পর্বত ও উপত্যকায় নির্জন বাস �

কখনো প্রেমের কাননে আনন্দ ও জ্বালায় আবাস�

কখনো মেহরাব ও মেম্বার তার পুঁজি �

কখনো খাইবার বিধ্বংসী মহান আলী তিনি �"

## বিস্ময়কর নুসরাত

সেই বক্তৃতায় তিনি "তারাকায়ীর , যুগের একটি ঘটনা শুনান (এখন হুবহু শব্দ তো স্মরণ নেই , তার সারাংশ তুলে ধরছি )__

"আমি আমার কয়েক শ' মুজাহিদকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ের মধ্যে আমার ঠিকানা তো বানিয়ে নেই __সেখান থেকে আমরা দুশমনের উপর হঠাৎ গেরিলা আক্রমণ করতাম -_কিন্তু আমাদের খাদ্য স্বল্পতা দেখা দেয়। একদিন

ভোরে ফজর নামাযের পর জায়নামাযে বসে কেঁদে কেঁদে মহান আল্লাহর নিকট নিবেদন করি-_হে আল্লাহ! আপনার এই নেককার বান্দারা আপনার জন্য জান কুরবানী দিতে সমবেত তো হয়েছে, কিন্তু তাদের খাবারের কি ব্যবস্থা হবেঃ আমি আমার নিজের ক্ষুধার কষ্টও সইতে পারি না, আমার সাথীদের ক্ষুধার কষ্টও সইতে পারি না। এ অবস্থায় কয়েক সেকেণ্ডের জন্য আমার তন্দ্রা আসে, আর তখন জনৈক লোক পিছন দিক থেকে আমার ডান কাঁধে হাত রেখে বলে- “আল্লাহর প্রতি কি খারাপ ধারণা কর?

আমি আমার একটু পূর্বের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আমি মস্তক অবনত করে বললাম__“না না, আমি তো খারাপ ধারণা করিনি"_ আওয়াজ ভেসে এলো-_তোমাকে এবং তোমার সাথীদেরকে তিনিই রিযিক দিবেন, যিনি এতদিন দিয়েছেন। এখন যখন তোমরা তাঁর পথে লড়াই করছো, এখন কি তিনি তোমাদেরকে উপবাস থাকতে দিবেন? এতো অধিক রিধিক পাবে যে, তোমরা গাছের ডালে গোস্ত ঝুলন্ত পাবে।”

এ ঘটনার পর খুব বেশী হলে দু” ঘন্টা সময় অতিক্রম করতেই এই দৃশ্য দেখে আমি হতভম্ব হয়ে যাই যে, সম্মুখের একটি বৃক্ষের ডালে জবাইকৃত দুটি ছাগল লটকে রয়েছে। সম্মুখে এক গ্রাম্য লোক দাঁড়িয়ে আছে। সে মুজাহিদদের জন্য এই ছাগল হাদিয়া এনে তখনই জবাই করে। তারপর থেকে আল্লাহর মেহেরবানীতে আমাদের আর কখনো খাদ্যের অভাব হয়নি।

তারাকায়ীর যুগের আরেকটি ঘটনা তিনি ডঃ আবদুল্লাহ আযযামকে শুনিয়েছেন__

“যে পাহাড়ের উপর আমরা অবস্থান করছিলাম, তার উপর কোথাও আগুন জ্বালাতে পারছিলাম না, কারণ, দুশমনের গুপ্তচর ধোঁয়া দেখতেই সরকারকে অবহিত করত। (এদিকে খাবার রান্না করা ছাড়া শীত থেকে আত্মরক্ষার জন্যও আগুনের তীব্র প্রয়োজন ছিল।) আমাদের এই সংকটকে আল্লাহ তাআলা এভাবে সমাধান করেন যে, 'মেঘ এসে আমাদের পাহাড়কে প্রায় এক বছর পর্যন্ত এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে যে, বাহির থেকে কেউ ধোঁয়া দেখতে পেত না।”

(আয়াতুর রহমান ফি জিহাদিল আফগান)

ঐ সময়েরই আরেকটি ঘটনা তিনি শুনান-

“তারাকায়ীর সময় কোন মুজাহিদ শহীদ হলে,আর সরকার তাকে চিনতে পারলে তার সমস্ত আপনজনকে হত্যা করত। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে আমাদের মধ্যে থেকে এমন কোন মুজাহিদ শহীদ হননি, যার পরিবারের লোকেরা জনবসতিতে বিদ্যমান ছিল। সমস্ত শহীদ ঐ সমস্ত পরিবারের ছিলেন, যাঁরা হিজরত করেছিলেন।”

(আয়াতুর রহমান ফি জিহাদিল আফগান)

মাওলানা বলেন--

“তারাকায়ীর শাসনকালে দুশমনের ট্যাংক ছিল আমাদের জন্য জটিলতম সমস্যা। ট্যাংক বিধ্বংসী কোন অস্ত্র (P2, P ৭ ইত্যাদি) আমাদের নিকট ছিল না। আমরা কিছু টাকা সংগ্রহ করে এ ধরনের কোন অস্ত্র খরিদ করার জন্য খুব খোঁজাখুজি করি, কিন্ত: আমাদের সকল প্রচেষ্টা বিফল হয়। সে সময় আমাদের

লোকসংখ্যা ছিল ৩৫০ জন। একদিন তারাকায়ীর এক হাজার সৈন্য আমাদের উপর ট্যাংক, তোপ ও মেশিনগান দ্বারা আক্রমন করে। তাদের সঙ্গে আড়াই দিন পর্যন্ত লড়াই চলতে থাকে। দুশমন পরাজয়বরণ করে। গনিমত স্বরূপ ২৫টি ট্যাংক বিধ্বংসী তোপ (P2, P ৭), কয়েকটি মেশিনগান, আটটি ট্যাংক এবং এক হাজার বন্দী আমাদের হাতে আসে। প্রত্যেক বন্দীর নিকট একটি করে ক্লাসিনকোভ ছিল। (আয়াতুর় রহমান ফি জিহাদিল আফগান)

তারপর যখন ১৯৭৯ ঈসায়ীর ডিসেম্বর মাসে রাশিয়ান সৈন্য এবং গানশিপ হেলিকপ্টার সর্বপ্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তাদের নিকট একটি বিমান বিধ্বংসী কামানও ছিল না। কয়েক বৎসর পর্যস্ত এমন নিঃসম্বল অবস্থায় দুশমনের আকাশপথের নির্যাতনের মুখে থাকতে হয়। এই বিমান বিধবংসী কামান তারা কিভাবে লাভ করলেন?

এতদসংক্রান্ত অনেক ঘটনা থেকে একটি ঘটনা-_- যা ১৯৮২ ঈসায়ীতে ঘটে__মাওলানা নিজেই শুনান__

“আমরা ৫৯ জন মুজাহিদ ছিলাম। দুশমন আমাদের উপর ২২০টি ট্যাংক এবং সাঁজোয়া গাড়ী নিয়ে আক্রমণ করে। কমিউনিষ্টদের সংখ্যা ছিল ১৫শ'। উপর থেকে তাদের বিমান অনবরত বোমা বর্ষণ করছিল। কিন্তু এ লড়াইয়ের ফলাফল এই হয় যে, দুশমনের ৪৫টি ট্যাংক এবং সেনা যান ধবংস হয়। ১৫০ জন কমিউনিষ্ট নিহত এবং একশ" জন আহত হয়। আর গনিমত স্বরূপ আমরা যে সমস্ত অস্ত্র লাভ করি তা'ছিল-_

বিমান বিধ্বংসী কামান ১টি, গ্রেনোফ গান- ৩টি, ক্লাসিনকোভ ৭টি, ৬৬মিলি মিটারের তোপ ১টি, কামানের গোলা ২৮০টি, গুলি ৩৬ হাজার।

মাওলানার সঙ্গে আমার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয় পেশওয়ারে। হাকীমূল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহঃ)এর খলীফা মাওলানা ফকীর মুহাম্মাদ সাহেব রহঃ) এই অধমকে রাতের খাবারে দাওয়াত করেন। আর এই দয়ার উপর বড় দয়া এই করেন যে, মাওলানা জালালুদ্দীন হক্কানী তখন পেশওয়ার অবস্থান করছিলেন; তিনি তাঁকেও দাওয়াত করেছিলেন। এ সমস্ত আল্লাহওয়ালাদের সাহচর্ষের এই মজলিস ছিল আমার জন্য মহান নিআমত। ডঃ আবদুল্লাহ আযযাম তত্প্রণীত গ্রন্থ 'আয়াতুর রহমান ফি জিহাদিল আফগান*এ মাওলাশী জালালুদ্দীন হক্কানী সম্পর্কে যে ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন, তা তখনও আমি জানতাম না। অন্যথায় মাওলানা হাক্কানীর বক্ষের উপর গুলির যেই পেটি তখন সজ্জিত ছিল তা" বিশেষ গুরুত্বসহকারে দেখতাম। কারণ, ডঃ আযযাম বলেন_

- “জালালুদ্দীন হকানী গুলির যে পেটি স্বীয় বক্ষের উপর বেঁধে রাখেন, সেই পেটিতে দুশমনের গুলি লেগে যে দাগটি পড়েছে, আমি সেই পেটির উপর স্বচক্ষে এ দাগ দেখেছি। অথচ গুলির দ্বারা তাঁর বক্ষের একটু চামড়াও ছিলেনি।” (আয়াতুর রহমান ফি জিহাদিল আফগান, পৃঃ ১১২)

এর চেয়েও আশ্চর্যজনক ঘটনা মাওলানার সহদর ভাই ইবরাহীম সাহেবের সঙ্গে ঘটে। তিনি বলেন-_

“২০শে শাবান ১৪০২ (৯৮২ ঈসায়ী) খোস্তের একটি রণাঙ্গনে আমাদের উপর বোমা বর্ষণ করা হয়। আমাদের দূরবীনও ভেঙ্গে. যায়। বোমের জ্বলন্ত টুকরা লাগার কারণে আমার সেলোয়ার পর্যস্ত জ্বলে যায়। কিন্ত আমার শরীরে কোন আঘাত লাগেনি। বোমা ও গোলার টুকরা অধিকাংশ মুজাহিদের শরীরে লাগে। কারো কারো গুলির পেটিও কেটে যায়। আর কাপড় তো বেশির ভাগ মুজাহিদেরই জ্বলে যায়। কিন্তু কেউই আহত হয়নি।” ( আযযাম বলেন ঃ ইবরাহীমের জ্বলে যাওয়া সেই সেলোয়ার আমি নিজে দেখেছি এবং তা আমার কাছে সংরক্ষিত রয়েছে।)

পাকিস্তানের সীমান্ত (মীরান শাহ) থেকে খোস্ত যেতে পাকতিয়া প্রদেশে প্রবেশ করতেই 'জাওয়ারের” পাহাড় সারির মধ্যে মাওলানা হক্কানীর জিহাদী মারকাজ (রণকেন্দ্রসমূহ) আরম্ভ হয়ে যায়। এখানে এই দরবেশ লোকটি ভয়ংকর পাহাড় বিদীর্ণ করে তার মধ্যে বহুসংখ্যক গভীর ও প্রশস্ত সুড়ঙ্গ তৈরী করেন। দুশমনের বোমার আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য এ সমস্ত সুড়ঙ্গের মধ্যে মসজিদ, অস্ত্র গুদাম, খাদ্য সামগ্রী, ঔষধের ভাণ্ডার, হাসপাতাল, গাড়ীর ওয়ার্কশপ, ওয়ারলেস স্টেশন এবং ব্যবস্থাপনা দপ্তরসমূহ ইত্যাদি তৈরী করা হয়েছে। সুড়ঙ্গের বাইরে মুজাহিদদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ট্যাংক এবং সাঁজোয়া গাড়ীসমূহ রয়েছে। মজার ব্যাপার এই যে, সমস্ত অস্ত্রের বেশির ভাগই দুশমনের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেওয়া। আর এখন-__

***اسی کی بیتاب بجلیو ں س خطر میں اس کا آشیان***

"তারই অস্থির বিদ্যুতের কারণে বিপদসংকূল রয়েছে তার নীড়।"

## সুড়ঙ্গের বিস্ময়কর ঘটনা [12]

১৯৮৫ এবং ১৯৮৬তে কমিউনিষ্টরা জাওয়ারের ক্যাম্পের উপর স্থল ও আকাশপথে দু 'বার তীব্র আক্রমণ করে। একবার মাওলানা ও তাঁর সাথীদেরকে পাহাড়ের সূড়ঙ্গের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু দুশমন সেই পাহাড়ে - উপরও এমন তীব্র বোমা বর্ষণ করে যে , পাহাড় বিধ্বস্ত হয়ে সূড়ঙ্গের মুখে এসে পড়ে। ফলে সূড়ঙ্গের মুখ তার নিচে চাপা পড়ে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। সে সময় পর্যন্ত সুড়ঙ্গ থেকে বের হওয়ার জন্য পিছন দিকে কোন পথ ছিল না। [13]

মাওলানা বলেন _

---

[12] এ ঘটনাটি আমি বেশ কয়েকজনের নিকট থেকে শুনেছিলাম , কিন্তু তাদের নাম স্মরণ ছিল না বিধায় এখন পর্যন্ত তা লিখিনি। সম্প্রতিকালে (আগস্ট ১৯৯১ ঈসায়ীতে ).আমি কয়েকজন সঙ্গী সহ গার্দে্য রণাঙ্গনে যাই। যাওয়ার পথে পাকিস্তানের সীমান্ত শহর মিরান শাহতে মাওলানার সঙ্গে তৃতীয়বার সাক্ষাৎ হয়। আমার আবেদনে তিনি ঘটনাটি আমাদেরকে সবিস্তারে শোনান।

[13]. এখন সে পথও তৈরী করা হয়েছে। উপরন্তু সমস্ত সূড়ঙ্গকে ভিতর ভিতর দিয়েই পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে।

"আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে যায় যে , এই সুড়ঙ্গই আমাদের কবরে পরিণত হবে। চরম বিচলিত অবস্থায় আমরা কালিমায়ে তাইয়্যেবা ও অন্যান্য দুআ দুরূদ পাঠ করতে আরম্ভ করি। কয়েক মিনিট পরই দুশমনের বিমান পুনরায় এসে তীব্র বোমা বর্ষণ আরম্ভ করে , কিন্ত এ বোমা বর্ষণ আমাদের মুক্তির মাধ্যম হয়ে যায়। একাধারে কয়েকটি বোমা বিধ্বস্ত অংশের উপর পতিত হয় , ফলে সেই বিধ্বস্ত অংশ সেখান থেকে এই পরিমাণ সরে যায় যে , আমরা বের হয়ে আসি। "

প্রায় দশ মিনিট পর এই একই ঘটনা এ কেন্দ্রের অন্য একটি সুড়ঙগে আত্মগোপনকারী মুজাহিদদের সঙ্গে ঘটে। তারাও দুশমনেরই পুনর্বারের বোমা বর্ষণের মাধ্যমে মুক্তিলাভ করে। এভাবে মহান আল্লাহর এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ প্রতিপত্তির সঙ্গে সম্পন্ন হয় _

**وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا**

অর্থ -'এবং যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে , আল্লাহ তার মুক্তির পথ করে দেন। " (সুরা তালাক, আয়াত ২)

এই আক্রমণে দুশমন অগ্নি -বোমা বর্ষণ করে সম্পূর্ণ বনে আগুন লাগিয়ে দেয়। একটি বোমার বিস্ফোরণের আঘাতে মাওলানা কয়েক ফুট উপরে উঠে আবার নিচে পড়ে যান। তখন নিচের জুলন্ত অগ্নিতে তাঁর পেট ও শরীরের কয়েক জায়গা পুড়ে যায়। আশংকাজনক অবস্থায় তাঁকে পেশওয়ার হাসপাতালে পৌঁছানো হয়। এখনও তাঁর পেটে পুড়ে

যাওয়ার গভীর ক্ষত রয়েছে , যা তিনি আমাদেরকেও দেখান।

দুশমনের এই আক্রমণের সময় মাওলানা আরসালান খান রহমানী _-যিনি মুজাহিদদের অপর একটি বৃহৎ সংগঠন “ইত্তেহাদে ইসলামী আফগানিস্তান , এর প্রসিদ্ধ কমাণ্ডার _ তিনি অন্য এক জায়গায় ছিলেন। তিনি এ সংবাদ জানতে পেরে অন্য বেশকিছু কমাণ্ডারের মত তিনিও কয়েক শ " মুজাহিদ সঙ্গে নিয়ে দীর্ঘ চক্কর কেটে সেখানে এসে পৌঁছেন এবং অকস্মাৎ দুশমনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। ফলে দুশমনকে তাদের বহু লাশ ফেলে পশ্চাদাপসরণ করতে হয়।

মাওলানা হাক্কানীর দৃষ্টি এ দিকেও নিবদ্ধ রয়েছে যে, বিজয়লাভের পর আফগানিস্তানকে শক্তিশালী ইসলামী ভিত্তির উপর পুনর্নির্সাণের জন্য একটি দ্বীনদার , শিক্ষিত , কষ্ট সহিষ্ণু এবং প্রশিক্ষপপ্রাপ্ত প্রজন্ম প্রয়োজন। সেজন্য তিনি অন্যান্য আফগান-দিশারীর ন্যায় মিরান শাহতে বিশাল এক আবাসিক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন__যার নাম . দিয়েছেন -- “মান্বাউল উলুম " তাতে আফগান মুহাজির শরণার্থীদের বিরাট সংখ্যক শিশু ও তরুণ শিক্ষা লাভ করছে। তারা এমন এক পাঠ্যক্রম ও প্রশিক্ষণ কোর্স ছারা শিক্ষা লাভ করছে , যা আগামীদিনের “সফল ইসলামী রাজ্যে ‘ যুগের দাবীসমূহ পূর্ণ করতে ইনশাআল্লাহ সহযোগী প্রমাণিত হবে।

***عشق فقیہ حرم ، عشق امیر جنود***

***عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام***

প্রেম হেরেমের ফকীহ , পরম সেনাবাহিনীর সিপাহসালার

প্রেম চিরপথিক , তার সহস্র গন্তব্য ”

## খোস্ত রণাঙ্গনে কমাণ্ডার যুবাইর

মুলতানের অদূরে আবদুল হাকীম নামে একটি কসবা (ইউনিয়ন ) রয়েছে। “খোখার, বংশের যুবাইর খালেদ সাত বছর বয়সে এখানেই পবিত্র কুরআন হেফয করেন। তখন থেকে তাঁর পরিবারের লোকেরা এখানেই বসবাস করছেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস . ছিল ঝং জেলার শোর কোট থানার ঝাকানাও গ্রামে। চব্বিশ বছর বয়সী যুবাইর খালেদের বৈবাহিক জীবনের ষষ্ঠ বছর অকিক্রান্ত হচ্ছে। একমাত্র আদরের মেয়ে সফিয়ার বয়স এখন সোয়া দুই বছর।

করাচীর কনফারেন্স শেযে যুবাইর খালেদ আমার নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করে নিজ বাড়িতে যান। তিনি এবার সাধারণ নিয়মের পরিপন্থী একাধারে নয়দিন বাড়ীতে অবস্থান করেন। অন্যথা সাধারণত তিনি রণাঙ্গনে যাতায়াতের পথে বাড়ীতে কিছু সময় অবস্থান করে চলে 'আসতেন। যেদিন তিনি গৃহে অবস্থান করতেন সেদিন হতো তার পুরা পরিবারের জন্য বড়ই আনন্দের দিন। স্ত্রী - কন্যা , মাতা -পিতা ও ভাই -বেরাদারদের জন্য যেন ঈদের দিন চলে আসতো। এবার যুবাইরও আনন্দে আটখানা ছিলেন। রারণ , বাড়ী আসার মাত্র দশদিন পূর্বে আল্লাহ তাআলা তাঁকে চিত্তহারী অপূর্ব এক ছেলে সন্তান দান করেছেন। একজন বুযুর্গ ব্যক্তি চার নায় রাখেন আবদুললাহ। লাম রেখে স্মিত হোসে

জানবাজ মুজাহিদ

তিনি বলেন 'মুজাহিদের ছেলে মুজাহিদ হবে"__-আবদুল্লাহ-বিন-যুবাইর।

14

তাঁর জীবনসঙ্গিনী__যিনি একথা জেনে বুঝেই এই মুজাহিদ গাজীর জীবন সঙ্গিনী, হওয়াকে. বরণ করে নিয়েছিলেন যে,. তার অবস্থান বিপদসংকূল রণাঙ্গনে হবে অধিক, আর বাড়ীতে হবে নিতাস্তই কম-এ কারণে খুশি ছিলেন যে, তাঁর স্বামী ইসলামের দুশমনদের সম্মুখে বুক পেতে দিয়েছেন। তাঁর জন্য এই কল্পনা পরম মধুময় ছিল যে, বিচ্ছেদের যাতনা সহ্য করে তিনিও এই পবিত্র জেহাদে অংশ নিচ্ছেন। তিনি এ কথা ভেবে দীর্ঘ সময়ের জন্য নিজের কষ্টকে ভূলে থাকতেন যে, তিনি স্বীয় স্বামীকে রণাঙ্গনে প্রেরণ করে এঁ সমস্ত আফগান ভগ্নিদের দুঃখের অংশীদার হয়েছেন, যাদেরকে দুশমন গৃহহীন করে দিয়ে প্রবাসের জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য করেছে। যাদের নিষ্পাপ শিশুদেরকে অগ্নি বোমার প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা ভস্ম করে দিয়েছে। যাদের ভালবাসা বিরান করে দেওয়া হয়েছে। পিতার স্নেহছায়া ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। যাদের আপন ভাইদেরকে তাদের চোখের সম্মুখে গুলি করে বাঁঝরা করে দেওয়া হয়েছে_আমার স্বামী যে সমস্ত আফগান ভাইদের কীধে কাধ মিলিয়ে লড়াই করছেন, তাঁরাও কোন মায়ের মমতা, সোহাগিনী স্ত্রীর সোহাগ, মেয়ের মাথার ছায়া এবং

14 কমাণ্ডার যুবায়ের সম্পর্কে এখানে এবং পরবর্তীতে বর্ণিত পারিবারিক বিবরণের অধিকাংশই মাসিক আল-ইরশাদ, জুমাদাল উখরা ও রজব ১৪০৯ হিজরী থেকে সংগৃহীত। অবশিষ্ট বিবরণ আমাকে তাঁর বড় ভাই জনাব হাজী ফয়েজ রাসূল ছাহেব মৌখিকভাবে বলেছেন।

কোন বোনের পরম আরাধ্য__তাদের সহযোগিতা করা একটি ধর্মীয় দায়িত্ব, আর আমার স্বামী সে দায়িত্বই পালন করছেন।

একবার যুবায়েরকে পরিবারের লোকেরা জিজ্ঞাসা করে 'এবার কবে আসবে? তিনি মুচকি হেসে ভঙ্গিতে বলেনঃ প্রতিবার একথাই জিজ্ঞাসা
কর যে, "কবে আসবে? কিন্তু একথা জিজ্ঞাসা করনা যে, “কবে, যাবে?_তিনি বিভিন্ন কথার মধ্যে দিয়ে সঙ্গিনীকে বুঝাতেন যে, “শরীয়তে দুঃখ-বেদনায় অশ্রু প্রবাহিত করার তো অনুমতি আছে, কিন্ত উচ্চস্বরে কাঁদা অর্থাৎ 'নওহা” করা জায়েয নাই। আমি শহীদ হলে 'নওহা” করবে না। সফিয়াকে পবিত্র কুরআন হেফয করিয়ে উচ্চতর ধর্মীয় শিক্ষা দান করবে।_এবার তিনি এই হেদায়েতও দান করেন—আবদুল্লাহ যখন পাঁচ বছর বয়সের হবে, তখন আমার ক্লাসিনকোভ দিয়ে তাকে রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দিবে।”

বাড়ীতে আসার অষ্টম দিনে খোস্ত রণাঙ্গন থেকে সহকারী কমাণ্ডারের পক্ষ থেকে তিনি সংবাদ পান_প্রোগ্রামকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার জন্য আপনার প্রতীক্ষায় রয়েছি।”

পরেরদিন ভোরবেলা ৭ই জানুয়ারী ১৯৮৯ ঈসায়ী কমাণ্ডার যুবাইর রণাঙ্গনে যাওয়ার জন্য পূর্ণ প্রস্ততি নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। ওষ্ঠদ্বয়ে সেই মুচকি হাসি, নয়ন যুগলে সেই সংকল্প-দীপ্তি। সম্মুখে মাতাপিতা, ভাই-বোন, জীবন সঙ্গিনী, মেয়ে সফিয়া ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, যাদের চেহারায় অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য আচ্ছন্ন করে আছে।

তাঁদের নিকট থেকে তিনি একে একে বিদায় নিচ্ছিলেন। সর্বশেষে যুবাইর প্রথমে সফিয়াকে অতঃপর কচি ছেলে আবদুল্লাহকে কোলে তুলে আদর করেন। কিছু দুআ পাঠ করেন এবং "আল্লাহর হাতে তুলে দিলাম " বলে সবাইকে সালাম করে দ্রুতপদে রওয়ানা হয়ে যান। তাঁর গালতীর্পূণ মুখমণ্ডল বাড়ীর লোকদেরকে অনেকটা ক্ষমা ভিক্ষার ভঙ্গিতে বলছিল-_

***اس جُ□د طلب س□□ی قائم بنیاد □□ بزم □ستی کی***

***و□ موج فنا □و جاتی □□ جس موج کو ساحل ملتی □□***

"অন্বেষার এই সাধনার উপরই বিশ্ব আসর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে ,

সেই তরঙ্গ নিঃশেষ হয়ে যায় _-যে উপকূল লাভ করে।"

রণাঙ্গনে পৌঁছেই তিনি ওস্তাদ আব্দে রাব্বির রাসূল সাইয়াফের সংগঠন 'ইত্তিহাদে ইসলামী আফগানিস্তান , এর স্থানীয় আফগান কমাণ্ডার মাওলানা পীর মুহাম্মাদ এবং নিজের সহকারী কমাণ্ডারদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। পরিশেষে খোস্তের দু 'টি গুরুত্বপূর্ণ রণাঙ্গন "তোর কামার , এবং "বাড়ির উপর আক্রমণের তারিখ নির্ধারিত হয় ১২ই জানুয়ারী। আক্রমণের হক্ষিপ্ত প্রোগ্রাম সম্পর্কে পাকিস্তানের দ্বীনী মাদরাসাসমূহের মুজাহিদ তালিবে ইলমদেরকে পূর্বেই অবহিত করা হয়েছিল। তারা মাদরাসা

থেকে কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে এখানে একত্রিত হতে আরম্ভ করেন। .

শীতকালীন তুষারপাত এবং তীব্র শীতের কারণে আফগানিস্তানে রণ -তৎপরতা প্রায় স্থবির হয়ে যায়। তখন সিংহভাগ মুজাহিদ পরিবারের দেখাশোনা ও জীবিকা আহরণের জন্য পাকিস্তান . চলে যান। যুদ্ধের ক্যাম্পসমূহে সাধারণত শুধুমাত্র ক্যাম্প চালু রাখা যায় পরিমাণ অল্প কিছু মুজাহিদ অবস্থান করেন। এ সময় শকত্রপক্ষ শুধুমাত্র প্রতিরক্ষামূলক কৌশল গ্রহণ করে থাকে। পোষ্ট ও ক্যাম্পসমূহে তাদের লোকসংখ্যাও কমে যায় , তারা বড় ধরনের কোন আক্রমণের আশংকাও করে না _ সম্ভবত এ কারণেই কমাণ্ডার যুবাইর এবং তার সহযোদ্ধারা তাঁদের চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য এই তীব্র শীত মৌসুমকে নির্বাচন করেছিলেন। এমনিতেও কমাণ্ডার যুবাইর এবং তাঁর বিশিষ্ট বন্ধুদের তৎপরতা ঋতুর অধীন ছিল না। শীতের সময় তিনি পাকিস্তানগামী আফগান ভাইদের নিকটবর্তী ক্যাম্পস্মূহও সামলিয়ে থাকেন। নিজের ক্যাম্পকে তৎপর রাখার কোন সুযোগই হাতছাড়া করেন না। তাই সে সময়ে তিনি অন্য সময়ের তুলনায় বর আরো অধিক তৎপর থাকেন এবং অন্যদেরকেও ব্যস্ত রাখেন। তার ধর্ম ছিল এই —

***نوارا تلخ نرمی زن چوں ذوق نغم کم یابی***

“সুর -সঙ্গীতে অরুচি এসে গেলে বেদনা
ভারাক্রান্ত মূর্ছনায় ঝংকার তোল ।”

খোস্তের চতুপার্শ্ব
খোস্ত রণাঙ্গন আমি দেখেছি। খোস্ত রণাঙ্গনটি কয়েকটি বড় বড় রণাঙ্গনের সমনৃয়ে গঠিত। রণাঙ্গনটি এত অধিক লম্বা- চওড়া যে, জায়গাই সবিস্তারে দেখতে পেরেছি। তার মানচিত্র অনেকটা এরূপ যে, খোস্ত শহরের চতুর্দিকে প্রায় ১৫ মিটার করে উন্মুক্ত ময়দান। তার মধ্যে কোথাও কোথাও শস্যক্ষেত, বাগান এবং ছোট ছোট জনবসতিও রয়েছে। এই ময়দানটিকে চতুর্দিক থেকে পাহাড়সারি ঘিরে রেখেছে। এভাবে এটি বিশাল আকারের একটি “পিয়ালার, রূপ ধারণ করেছে। যার আয়তন কয়েক শ' কিলোমিটার ব্যাপী বিস্তৃত।

এ সম্পূর্ণ “পিয়ালাটি দীর্ঘদিন ধরে মুজাহিদদের দ্বারা অবরুদ্ধ ছিল। খোস্তে রসদ পৌঁছার স্থলপথসমূহ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল। মুজাহিদদের বিভিন্ন সংগঠন চতুর্দিকের পাহাড় থেকে ক্রমে ক্রমে খোস্তের ময়দানের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। পিয়ালার প্রান্তের ন্যায় দূরবর্তী পাহাড়সমূহ অধিক উঁচু। সেখান থেকে ময়দানের দিকে__যাকে বিশাল আকারের এই পিয়ালার তলা বলা যায়_-যতই নেমে আসা হবে পাহাড়ের উচ্চতা ততই ছোট হয়ে এসেছে। এমনকি উন্মুক্ত প্রান্তরে চলে আসতে আসতে শুধুমাত্র ছোট ছোট পাহাড় এবং টিলা রয়েছে। তারপর উন্মুক্ত প্রান্তর আরম্ভ হয়েছে। প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে “শামিল” নদী বয়ে চলেছে। যার উত্তর তীরে সুদৃশ্য খোস্ত শহর অবস্থিত। দূরবর্তীর উঁচু পাহাড়সমূহ থেকে প্রান্তর এলাকা

পর্যস্তও বছ মাইলের চরম দুর্গম দূরত্ব রয়েছে। যা অসংখ্য ছোট বড় পাহাড় দিয়ে পরিপূর্ণ। এই দূরত্ব কেবলমাত্র পায়ে হেটে কিংবা ঘোড়া ও খচ্চরে আরোহণ করেই অতিক্রম করা সম্ভব। চতুর্দিকের এই পর্বতসারি দুশমনের প্রথম প্রতিরক্ষা ব্যুহ, যা কয়েক দিক থেকে মুজাহিদগণ অনেকটাই ভেঙ্গে দিয়েছে! দ্বিতীয়. প্রতিরক্ষা লাইন ময়দান এলাকা। এখানকার পাহাড়ের মধ্যে দক্ষিণ থেকে পূর্ব দিকের তিনটি পাহাড় ছিল সর্বোচ্চ-_১. দক্ষিণে 'মানিকণ্ডু, ২. তার সংলগ্ন অল্প একটু পূর্ব দিকে সরে গিয়ে "রাগবেলি", ৩. তার থেকে কয়েক মাইল দূরে ' পূর্ব দিকে 'তোরগড়া?।

তোরকামার রণাঙ্গণ
মানিকণ্ডু এবং. রাগবেলির উপর মুজাহিদরা কিছু দিন পূর্ব থেকেই দখল কায়েম করেছিলেন। বরং পাহাড় থেকে আরো অনেক দূর অগ্রসর হয়ে ময়দানের দিকের অধিকাংশ ছোট বড় পাহাড় দখল করে নিয়েছিলেন। সুতরাং এখন হরকাতুল জিহাদিল ইসলামীর ক্যাম্প মানিকণ্ডু এবং রাগবেলি থেকে অনেক নিচ “দরবেশ কারারগাহণতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। যা ময়দানের দিকে অবতরণ করতে সেদিকের একটি বড় পাহাড় চূড়ার উপর অবস্থিত।

এখান থেকে ময়দান এলাকায় অবতরণ করতে দুশমনের বড় একটি ক্যাম্প (কারারগাহ)

[15]'তোরকামার, এবং তার দুটি পোষ্ট প্রতিবন্ধক ছিল। যেগুলো এই পর্বতসারিরই নিচের পাহাড়সমূহের উপর ময়দানের নিকটবর্তী স্থানে বানানো হয়েছে। এই ক্যাম্পটি জয় হলে দুশমনের এদিককার প্রথম প্রতিরক্ষা লাইন ভেঙ্গে পড়ত এবং মুজাহিদরা এদিক থেকে ময়দান এলাকায় আক্রমণ করার সুযোগ লাভ করত। এদিকেই ময়দানের মধ্যে খোস্ত জেলার "দুরগাই , [16]নামক একটি তহসীল থানা ) রয়েছে -_যার বিশেষ সামরিক গুরুত্ব রয়েছে। তাও মুক্ত করার পথ উন্মুক্ত হতো। আর এজন্যই তোরকামার এবং তার 'পোষ্টসমূহের উপর চূড়ান্ত আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল।

***جس کو ہو فکر آبلہ پانی وہ نہ ہ ہمارے ساتھ***
***نہ چلے***

***وہ بھی ہمارے ساتھ نہ آئے ، جس کو جنون ہو***
***منزل کا***

**-** **"**যার পায়ে ফোস্কা পড়ার ভয় রয়েছে , সে যেন আমাদের সাথে পথ না চলে ।

---

[15] আফগানিস্তানে "কারারগাহ , এ সেনা ক্যাম্পকে বলা হয় , যেখানে খাদ্য , অস্ত্র গোলাবারুদ এবং সামরিক সাজ-সরঞ্জামের ভাণ্ডার থাকে এবং স্খোন থেকে আশপাশের পোষ্টসমূহ (সেনা প্রতিরক্ষা চৌকি )কে এ সমস্ত রসদ যোগান দেওয়া হয় এবং সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

[16] এই একই নামের পাকিস্তানের মরদান জেলাতেও একটি তহসীল রয়েছে।

আর যে গন্তব্যের পাগল সেও যেন আমাদের
সহচর না হয় ।”

## “বাড়ী ” রণাঙ্গন

“তোরগোড়ার উপর এখন পর্যন্ত দুশমনের দখল বহাল আছে এবং তার সর্বোচ্চ চূড়ার উপর তাদের অত্যন্ত শক্তিশালী চৌকি বিদ্যমান রয়েছে। এখান থেকে খোস্তের বিমান বন্দর অতি নিকটে এবং তা পরিষ্কার দেখা যায়। খোস্ত বিজয়ের জন্য এই চূড়াটি মুজাহিদদের দখল করা সর্বচে ” বেশী জরুরী ছিল। যাতে করে এখান থেকে তারা বিমান বন্দর এবং তাতে অবতরণকারী বিমানসমূহকে নিশানা বানিয়ে খোস্তের রসদ পৌঁছার আকাশ পথকেও বন্ধ করে দিতে পারে।

কিন্তু এখানে পাহাড়ের বিন্যাস ব্যতিক্রম ধরনের। অন্যান্য পাহাড় সারির বিপরীতে -এখানে দূরের পাহাড় --যেগুলো মুজাহিদদের দখলে . রয়েছে __নিচু। বর্তমানে এ পাহাড়ের একটি ঝর্ণার মধ্যে হরকাতুল জিহাদিল ইসলামীর উপকেন্দ্র রয়েছে। ময়দানের সঙ্গে সংযুক্ত দুশমনের দখলকৃত পাহাড়টি এখানকার সর্বচেয়ে উঁচু পাহাড়। এদিক থেকে ময়দানে অবতরণ করতে মুজাহিদদের পথে এই পাহাড়টিও প্রতিবন্ধক ছিল এবং তার বরাবরে পশ্চিম দিকে 'বাড়ী 'র পাহাড়সমূহও প্রতিবন্ধক ছিল। 'কারণ, এ সমস্ত পাহাড় জুড়ে দুশমনের গুরুত্বপূর্ণ ক্যাম্প ‘ট্যাংকওয়ালী ’ এবং অন্যান্য কয়েকটি পোষ্টও ছিল। “বাড়ী ” ক্যাম্প জয় করা ছাড়া এদিক থেকে খোলা

ময়দানে আক্রমণ করা সম্ভব ছিল না এবং তোরগোড়ায় আরোহণ করাও সম্ভব ছিল না। কারণ 'বাড়ী 'র ক্যাম্প এবং পোষ্টসমূহ তোরগোড়ার সংরক্ষণ করতো এবং সেখানে রসদও পৌঁছাতো।

সারকথা এই যে, প্রায় নয় কিলোমিটারব্যাপী বিস্তৃত বাড়ী রণাঙ্গনটি ছিল দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ক্যাম্প। এটি বিজয় হলে মুজাহিদদের জন্য এদিক থেকে ময়দানে অবতরণ করা সম্ভব হতো শুধু তাই নয়, বরং তোরগোড়ার রসদ বন্ধ করে দিয়ে তার উপর আরোহণের পথও পাওয়া যেত।

আর এজন্যই বাড়ীর উপর চূড়ান্ত আক্রমণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

এ উভয় পরিকল্পনাই ছিল বিপদসংকূল, কিন্তু মুজাহিদগণ যে শিক্ষণীয় হাকীকতের সন্ধান আফগানিস্তানে এসে পেয়েছেন, তা মরহুম ভাইজানের -ভাষায় এই -_

***طوفان سے، بھی برق سے ڈرتے ہی رہیں گے***

***جینے کی تمنا میں تو مرتے ہیں رہیں گے***

“কখনও তুফানকে আর কখনও বিদ্যুতকে ভয় করতে থাকবো,

**- .** তাহলে বাঁচার চিন্তাই তো মরে যাবে ”

- কমাণ্ডার যুবাইয়েরের জন্য খোস্ত অঞ্চল নতুন ছিল না। তিনি উরগুন বিজয়ের পূর্বেও এখানে দীর্ঘদিন পর্যন্ত চরম নিঃসম্বল অবস্থায় শুকনা রুটি, ডাল ও গুড় খেয়ে এবং কখনো অনাহারে দিন . কাটিয়ে দুশমনকে

নাকানি -চুবানী খাইয়েছেন। তাঁর ১৯৮৫ ঈসায়ীর ডাইরী [17] থেকে জানা যায় যে , সে সময় তাঁদের ক্যাম্প এই পাহাড় সারিতেই “লিজা” নামক স্থানে ছিল। এ স্থানটি তোরকামার ও 'বাড়ী 'র মধ্যখানে অবস্থিত। সেখান থেকে তিনি এবং তাঁর সঙ্গীগণ দুশমনের ট্যাংক , বিমান ও হেলিকপ্টারের সঙ্গে দিনরাত লড়াই করেন।

উরগুন বিজয় থেকে অবসর লাভ করার পর এখন তিনি কিছুদিন ধরে তোরকামার এবং “বাড়ীর উপর চূড়ান্ত আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন _ প্রত্যেক বিজয়ের পর তিনি নিজেকেও এবং সাথীদেরকেও এই শিক্ষাদানে অভ্যস্ত ছিলেন _

***ا جرآت رندانہ ، کچھ اور بھی ہمت کر***

***موجوں کو بنا ساحل، ساحل پر نظر کیوں ہو***

“হে প্রেমোম্মাদ দুঃসাহসী ! আরও কিছু হিম্মত কর ।

তরঙ্গমালাকে উপকূল বানাও , কুলের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ কর না ।

ইতিপূর্বে যখন তিনি প্রায় দুই সপ্তাহের জন্য পাকিস্তান আসেন তখন “বাড়ী "র রণাঙ্গনে সহকারী কমাণ্ডার মাওলানা আবদুর রহমান ফারুকীকে এবং তোরকামার রণাঙ্গনে

---

[17] এই ডায়েরীর কিছু অংশ ইসলামাবাদ থেকে প্রকাশিত 'মাসিক আল ইরশাদ রবিউস সানী ১৪১১ হিজরী সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এখন সেই ডায়েরীটিই আমার সম্মুখে রয়েছে।

জানবাজ মুজাহিদ

খালেদ মাহমূদ (করাচী)কে নিজের স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছিলেন। আদিলকে খালেদ মাহমুদের সহকারী নিয়োগ করেছিলেন এবং কোনরূপ বিরতী ছাড়া লড়াইয়ের প্রস্ততি অব্যাহত রাখার জন্য তাকিদ করেছিলেন। এই তিন তরুণ সেই পুরাতন, বিজ্ঞ, জানবাজ মুজাহিদ-_যাঁদের কিছু কৃতিত্বের কথা জামাখোলার শেষ লড়াইয়ে পাঠকের সম্মুখে এসেছে।

নিঃসম্বলদের প্রস্তুতি
কমাণ্ডার যুবাইর পাকিস্তান রওয়ানা হওয়ার সময় এখানকার খরচের জন্য খালেদ মাহমৃদকে শুধুমাত্র তিন হাজার টাকা দিয়ে যেতে পেরেছিলেন। অথচ তখন সেখানে একশ” বিশজন মুজাহিদ অবস্থান করছিলেন, দশজন আরব, বিশজন ফিলিপাইন ও মালয়েশিয়ার, কয়েকজন বাংলাদেশী, অবশিষ্টরা পাকিস্তানী। তাঁদের সকলের থাকা খাওয়া ও অন্যান্য যাবতীয় প্রয়োজন এ টাকা দিয়েই পূর্ণ করতে হবে (জন প্রতি দৈনিক এক টাকা তেত্রিশ পয়সা)।

এই অভাবের সর্বচেয়ে বড় কারণ এই যে, মুজাহিদদের জন্য অন্যান্য দেশ থেকে যে সমস্ত সাহায্য আসে, তা শুধুমাত্র আফগান সংগঠনের মুজাহিদদের জন্যই আসে। “হরকাতুল জিহাদিল ইসলামী” আফগান সংগঠন নয়, তাই তাব্বা সরাসরি এই সাহায্য পায় না। এই সংগঠনটি উস্তাদ সাইয়াফের সংগঠন "ইত্তেহাদে ইসলামী আফগানিস্তান-এর সাথে সংযুক্ত। ইত্তেহাদি ইসলামী

আফগানিস্তানের খোস্তের কমাণ্ডার মাওলানা পীর মুহাম্মাদ সাহেব সাহায্যের যে অংশ পান তারই মধ্য থেকে কিছু হরকাতুল জিহাদিল ইসলামীকে দিয়ে থাকেন।

কমান্ডারের স্থলাভিষিক্ত খালেদ মাহমৃদ যুবাইর সাহেবের অবর্তমানে কিভাবে সময় অতিবাহিত করেছেন, সে অবস্থা তিনি নিজেই বর্ণনা করেন-

“শীত ছিল প্রচণ্ড। কখনো কখনো বৃষ্টি ও তুষারপাত হতো। সাথীদের সংখ্যার তুলনায় বিছানা ছিল কম। আমি সাথীদেরকে কোন কখনো “অঙ্গারদানী*র নিকট বসে নিশি যাপন করতাম, কখনো আটার খালি বস্তা দ্বারা কম্বলের কাজ নিতাম। আমাদের ক্যাম্প “দররেশ কারার গাহ” মাত্র তিন চারটি কামরার সমনুয়ে গঠিত ছিল। কিছু সাথী রাত্রিবেলায় পাহারা দানের ডিউটিতে নিয়োজিত থাকতো। কিন্তু এ কামরা কয়টি অবশিষ্টদের জন্যও যথেষ্ট হতো না। আমিও-বেশীর ভাগ রাতে পাহারা দিতাম। যখন শোয়ার পালা আসতো, তখন অতি কষ্টেই শোয়ার জায়গা পেতাম। সাথীরা কামরার উভয়দিকের দেয়ালের সঙ্গে মাথা লাগিয়ে এবং পরস্পরের দিকে পা বিছিয়ে দিয়ে শুতো। মাঝখানে যাতায়াতের জন্য যে সামান্য জায়গা বাঁচতো, আমি তার মধ্যে শুয়ে পড়তাম। ভোরবেলা উঠে নামায, তিলাওয়াত ও অন্যান্য আমল শেষ করে সর্বপ্রথম লাকড়ি কাটতাম। যাতে করে সারাদিনের প্রয়োজন পুরা করা এবং রাতের “অঙ্গারদানীর' জন্য ইন্ধনের ব্যবস্থা হয়ে যায়। তারপর সাথীদেরকে কয়েক গ্রুপে বিভক্ত করে আমরা দুশমনের এলাকায় “রেকী”

অর্থাৎ দুশমনের এলাকায় দুশমনের তৎপরতা ও কার্যক্রম গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করা) করার জন্য বের হতাম, আর কখনো সাথীদেরকে অস্ত্র প্রশিক্ষণও দান করতাম”

“তোরকামারের” লড়াইয়ের অন্যান্য স্মৃতির সঙ্গে এই বিস্তারিত ' বিবরণও খালেদ মাহমুদ সাহেব আমার অনুরোধে লিখেছেন। শেযে তিনি লেখেন যে, “এসর্ব কথা এজন্য লিখছি যে, আমি কমাণ্ডার যুবাইর সাহেবকে সর্বসময় সাহীদের এভাবে খেদমত করতে দেখেছি।”

কমাণ্ডার সাহেবের অবর্তমানে তিনি সামরিক অনুশীলন এবং পাহাড়ের উপর জমাট বাধা বরযের উপর “স্কাইটিং' এর ধারাও অব্যাহত রাখেন। স্কাইটস তিনি নিজেই বানিয়েছিলেন। স্কাইটিংয়ের মাধ্যমে বরফাচ্ছাদিত পাহাড়ের উপর দ্রুত পথ অতিক্রম করা যায়। শুনেছি যে, “সিয়াচন গিলিশিয়ার--এ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর জানবাজ মুজাহিদরাও এটি ব্যবহার করে থাকে।

মাওলানা আবদুর রহমান ফারুকী, খালেদ মাহমুদ, আদিল ও তাঁর সাথীরা রাতদিন নিজ নিজ এলাকা এমনভাবে চযে বেড়ান এবং পর্যবেক্ষণ করেন যে, তাঁরা এখানকার প্রত্যেক উঁচু নিচু স্থান, বরং দুশমনের দৈনন্দিনের কর্মসূচি এবং তাদের যাতায়াতের পথসমূহ সম্পর্কেও অবগত হন। এখন তাঁরা নব আগন্তক সাথীদেরকে সেগুলো অবহিত করছিলেন।

কমাণ্ডার যুবাইর পাকিস্তান থেকে ফিরে আসতেই ১২ই জানুয়ারী আক্রমণের জন্য

“তোরকামার রণাঙ্গন' নিজে সামলান এবং হরকাতুল জিহাদিল ইসলামীর মুজাহিদদেরকে - নিজের সঙ্গে রাখেন। “বাড়ী”র রণাঙ্গনের দায়িত্ব মাওলানা পীর মুহাম্মাদ ও সহকারী কমাণ্ডার মাওলানা আবদুর রহমান ফারুকীর উপর ন্যস্ত হয়। তাঁদের সঙ্গে হরকাতুল জিহাদ ছাড়া ইত্তেহাদে ইসলামীর আফগান মুজাহিদগণও ছিলেন। উভয় রণাঙ্গনের মাঝে দূরত্ব ছিল কয়েক মাইলের পাহাড়ী পথ। উভয়ের উপর একই সময় আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল, যেন দুশমনের মনোযোগ উভয় দিকে বিক্ষিপ্ত থাকে।

এ সময় বড় ও মাঝারী পাহাড়সমূহের উপর তৃষারপাতও তীব্র হয়েছিল। কিন্তু এ সমস্ত জানবাজ মুজাহিদদের বক্ষে দৃঢ় সংকল্পের যে অঙ্গার ভ্বলছিল, তা তাঁদেরকে মৌসুমের তীব্রতার ব্যাপারে উদাসীন করে দেয়। তারা আক্রমণের প্রতীক্ষায় একেকটি ঘন্টা গুণে গুণে কাটাচ্ছিলেন।

অস্থির প্রতীক্ষার পর ১২ই জানুয়ারীর সূর্য উদয় হয়। কিন্তু রওনা হওয়ার একটু পূর্বে হঠাৎ “বাড়ী” থেকে সংবাদবাহক পয়গাম আনে যে, তারা প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে পারেনি। তাই পরশুদিন আক্রমণ হবে।

এ খবর শুনে সাথীদের আবেগে যেই আঘাত লাগে, কমাণ্ডার যুবাইর যথাসময়ে স্বীয় বক্তব্য দানের মাধ্যমে কোনভাবে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন। তিনি তাদেরকে ধৈর্য ও আমীরের আনুগত্যের ব্যাপারে কুরআনের শিক্ষার কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

“বাড়ীর অবস্থান ছিল অনেক দুরে। ছোট ওয়ারলেস সেট দ্বারা সেখানকার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব ছিল না। পরের দিন কমাণ্ডার যুবাইর পাকিস্তান সীমান্তের নিকটবর্তী মুজাহিদদের ক্যাম্প “ঝাওয়ার , গিয়ে ওয়ারলেসের মাধ্যমে “বাড়ীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তখন 'বাড়ী , থেকে এই ধৈর্যসংকুল উত্তর আসে যে , “আমরা এখনও কতক স্থানে মিসাইল ও তোপ বসাতে পারিনি। আক্রমণ কালকে নয় বরং ১৬ই জানুয়ারী করা সম্ভব। ”

কমাণ্ডার যুবাইর অস্থির হয়ে ওঠেন। এক মুহূর্ত নীরব থেকে তিনি ধীর আওয়াজে এ কথা বলে ওয়ারলেস বন্ধ করে দেন - “আমি আক্রমণকে আর স্থগিত রাখার মত পজিশনে নেই। আমার অধিকাংশ সাথী মাদরাসার ছাত্র , তাদের ছুটি শেষ হয়ে যাচ্ছে , আমরা প্রোগ্রাম মত কালকেই আক্রমণ করব।” ॥

মোটকথা, আগামীদিন ১৪ই জানুয়ারীতেই তোরকামার এর উপর আক্রমণের সিদ্ধান্ত ঠিক থাকে। কিন্তু “বাড়ীর উপর আক্রমণ দুদিনের জন্য পিছিয়ে যায়।

***کافی نہیں ہے ترک تمنا ہی عشق میں***

***سامان عشق بے سرو سامانیاں بھی ہیں***

“প্রেমের পথে আশা -আকাংখা পরিহার করাই শুধু যথেষ্ট নয় ,

নিঃসম্বলতাও প্রেমপথের পাথেয় ।”

মুজাহিদদের বাহিনীসমূহ তোরকামারের উপর আক্রমণের জন্য মুজাহিদদেরকে নিম্নোক্ত পাঁচটি বাহিনীতে বিভক্ত করা হয়-

১. আক্রমণকারী বাহিনী নং ১ঃ এটি ষাটজন জানবাজ মুজাহিদের সমন্বয়ে গঠিত। এ বাহিনী সরাসরি যুবাইর সাহেবের নেতৃত্বে তোরকামারের ক্যাম্পের উপর আক্রমণ করবে।

২. আক্রমণকারী বাহিনী নং ২? ত্রিশজন মুজাহিদের এই বাহিনীকে ক্যাম্পের পূর্বদিকে 'লাগ্ডেমল পোস্ট” এবং তার সহযোগী পোষ্টের উপর আক্রমণ করতে হবে। তাদের প্রধান ছিলেন বাংলাদেশী মুজাহিদ মঞ্জুর হুসাইন।

৩. মর্টার তোপ বাহিনী এই বাহিনী নাসরুল্লাহ জিহাদইয়ারের নেতৃত্বে পাঁচজন মুজাহিদের সমন্বয়ে গঠিত। একে ক্যাম্প এবং উভয় পোষ্টের উপর অনেক দূরের একটি উঁচু পাহাড় থেকে দুপুর থেকেই মর্টার তোপ (এম.এম. ৮২) দ্বারা গোলা বর্ষণ আবন্ত করতে হবে। যেন ক্যাম্প এবং পোষ্ট পরস্পরকে সাহায্য করতে না পারে এবং ব্যাপক আক্রমণ আরম্ভ হতে হতে দুশমনের উপর এতটুকু চাপ পড়ে যে, তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে।

৪. কোরদাতা বাহিনী এটি মৌলভী আবদুর রহমান মাহমৃদের নেতৃত্বাধীন ছিল। তাদেরকে আসরের পর ক্যাম্পের নিকটস্থ একটি চূড়া থেকে দূশমনের উপর ছোট তোপ (আর.আর.৮২) এবং রকেট দ্বারা ফায়ারিং করতে হবে। যেন

আক্রমণকারী বাহিনী এই ফায়ারের আড়ালে সম্মুখে অগ্রসর হতে পারে।

৫. করাচীর ঈগল খালেদ মাহমুদকে তিনজন মুজাহিদ সঙ্গে নিয়ে দুশমনের অতি নিকটের একটি উঁচু চূড়ার উপর অতি প্রত্যুষে চলে যেতে হবে। তিনি সেখান থেকে ওয়ারলেসযোগে কমাণ্ডার সাহেবকে দুশমনের - গতিবিধি সম্পর্কে অবহিত করবেন। এবং দুপুর থেকে মর্টার তোপের জন্য "ও.পি"র দায়িত্বও সম্পাদন করবেন। কারণ, দূরের যেই পাহাড় থেকে "জিহাদ ইয়ারকে' তোপ চালাতে হবে, সেখান থেকে তাদের লক্ষ্যবপ্ত পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। তার নিশানা লক্ষ্যস্থলের উপর ঠিক করার পর খালেদ মাহমুদকে আক্রমণকারী বাহিনী নং ১-এ অন্তর্ভূক্ত হতে হবে। সকল মুজাহিদ এই প্রতীক্ষায় রাত্রিযাপন করেন —

***خورشید! سرا پردے مشرق سے نکل کر***

***پہنا مرے کہسار کو ملبوس حنائی***

`ওহে সূর্য ! পূর্ব দিগন্তের অন্তরাল থেকে উদিত হয়ে

আমার পর্বতসারিকে মেহদী রাঙ্গা পরিধেয় পরিয়ে দাও !'

## দুআ কবুলের সময়ে ফুঁপিয়ে কান্না

কমাণ্ডার যুবাইরের তাঁবু ছিল মুজাহিদ ক্যাম্প থেকে একটু দূরে। মাওলানা - সাআদাতুল্লাহ সাহেব ছিলেন তাঁর তাঁবুর

মধ্যের পাঁচ সাথীর অন্যতম। মাওলানা সাআদাতুল্লাহ হরকাতুল জিহাদিল ইসলামীর সূচনাকাল থেকে নিজেকে জিহাদের জন্য ওয়াকফ করে রেখেছেন। তিনি অনেকাংশে এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে গণ্য হন। প্রতীক্ষার এই রাতে তিনি যখন নিজের পাহারার ডিউটি থেকে অবসর হয়ে দেহের তখন যুবাইর সাহেব আফগান মুজাহিদদের নিকটবর্তী একটি ক্যাম্পে পূর্বেও প্রত্যাবর্তন করেননি।

তিনি বলেন যে, তিনটার দিকে ফৌপুানীর ক্ষীণ আওয়াজে আমার চোখ খুলে যায়। কমাণ্ডার সাহেব জায়নামাযে দুই হাত প্রসারিত করে শব্দের মধ্যে তার যে সর্ব শব্দ আমি শুনতে পাই, তার বিষয়বস্ত ছিল এই_

“হে আল্লাহ! আমার কত সাথী তো তোমার
পথে শাহাদাত লাভ করেছেন।… কিন্তু দীর্ঘ আট বছরে আমার দেহে কখনো আঘাতও লাগেনি।.... আমি আপনার বড় পাপী বান্দা। এমন তো নয় যে, আমার পাপের কারণে আপনি আমার খুন আপনার রাস্তায় কবুল করতে অস্বীকার করেছেন.. ”

মাওলানা সাআদাতুল্লাহ বলেন_আমি উঠে উযুর প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলাম__পানির বর্ণা অনেক দূরে নিচে ছিল, ত তাই উধুর জন্য আমরা আগুনে বরফ গলিয়ে নিতাম। ওদিকে কমাণ্ডার সাহেব ঘুমস্ত সাথীদেরকে জাগাতে আরম্ভ করেন। তাঁর এই বাক্য বার বার শোনা যাচ্ছিল যে, “সাথীরা ওঠো! বিজয় মঞ্জুরীর সময় এটিই।” তিনি প্রত্যেক আক্রমণের পূর্ব রাতে তাহাজ্জুদের জন্য সাথীদেরকে এ বাক্য দ্বারাই জাগাতেন।

*تیری نوا سے ہے بے پردہ زندگی کا ضمیر*

*کہ تیرے ساز کی ، فطرت نے کی ہے مضرابی*

**إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ**

অর্থ আল্লাহ ঈমানদারদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে, অতঃপর হত্যা করে ও নিহত হয়। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এ ব্যাপারে তোদের সাথে) সত্য প্রতিশ্রুতি জান্নাতের) হয়েছে। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং এ লেনদেনের উপর আনন্দিত হও যা তোমরা তার সাথে করেছো। আর এ হল মহান সফলতা । (সূরা তাওবা, ১১১ আয়াত)

শেষ রাকআতে যখন “কুনুতে নাযেলা, পাঠ করেন, তখন তিনি নিজেও কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

আজ আসর নামাযের পর “তোরকামারের' যে ক্যাম্প এবং দু’টি পোষ্টের উপর আক্রমণ করা হবে, সেগুলো এখান থেকে উত্তরে খোলা ময়দানের নিকটবর্তী জায়গায় অবস্থিত। এখান থেকে সেগুলোর আকাশ পথের দূরত্ব তো দুই কিলোমিটারের বেশী হবে না, কিন্তু পায়ে হেটে পাহাড়ী পথের দূরত্ব ছিল দুই-আড়াই ঘন্টার পথ। তাই খালেদ মাহমূদ তার মিশনে ফজরের আযানের পূর্বেই রওয়ানা হয়ে যান। তাকে বিদায় করার সময় কমাণ্ডার যুবাইর হঠাৎ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনার নিকট কোন টাকা-পয়সা আছে কি?

“আমার কাছে তো কিছুই নেই।” খালেদ তার উর্দির পকেটে হাত রেখে উত্তর দিলেন।

“আমরা আহত হলে মিরাণশাহ বা পেশওয়ারে টাকার প্রয়োজন হতে পারে।,

একথা বলে কমাণ্ডার সাহেব তার পকেটে পাঁচশ” টাকা পুরে দেন।

খালেদ মাহমুদ বলেনঃ

“আমি এবং আমার তিন সাথী দ্রুত রওয়ানা হয়ে যাই ঠিকই, কারণ, প্রভাতের আলো ফুটে ওঠার পূর্বেই দুশমনের সর্বচেয়ে নিকটের চূড়ার উপর আমাদেরকে পৌঁছতে হবে, কিন্তু কমাণ্ডার সাহেবের শেষ কথাটি আমার মন-মগজে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত ঘুরপাক খেতে থাকে।

দুর্গম গিরিপথ। বরযের. উপর দিয়ে কিছুদূর পথ চলার পর যতই আমরা নিচে অবতরণ করছিলাম এবং দুশমনের নিকটতর হচ্ছিলাম ততই বাতাস দ্রুততর হচ্ছিল এবং বরফপাত কমে আসছিল__অভূক্ত ছিলাম তাই পথের ধারের বুনো যায়তুন খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করি। অবশেযে আমরা যায়তুনের পাহাড়ী জঙ্গল অতিক্রম করে একটি পানির নালার মধ্যে অবতরণ করি। নালাটিও ছোট-বড় বিক্ষিপ্ত পাথর দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, তবে কিছুটা সমতল এবং উত্তরমূখী ছিল। আমরা এ নালা ধরে পথ চলতে থাকি। তারপর বামদিকের আমাদের অভীষ্ট পাহাড়-চূড়ায় আরোহণ করে দুশমনের চোখ থেকে আত্মরক্ষার জন্য প্রত্যেকে উপযুক্ত স্থানে পজিশন গ্রহণ করি। আমি বসা ছিলাম সবার সামনে। দুশমনের ক্যাম্প ছিল আমার উত্তর-পূর্বে ময়দানের দিকে একটি নিচু পাহাড়ের উপর_ক্যাম্পটি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। আমি বিলম্ব না করে কমাণ্ডার সাহেবের সঙ্গে ওয়ারলেসে যোগাযোগ করি। এখানকার অবস্থা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করি।”

***سرگشتہ ترے غم میں ہواؤں کی طرح تھے***

***ہم وشت میں آوارہ صداؤں کی طرح تھے***

"তোমার প্রেম -বেদনায় আমরা বাতাসের ন্যায় দিকবিদিক ছুটছিলাম ।

বনে -জঙ্গলে এবং মাঠে প্রান্তরে আমরা উদাস শব্দ -তরঙ্গের ন্যায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলাম ।"

## সহকারী কমাণ্ডার আবদুর রহমান ফারুকী

দশটার সময় সম্মিলিত দুআর পর যখন আরো কয়েকটি বাহিনী নিজ নিজ মোর্চা অভিমুখে যাত্রা করেছে এবং অবশিষ্ট মুজাহিদের দৃষ্টি কমাণ্ডার সাহেবের হুকুমের প্রতি নিবদ্ধ রয়েছে এমন সময় হঠাৎ সম্মুখস্থ তুষারাচ্ছাদিত পাহাড় থেকে সহকারী কমাণ্ডার মাওলানা আবদুর রহমান ফারুকীকে অবতরণ করতে দেখা যায়। মুহাম্মাদ জহীরও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। এঁরা "বাড়ীর , রণাঙ্গনে ছিলেন। আর ফারুকী সাহেবকে তো পরশু দিন সেখানকার আক্রমণে কমাণ্ড করতে হবে। সবার প্রশ্নবোধক দৃষ্টি তর উপর নিবদ্ধ হয়।

ফারুকী সাহেব এসেই প্রথমে সালাম করেন এবং কমাণগ্ডার সাহেবের নিকট ওজর পেশ করে বলেন, "আমরা 'বাড়ী " থেকে অর্ধরাত্রির কাছাকাছি সময়ে রওয়ানা হয়েছি , কিন্তু তারপরও পৌঁছতে দেরী হয়ে গেছে। "

কিছুক্ষণ নীরব থেকে তিনি পুনরায়
বলেন, 'গত রাতে আমরা সবাই পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত করেছি যে, আজকে আক্রমণ করা থেকে আপনাকে বিরত রাখা 'হবে। যেন পরশু দিন উভয় রণাঙ্গনে একই সময়ে আক্রমণ করা যায়। মাওলানা পীর মুহাম্মাদ সাহেব ও অন্যান্য সাথীরা আপনাকে. সালাম জানিয়েছেন। আর দুদিনের জন্য আক্রমণ পিছিয়ে দিতে আপনাকে সম্মত করার জন্যই আমি এসেছি।

‘খুব ভাল হয়েছে, আপনি সময়মত এসেছেন।' কমাণ্ডার সাহেব মুচকি হেসে বললেন “এখানে আপনার প্রয়োজন ছিল। কিন্ত আজকের আক্রমণ মুলতবী করা এখন আর সম্ভব নয়। কয়েকটি গ্রন্প সম্মুখে রওনা হয়ে গেছে। গোলা- বারুদ এবং রসদপত্রও চলে গেছে। তাই এখন আপনিও আমাদের সঙ্গে আক্রমণে শরীক হোন।”

কমাণ্ডার সাহেব এমনভাবে কথাগুলো
বললেন যে, তিনি আর অস্বীকার করতে পারলেন না। আজকের.আক্রমণে অংশগ্রহণের আহবান শুনতেই তিনি মাথা পেতে নেন।

তখনও তিনি কিছু একটা বলার জন্য কথা খুঁজছিলেন, এমন সময় কমাণ্ডার সাহেব নির্দেশ প্রদান করেন যে, “আপনি মঞ্জুর হুসাইন সাহেবের সঙ্গে মিলে 'লাগ্ডেমল পোষ্ট এর উপর আক্রমণের কমাণ্ড হাতে নির্জন?

মুজাহিদদের এই মারকাযে একটিমাত্র ঘোড়া ছিল। কমাণ্ডার সাহেব সেটিও ফারুকী সাহেবকে দিয়ে দেন। রসদপুত্র ও আহতদেরকে আনা নেওয়ার প্রয়োজনে তা কাজে আসবে।

কিছুক্ষণ পরই ফারুকী সাহেবের বাহিনী উত্তর দিকে যাত্রা করে।

***ان کو منزل کی پروا کہاں،***

***جن کم عزم سفر مل گیا***

“যে ব্যক্তি সফরের দৃঢ়সংকম্প লাভ করেছে ,

তার গন্তব্যের চিন্তা কিসের ?”

দুনিয়া বিরাগী , ইবাদতগুজার তরুণ আবদুর রহমান ফারুকী ৰাংলাদেশের যশোর জেলার অধিবাসী। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান তিনি। প্রাইমারী স্কুলে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর আশপাশের মাদরাসাসমূহ থেকে প্রাথমিক দ্বীনী শিক্ষা অর্জন করেন। তারপর উচ্চতর দ্বীনী শিক্ষার জন্য নানাপ্রকার কষ্ট সহ্য করে একাকী ভারত চলে আসেন। সেখানে দারুল উলুম দেওবন্দে দরসে নেযামীর সপ্তম বছর চলাকালীন আফগান জিহাদের বিবরণ শুনে ব্যাকুল হয়ে যান। নিজের কিতাবপুত্র , বিছানা -বাক্স , এমনকি পরনের কিছু কাপড় পর্যন্ত বিক্রি করে. ট্রেনের ভাড়া সংগ্রহ করেন। তারপর জিহাদের বাসনা তাঁকে অতি কষ্টে পাকিস্তানে নিয়ে আসে।

লাহোর থেকে তিনি সোজা দারুল উলুম করাচী আসেন। এখানে এসে কতক ছাত্রের মাধ্যমে হরকাতুল জিহাদিল ইসলামীর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা আমীর শহীদ মাওলানা ইরশাদ আহমাদের পথনির্দেশে ১৯৮৫ ঈসায়ীতে আফগানিস্তান যান এবং সেখানেই থেকে যান। তিনি উরগুন , শারানা ,

মোটাখান, গজনী, জাজী ও খোস্তের বিপদসংকুল লড়াইসমূহের অগ্রভাগে ছিলেন।

তিনি হিন্দুস্তান থেকে এসেছিলেন বিধায় প্রথম দিকে “আবদুর রহমান হিন্দী, নামে প্রসিদ্ধ হন। আমিও মুজাহিদদের বিভিন্ন পুস্তকে তাঁর কৃতিত্বের কথা এ নামে পড়েছি। দুশমনের বিছানো মাইন সন্ধান করে তা বের করে ফেলা, তারপর সে মাইনকেই দুশমনের পথে বিছিনোর তাঁর বিশেষ আগ্রহও ছিল এবং পারদর্শিতাও ছিল। এভাবে তিনি দুশমনের অসংখ্য ট্যাংক, সাঁজোয়া গাড়ী এবং সেনা ট্রাক ধ্বংস করেন।

২৫শে জুন ১৯৮৫ ঈসায়ীর যেই রক্তাক্ত লড়াইয়ে মাওলানা ইরশাদ আহমাদ সাহেব (রহঃ) শহীদ হন, সেই লড়াইয়ে তিনিও আহত হন। পরবর্তীতেও তিনি এত অধিকবার আহত হন যে. দেহের খুব কম জায়গাই হয়ত আঘাতমুক্ত ছিল। উরগুনের একটি লড়াইয়ে তাঁর একটি চোখও মারাত্বক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চিকিৎসার জন্য সংগঠন তাকে জার্মান পাঠায়। আলহামদুলিল্লাহ, তিনি সেখান থেকে সুস্থ হয়ে ফিরে আসেন।

গত বৎসর ছুটি নিয়ে তিনি মাতৃভূমি বাংলাদেশে যান। সেখান থেকে কলকাতায় তাঁর কতিপয় আত্মীয়ের বাড়ীতে যান। পরিবারের বড়রা তাকে বিবাহ করানোর ইচ্ছা করেন। কিন্তু এমন রিক্তহস্ত তরুণ__যে বলে যে, “কয়েকদিন পরই রণাঙ্গনে চলে যাব্র_-এর নিকট কেউ নিজের মেয়ে দিতে প্রস্তুত ছিল না। কলকমাণ্ডার একটি পরিবার তাঁর জিহাদের গুণের ভক্ত ছিল। সেই পরিবারের এক সৌভাগ্যবতী নারী আখেরাত কামানোর বাসনায়

নিজের মুরুব্বীদের অনুমতিক্রমে তাকে স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়ে গ্রহণ করে নেন।

বিবাহের কয়েক দিন পর আফগানিস্তান এসে পুনরায় জিহাদে নিমগ্ন হন। কিছুদিন পূর্বে পুনরায় কলকাতা ঘুরে আসেন। আর এখন তো পাহাড়চূড়ায় আমার বাস "_অবস্থা। দুনিয়া বিমুখতা, ইবাদত-বন্দেগী, সদাচরণ, ভদ্রতা, শালীনতা, বীরত্ব ও নির্ভীকিতা এবং সমরবিদ্যায় অতি উন্নত পারদর্শিতা ইত্যাদি গুণ মুজাহিদদেরকে তাঁর আসক্ত ও অনুরক্ত বানিয়ে দেয়। সাথীদের সাথে সদাচরণ ও সহমর্মিতা এবং কাফের দুশমনের উপর আল্লাহর গযব রূপে আপতিত হওয়া তাঁর বিশেষ গুণ ছিল।

পবিত্র কুরআন সাহাবায়ে কেরামের বিশেষ একটি গুণ এই বর্ণনা করেছে --

**مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ**

অর্থ "মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আর যারা তাঁর সঙ্গে রয়েছে (সাহাবায়ে কেরাম) তাঁরা কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে বিনম হৃদয়।" সূরা আল ফাতাহ, আয়াত নং ২৮)

এ গুণের বিরাট অংশ তিনি লাভ করেন। তিনি কমাণ্ডার যুবাইরের বিশিষ্ট বন্ধু এবং প্রথম সহকারী কমাণ্ডার। তাঁর কণ্ঠস্বর ও শব্দ ধ্বনিতে এমন প্রেমের দহন ছিল যে, পবিত্র কুরআনের জিহাদ বিষয়ক আয়াতসমূহ, আবেগোদ্দীপক জিহাদী তারানা এবং জিহাদ বিষয়ে তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতা মুজাহিদ সাথীদের মধ্যে সংকল্পের বন্যা বইয়ে দিত।

লড়াইয়ের ময়দানে তিনি যখন আযান দিতেন ,
তখন ইকবালের এই কবিতা জীবন্ত হয়ে উঠত -_

***دنیا کی عشا ہو جس سے اشراق***
***مومن کی اذاں ندائے آفاق***

দিকচক্রবালকে আহবানকারী মরদে মুমিনের
আযান জগতের

অন্ধকার নিশিকে প্রভাতের অরুণ -কিরণে
উদ্ভাসিত করো ।

পরশুদিন 'বাড়ীর " আক্রমণে তাঁকে নেতৃত্ব দিতে হবে , আজকেও "লাণ্ডেমল পোষ্ট " এবং তার সহযোগী "তারে লোটা পোষ্ট " এর উপর আক্রমণের কমাণ্ড তাঁর উপর ন্যস্ত করা হয়।

## তোরকামার রণীজন [18]

কমাণ্ডার যুবাইরের বাহিনী দীর্ঘ দুই ঘন্টা সময় সংকীর্ণ ও দরখম ঢালু পথ ধরে সফর করার পর যখন উত্তরের সেই ([19])নালার

---

[18] রক্তাক্ত এই লড়াইয়ের ষে সমস্ত বিবরণ ইতিপূর্বে এবং সম্মুখে বর্ণনা করা হয়েছে , তার সবই আমি সে সমস্ত জানবাজ মুজাহিদের নিকট থেকে মৌখিক এবং লিখিত সংগ্রহ করেছি , যাঁরা এ লড়াইয়ে শরীক ছিলেন। এতদ্যতীত মাসিক "আল ইরশাদের, জুমাদাস সানিয়া ও রজব সংখ্যা থেকেও সাহায্য নিয়েছি।

[19] আফগানিস্তানে বর্ষাকালের পাহাড়ী নালাকে "লোগাঠ' কলে। এ সমস্ত লোগাঠ দ্বারা মুজাহিদরা প্রায় প্রত্যেক রণাঙ্গনে খুবই উপকৃত হয়েছেন এবং নিত্যনতুন সামরিক সুবিধা লাভ করেছেন , রাশিয়ান সৈন্যদের হয়তো ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে ধারণাও ছিল না। মুজাহিদরা এই নালা দ্বারা সড়কের

মধ্যে অবতরণ.করে, যা দিয়ে ভোরবেলায় খালেদ মাহমূদ অতিক্রম. করেছিলেন, তখন যোহরের সময় হয়ে গেছে। সম্মুখে এই নালারই ডান দিকে একটি উঁচু পাহাড়ের উপর খালেদ মাহমুদ এবং তাঁর তিন সাথী মুনাওয়ার, হানীফ ও আসগর ভোর থেকে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন এবং ওয়ারলেসের মাধ্যমে কমাণ্ডার সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। আর এখন দুশমনের উপর গোলা বর্ষণ করাচ্ছিলেন। নাসরুল্লাহ জিহাদ ইয়ার এবং তাঁর সাথীদের-_যাঁরা অনেক পিছনে দক্ষিণের অনেক উঁচু একটি পাহাড়ে মর্টার তোপ নিয়ে মোর্চা গেড়ে বসেছিলেন__এখন দুশমনের ক্যাম্প এবং পোষ্ট দ্ধয়ের উপর তীদের লক্ষ্যস্থির হয়ে গিয়েছিল। তাই কমাণ্ডার সাহেব খালেদ মাহমৃদকে নিচে ডেকে নিয়ে তাঁর বাহিনীতে অন্তর্ভূক্ত করে নেন।

কাজ নিয়ে বহু মাইল পথ অতিক্রম করে থাকে। এই নালা পাহাড়ের ভিতর হওয়ার কারণে তাঁরা দুশমনের দৃষ্টি এড়াতে সক্ষম হন। এই লোগাঠ খোলা ময়দানে হলে মুজাহিদরা তার ভিতর দিয়েই অগ্রসর হয়ে অকস্মাৎ দুশমনের বুকের উপর গিয়ে উঠে বসে। লোগাঠগুলো ছোট-বড় পাথর দ্বারা ভরা থাকে। কোথাও অল্প বিস্তর পানিও থাকে। কিন্তু মুজাহিদরা তাদের দোল খাওয়া ও পিলপিল করে চলা গাড়ীসমূহকে তার মধ্যে দিয়ে নিশিদিন এমন নিশ্চিন্তে চালিয়ে থাকেন, যেমন কিনা সড়কের উপর দিয়ে পথ চলছেন। উরগুন, খোস্ত ও গারদেযে-আমি এর অভিজ্ঞতা লাভ কৰি।( রফী" উসমানী)

কমাণ্ডার যুবাইরের ইমামতিতে এখানেই যোহর নামায আদায় করা হয়। খাওয়া - দাওয়ার ঝামেলা ছিল না। কারণ , আজ সকালের নাস্তা এবং দুই বেলার খাবার হিসাবে সকালবেলাতেই প্রায় একগজ ব্যাসের অত্যন্ত পাতলা চাপাতি রুটি অর্ধেক অর্ধেক করে সমস্ত মুজাহিদের মধ্যে .সালুন ছাড়া বন্টন করে দেওয়া হয় __যেন যার যখন ক্ষুধা লাগে সে তার পকেট থেকে রুটি বের করে বিস্কুটের মত খেয়ে নিতে পারে। খাদ্যগ্রহণের ব্যাপারে তাদের মানসিকতা এই-_

***خوردن برا زیستن و ذکر کرد نست***

***تو معتقد ک زیستن برا خوردن است***

“খাদ্যগ্রহণ জীবনধারণ এবং আল্লাহর যিকির করার উদ্দেশ্যে ,

আর তোমার বিশ্বাস হলো খাদ্যগ্রহণের জন্যই জীবন ধারণ করা হয় ”

এখান থেকে দুশমনের তোরকামার ক্যাম্প ছিল উত্তর পূর্বে। আকাশ পথে তার দূরত্ব তো খুবই কম ছিল , কিন্তু পথ আঁকাবাঁকা ও উঁচুনিচু : হওয়ার কারণে স্থলপথের দূরত্ব এক দেড় কিলো .মিটারের কম ছিল না। মধ্যবতী পাহাড়ের কারণে এখান থেকে তা " দৃষ্টিগোচরও হচ্ছিল না। সহকারী কমাণ্ডার আবদুর রহমান ফারুকী যে পোষ্টদ্বয়ের দিকে গিয়েছেন তা " এই ক্যাম্পেরও পূর্ব দিকে এখান থেকে বেশ দূরে অবস্থিত।

আগা জহীর সফদরের নেতৃত্বে 8/৫ জন মুজাহিদের ক্ষুদ্র একটি বাহিনীকে প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জীম দিয়ে এখানেই রেখে দিয়ে কমাণ্ডার যুবাইরের বাহিনী এই নালা ধরেই সম্মুখপানে যাত্রা করে।

জিহাদ ইয়ারের 'গোলার জবাবে দুশমনও এলোপাতাড়ি গোলা বর্ষণ করছিল। কিন্তু তারা অগ্রসরমান এই মুজাহিদ দল সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর ছিল। তাদের সমস্ত ফায়ার ব্যর্থ হচ্ছিল।

এই নালা উত্তরদিকে কিছু দূর সম্মুখে গিয়ে উত্তরপূর্ব দিকে মোড় নিয়েছে। সেই মোড় অতিক্রম করে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে নালাটি একৈবেকে খোলা ময়দানে গিয়ে পড়েছে। কিন্তু মুজাহিদদেরকে এখান থেকে ডান দিকের একটি টিলায় আরোহন করতে হবে। সেই টিলা পার হলে এ পাহাড় আরম্ভ হয়, যার উপর দুশমনের ক্যাম্প রয়েছে। এই টিলায় আরোহণ কালে সম্মুখ দিক থেকে দুশমনের আক্রমণ করার সম্ভাবনা তো নিতাস্তই ক্ষীণ ছিল, কারণ জিহাদ ইয়ারের উপূর্যুপরি গোলাবর্ষণ তাদেরকে ক্যাম্পের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকতে বাধ্য করেছিল। তাছাড়া ক্যাম্প ছিল আড়ালে, তাই দুশমন তাদেরকে সেখান থেকে দেখতে পাওয়া কঠিন ছিল। কিন্ত এই মোড়ের বামদিকে উত্তর পশ্চিমে দুশমনের শক্তিশালী পোষ্ট “সোনাগাজী” রয়েছে। তার উপর আক্রমণ করা আজকের প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কিন্তু এই টিলার উপর আরোহণ কালে এমন কিছু জায়গা আছে, যেখানে মুজাহিদদেরকে পিছন দিক থেকে এ পোষ্ট সহজেই দেখতে পারবে। আর

এমন হলে পূর্ণ পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

কমাণ্ডার সাহেব খালেদ মাহমূদের উপর.
এই দায়িত্ব অর্পণ করেন যে, সে সাথীদেরকে এখান থেকে দু'জন দু্জন করে দল গঠন করে এই পথ অতিক্রম করাবে। আর তিনি নিজে আদীলেরস্সঙ্গে এখানে অবস্থান করে এই কাজ পর্যবেক্ষণ করেন।

যখন সমস্ত মুজাহিদ বৃক্ষের আড়াল দিয়ে ঝুঁকে ঝুকে এই পৌঁছে যায়, তখন কমাণ্ডার সাহেব এবং আদীলও তাদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হন_পূর্ব প্রোগ্রাম মত তখন “জিহাদ ইয়ারের” গোলা বর্ষণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যেন অগ্রসরমান' এই বা্ণহনী তাঁর গোলার আওতায় না পড়ে।

যে পাহাড়ের পাদদেশে এখন এই জানবাজরা দীড়িয়ে আছেন, তারই নাম “তোরকামার”। এরই একটি চূড়ার উপর দুশমনের ক্যাম্প। এখান থেকে ক্যাম্পটি দেখা যাচ্ছিল না। তার পিছনে উত্তরদিকে অনেক দূর পর্যস্ত টালু, যা শেষ পর্যস্ত খোস্তের নিকটবর্তী দুশমনের দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা লাইন “খোলা ময়দানে" গিয়ে শেষ হয়েছে।

এই পাহাড়ের উপরই ক্যাম্পের একটু আগে ডানদিকে তার সর্বোচ্চ চূড়া “তোরকামার সার'। তার উপর মৌলভী আবদুর রহমান মাহমূদের রকেটবাহী দল অল্প আগে পৌঁছে পজিশন নিয়েছে। দুই মাস পূর্ব পর্য্ত “তোরকামার সার" চূড়ার উপরও দুশমনের একটি পোষ্ট ছিল। মাওলানা পীর মুহাম্মাদ সাহেবের তরুণ সহকারী আফগান কমাণ্ডার মাওলানা আবদুল ওলী

সাহেব এই চূড়া জয় করেন। সেই লড়াইয়ে তাঁর একটি চোখ তো শহীদ হয়ে যায় এবং তার স্থলে পাথরের একটি কৃত্রিম চোখ বসানো আমি নিজেও দেখেছি; তবে পোষ্টটি এমনভাবে ধবংস হয় যে, একদম বিরান ভূমিতে পরিণত হয়। এখন মৌলভী আবদুর রহমান মাহমুদের বাহিনী সেখানেই ওৎ পেতে বসেছিল।

কমাণ্ডার যুবাইরের বাহিনী বৃক্ষ ও পাথরের আড়ালে অর্ধ চন্দ্রাকারে পাহাড়ের ওপর আরোহণ আরম্ভ করে। পাহাড়ে আরোহণ তখনও কিছু বাকি রয়েছে এবং তখনও ক্যাম্প সম্মুখে আসেনি এমন সময় ৪টা ৩৫ মিনিটে কমাণ্ডার সাহেব নির্দেশ দেন যে, প্রত্যেক সাথী যে যেখানে আছে, সেখানেই একাকী.আসরের নামায পড়ে নাও।”

মাওলানা সাআদাতুল্লাহ বলেন যে, ৪টা ৪৫ মিনিটে কমাণ্ডার সাহেব আমাদের নিকট এসে জিজ্ঞাসা করেন-__কোন সাথী আছে কি, আমরা জামাআতে নামায পড়ি? কিন্তু সবাই নামায পড়ে নিয়েছিলেম্*। তিনিও আমার নিকট একা নামায আদায় করেন।

ওদিকে আদীল আবদুল গাফফারকে__যার নিকট রকেট লাঞ্চার ছিল__সতর্কতাস্বরূপ ডানদিকের একটি পাথরের আড়ালে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেন। সেখান থেকে ক্যাম্প ছিল সম্মুখে। পূর্ব পরিকল্পনামত মাহবুব হামদানীসহ আরো দশজন সাথী সেখানেই পজিশন গ্রহণ করেন।

কমাণ্ডার সাহেব যখন নামায শেষ করেন, আক্রমণের নির্ধারিত সময় আসতে তখনও কয়েক মিনিট বাকী ছিল। তিনি সেখানেই বসে বসে দুআ

করতে থাকেন এবং আশপাশের সাথীদেরকেও দুআ করার জন্য নির্দেশ দেন।

এখন রণাঙ্গনের পরিস্থিতি ছিল এই যে, কমাণ্ডার যুবাইরের বাহিনীর সম্মুখে উত্তর দিকেই একটু উপরে দুশমনের ক্যাম্প। ডানদিকে নিকটেই আবদুল গাফফারের বাহিনী তাদের আক্রমণ করার জন্য ওৎ পেতে রয়েছে। আর ডান দিকে একটু, দূরে তোরকামার সারের চূড়ায় মাওলানা নিজেদের রকেটের দিকে আর কখনো দুশমনের ক্যাম্পের দিকে দেখছিলেন।

***فتح کامل کی خبر دیتا ہے جوش کار زار***

“লড়াইয়ের তীব্রতা পূর্ণ বিজয়ের
সুসংবাদ বহন করে।”

## ত্রিমুখী আক্রমণ

ঠিক চারটা বেজে ৫৫ মিনিটে মৌলভী আবদুর রহমান মাহমুদ ক্যাম্পের উপর প্রথম রকেটটি নিক্ষেপ করেন। এ যেন রোযা ইফতারের ঘোষণা ছিল। যার সাথে সাথে তোরকামার সার থেকে রকেটের এবং আবদুল গাফফারের বাহিনী থেকে রকেট ও গোলার বর্ষণ আরম্ভ হয়। দুশমনের মেশিনগান এবং মর্টার তোপও তৎক্ষণাৎ অগ্নি উদগীরণ আরম্ভ করে। গুলি, গোলা ও বুকেটের ভয়ংকর বিস্ফোরণে সম্পূর্ণ পর্বত রাজ্য প্রকম্পিত হয়ে ওঠে।.

দুশমন তখনও কমাণ্ডার যুবাইরের বাহিনীকে দেখতে পায়নি, তাই তাদের উত্তরমূলক ফায়ার মৌলভী আবদুর রহমান মাহমুদ এবং আবদুল গাফফারের দিকেই হচ্ছিল __কমাণ্ডার যুবাইর এই সুযোগের

জন্যই ওৎ পেতেছিলেন। তিনি সাথে সাথে এ কথা বলে_-সাথীরা! দৌড়ে সম্মুখে অগ্রসর হও ক্ষ্ধার্ত সিংহের ন্যায় ক্যাম্পের দিকে দৌড় দেন।

আদীল বলেন “আমরা সোজাপথে সম্মুখে অগ্রসর হতে পারছিলাম না। কারণ, আমাদের ভানদিক থেকে আবদুল গাফফার রকেটের পর রকেট ফায়ার করছিলেন। তাঁর সাথীরাও দুশমনের উপর তীব্রভাবে ফায়ারিং করছিলেন। তাঁদের ফায়ার থেকে গা বীচিয়ে আমরা বামদিক দিয়ে কমাণ্ডার সাহেবের সঙ্গে দৌড়ে সম্মুখে অগ্রসর হই। খালেদ মাহমূদ আমাদেরও আগে চলে যান। আমার নিকট রকেট ছিল। ক্যাম্পের নিকটে একটি পাথরের আড়ালে পৌঁছে কমাণ্ডার সাহেব আমাকে রকেট নিক্ষেপ করার হুকুম করেন। আমি সবেমাত্র লক্ষ্যস্থির করছি ইতিমধ্যে সম্ভবত দুশমন আমাদেরকে দেখে ফেলে। কারণ, তৎক্ষণাৎ তাদের মেশিনগানের মুখ আমাদের দিকে ঘুরে যায়। এখন এখান থেকে এক ধাপ সম্মুখে অগ্রসর হওয়া মানেই মৃত্যুকে আমন্ত্রণ জানানো। সম্মুখে পাথর ছিল। তার উপর দিয়ে ফায়ার করা হলে. ক্যাম্পের উপর দিয়ে রকেট পার হয়ে যেত। সোজা ফায়ার করলে পাথরের সাথে সংঘর্ষ হত। আমরা পাথরের এত নিকটে ছিলাম যে, আমরা আমাদেরই রকেটের টুকরার আঘাতে আহত হতাম। ওদিকে দুশমনের মেশিন গান এত তীব্রভাবে ও দ্রুতণতিতে ঝাঁকে ঝাঁকে ফায়ার করছিল যে, আশপাশের সমস্ত বৃক্ষের ডাল টুকরো টুকরো হয়ে আমাদের সাথীদের উপর ঝরে পড়ছিল। দুশমনের গুলিসমূহ

বৃক্ষসমূহকে চিরেযেড়ে আমাদের পিছনে চলে যাচ্ছিল।

মৌলভী সাআদাতুল্লাহ__ধিনি কমাণ্ডার সাহেবের সঙ্গে ছিলেন_ বলেন যে, “চোখের পলকে একটি রকেট-_যেটি সম্ভবত মৌলভী আবদুর রহমান মাহমূদ ফায়ার করেছিলেন__দুশমনের সম্মুখস্থ মোর্চার উপর আঘাত হানে। ফলে মোর্চা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।”

আদীল বলেনঃ আমার সম্মুখে একটু উপরে খালেদ মাহমূদ ছিলেন_“ওদিক থেকে দুশমনের ফায়ারিংয়ে যতি পড়লে আমি অনতিবিলম্বে লাফ দিয়ে তার জায়গায় চলে যাই এবং সে আমার জায়গায় চলে আসে। আমি উপরে পৌঁছাষ্সাত্র পুনরায় দুশমনের ফায়ারিং আরম্ভ হয়ে যায়। এখন আমাদের বাহিনী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। আমি এবং কিছু সাথী দুশমনের ফায়ারিংয়ের ভান দিকে, আর কমাণ্ডার সাহেব, খালেদ মাহমূদ ও মৌলভী সাআদাতুল্লাহ প্রমুখ বামদিকে। আমরা ফায়ারিং করতে করতে সম্মুখে অগ্রসর হই। এ সময পূর্ব প্রোগ্রামমত আবদুল গাফফারের পক্ষ থেকে ফায়ারিং বন্ধ হয়ে যায়, যেন আমরা তাঁর ফায়ারিংয়ের আওতায় না পড়ি।

সম্মুখে কয়েক ধাপ দূরে আমি সেই সমতল ভূমি দেখতে পাই, - কয়েক দিন পূর্বে আমরা যেখান থেকে দুশমন সেনাকে লাকড়ি নিয়ে যেতে দেখেছিলাম। কমাণ্ডার সাহেবের পরামর্শে আমরা ক্যাম্পে প্রবেশ করার জন্য এই স্থানকে পূর্ব থেকে নির্ধারণ করে রেখেছিলাম। কারণ, তা নিশ্চিতরূপে মাইনমুক্ত ছিল। অন্যথায় ক্যাম্পের

আশেপাশের সমস্ত এলাকা মাইন দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল।

সেখানে পৌঁছে আমি আল্লাহর নাম নিয়ে ক্যাম্পের উপর আমার প্রথম রকেটটি নিক্ষেপ করি। এভাবে পরপর কয়েকটি রকেট নিক্ষেপ করি। আমি এ সময় ক্যাম্পের দক্ষিণ-পূর্বে ছিলাম, যেখান.থেকে দুশমনের মেশিনগান ফায়ার করে চলছিল। কমাণ্ডার সাহেব পশ্চিম দিক থেকে ফায়ার করতে করতে ক্যাম্পের একেবারে নিকটে চলে যান।

মৌলভী সাআদাতুল্লাহ বলেন “আমি কমাণ্ডার সাহেবের সঙ্গে ছিলাম, ক্যাম্পের পাথুরে দেওয়ালের একটু পূর্বে একটি বৃক্ষের নিকট পৌঁছে তিনি আমাকে হুকুম করেন, "আপনি এখান থেকেই ফায়ার করবেন, এখান থেকে হটবেন না।”

আদীল বলেনঃ "আল্লাহর মেহেরবানীতে আমাদের আক্রমণ এমন সুসংহত, অকস্মাৎ এবং পরিপূর্ণ ছিল যে, যখন তিন দিক থেকেই ক্যাম্পের উপর রকেট ও গুলির বৃষ্টি বর্ষণ হয়, তখন দুশমন দীর্ঘক্ষণ আর আমাদের মোকাবেলা করতে সক্ষম হয় না। আমরা বিরতি দিয়ে দিয়ে তাকবীর ধ্বনি দিচ্ছিলাম__ভীরুর দল কাযেরদের উপর এর এমন ভীতি বিস্তার করে যে, তারা ধীরে ধীৰে মোর্চা ত্যাগ করতে আরম্ভ করে। তাদের ফায়ারিং বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়ে যায়।

মৌলভী সাআদাতুল্লাহ-_যিনি কমাণ্ডার সাহেবের বলে দেওয়া জায়গা থেকে অবিরাম ফায়ার করছিলেন-__বলেন যে, 'কমাণ্ডার সাহেব, খালেদ মাহমূদ এবং আরো কয়েকজন সাথী

আমার বামদিক থেকে ফায়ারিং সর্বাগ্রে। হঠাৎ সেখানে তীব্র বিস্ফোরণ ঘটে। সেখানে মাইন বিস্ফোরণ হয়েছিল। খালেদ মাহমুদ বিস্ফোরণের ধাকায় কয়েক কুট শূন্যে উঠে তাঁর জায়গা থেকে অনেক নিচে ঢালুতে পড়ে যান। ধুলিমেঘ কেটে গেলে তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। তাঁর ডান পা হাঁটুর কাছ থেকে উড়ে চলে গেছে। ,

***خون دل و جگر س سرمای حیات***

***فطرت لو ترنگ غافل! ن جلترنگ***

“দিল ও কলিজার লহু জীবনের পুঁজি ,

ওহে গাযেল ! লহু -তরঙ্গ আমাদের প্রকৃতি , জল-তরঙ্গ নয় ।”

## লক্ষ্য করবে কোন সৈন্য যেন পালাতে না পারে

আদীল বলেনঃ “এই বিস্ফোরণের সাথে সাথে কমাণ্ডার সাহেবের দৃষ্টি দুশমনের এমন কিছু সৈন্যের উপর পতিত হয় , যারা ক্যাম্পের পিছন দিক থেকে বের হয়ে উত্তর দিকের খোলা মাঠের দিকে নেমে যাচ্ছিল। তিনি সেখান থেকেই চিৎকার করে আমাদেরকে হুকুম করেন , “দৌড়াও ! সম্মুখে দৌড়াও ! ক্যাম্পে ঢুকে পড়। ”

একথা বলে তিনি পলায়নপর সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর বজ্রঘোষিত শব্দ পুনরায় শোনা গেল , “দেখ! কোন সৈন্য যেন পালাতে সক্ষম না হয় , সবাইকে জীবিত বন্দী করতে হবে।

আমার নিকট ছিল রকেট, কিন্তু এখন প্রয়োজন হলো ক্লাশিনকোভ। আমি তাড়াতাড়ি মাওলানা সাআদাতুল্লাহকে রকেট দিয়ে তাঁর ক্লাশিনকোভ নিয়ে নেই। একটি অতিরিক্ত ম্যাগজিন নিয়ে কোটের পকেটে রেখে দেই। তারপর দৌড়ে অটোমেটিক ফায়ার খুলে দিয়ে ক্যাম্পে ঢুকে পড়ি। লোড করা গুলিসমূহ অটোমেটিক ফায়ারে মুহূর্তের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। পকেট হাতিয়ে দেখি অতিরিক্ত ম্যাগজিনটি পকেট থেকে কোথাও পড়ে গিয়েছে। আমার বামদিকে দূশমনের একটি খালি মোর্চা ছিল। বাধ্য হয়ে তাড়াতাড়ি তার মধ্যে প্রবেশ করে আশ্রয় গ্রহণ করি। সম্মুখে পরিখার ন্যায় আরো একটি মোর্চা ছিল। তার ছাদ ছিল না। সম্ভবত সেটিও খালি ছিল। আমি লাফ দিয়ে সেটিতে যাওয়ার চেষ্টা করলে আমার পা পিছলে যায়, ফলে এত জোরে পড়ে যাই যে, হাঁটু মারাত্মকভাবে আহত হয়। আমি কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চল হয়ে যাই।

আবদুল্লাহ শাহ গাজী, নজর মুহাম্মাদ, মুনাওয়ার ও ফাইয়াজ কাশ্মীরীও ক্যাম্পে আমার সঙ্গে প্রবেশ করেছিল। আমি তাঁদের অতিরিক্ত ম্যাগজিন নিয়ে ক্লাশিনকোভ লোড করি। আমরা পাঁচজন সম্মিলিতভাবে সর্ব কক্ষ এবং মোর্চাসমূহের তল্লাশী আরম্ভ করি। প্রত্যেক মোর্চা এবং কক্ষে প্রবেশ করার পূর্বে আমরা তার মধ্যে ফায়ার করতাম, যেন কোন দুশমন থেকে থাকলে সেখানেই শেষ হয়ে- যায়। দু'জন সৈন্যকে আমরা জীবিত বন্দী করি। অবশিষ্টরা পালাতে সক্ষম হয়।

মৌলভী সাআদাতুল্লাহ বলেন "যখন কমাণ্ডার সাহেব আমার বামদিক থেকে সৈন্যদেরকে পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়ে দৌড় দেন, তখন কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তাঁর এবং আমার মাঝে পাহাড়ের কিছু অংশ আড়াল হয়ে যায়। আর সাথে সাথে আমি সেখান থেকে বিস্ফোরণের দুটি ভয়ংকর শব্দ শুনতে পাই। আমি আমার জায়গা থেকে সরতে পারছিলাম না। কারণ, তিনি আমাকে এখানেই থাকার জন্য তাকিদ করেছেন।

হঠাৎ আমার এবং খালেদ মাহমূদের মাঝখানে আরো একটি ভূমিকম্পের ন্যায় বিস্ফোরণ হয়। মুহাম্মাদ আরশাদের পা মাইনের উপর পড়েছিল। তার পা -ও শহীদ হয়ে যায়। এর ধাক্কায় আমিও গড়িয়ে কয়েক ফুট নিচে পড়ে যাই। ফলে পায়ের নলার ছোট হাড্ডি ভেঙ্গে যায়।

ইতিমধ্যে আমি সেইখান থেকে কমাণ্ডার সাহেবের ক্ষীণ আওয়াজ শুনতে পাই, যেখানে দুটটি বিস্ফোরণ ঘটেছিল -_তিনি বলছেন "সাথীরা ! সম্মুখে অগ্রসর হও। "

কিছুক্ষণ পর আদীলের আওয়াজ গর্জে ওঠে, "আল্লাহু আকবার, ! সাথীরা বিজয় মুবারক হোক, আল্লাহু আকবার ! এই আওয়াজ শুনতেই সকল মুজাহিদ লাফিয়ে লাফিয়ে "আল্লাহু আকবার " ধ্বনি দিতে থাকে এবং পরস্পরের সঙ্গে মুআনাকা করতে করতে মুবারকবাদ দিতে থাকে।

***سرور جو حق و باطل کی کار زار میں ہو***

***تو حرب و ضرب سے بیغانہ ہو تو کیا کہئے !***

"হক ও বাতিলের লড়াইয়ে যে আনন্দ -বন্যা রয়েছে ,
তুমি যদি সশস্ত্র লড়াই থেকে বিচ্ছিন্ন হও, তাহলে তোমাকে
তা " কিভাবে বুঝাবো ?"

## বিজয়ের চড়া মূল্য

মৌলভী সাআদাতুল্লাহ বলেন , 'মুবারকবাদের এই হৈচৈয়ে আমার অস্থির দৃষ্টি আমার প্রিয় কমাণ্ডারকে খুঁজে ফিরছিল। কয়েক মুহূর্ত পরই আমি তাঁর অতি ক্ষীণ আওয়াজ শুনতে পাই "সাথীরা ! আমি আহত- বিদ্যুতের আঘাতে পড়ে গিয়েছি "

আদীল বলেনঃ কমাণ্ডার সাহেবের আহত হওয়ার সংবাদ শুনতেই আমি ক্যাম্প থেকে বাইরে চলে আসি। আশপাশের সাথীদেরকে বলি যে , ক্যাম্প থেকে গনীমতের যে সমস্ত অস্ত্র এবং সামানা নিতে পার অবিলম্বে তুলে নাও এবং আমি যেদিকে থেকে অবতরণ করছি সেখান দিয়ে আমার পিছনে পিছনে অবতরণ করার চেষ্টা কর। কারণ , দুশমনের এ পদ্ধতির কথা আমাদের জানা ছিল যে , মুজাহিদরা যখন কোন পোষ্ট জয় করে , তখন নিচের ময়দান থেকে দুশমনের হেড কোয়ার্টার এবং আশেপাশের পোষ্টসমূহ বিজিত পোষ্টের উপর এমন তীব্র গোলাবর্ষণ করে যে , তার মধ্যে বিজয়ী মুজাহিদগণ থেকে থাকলে তারা আর জীবিত থাকতে পারবে না।

আমি তখনো কমাণ্ডার সাহেবের আহত হওয়ার ধরণ জানতে পারিনি। আমরা মাওলানা

সাআদাতুল্লাহ সাহেবের নিকট পৌঁছে দেখি, তিনি নিজেই আহত এবং ঘূর্তিমান বেদনা হয়ে আছেন। তিনি বললেন, কমাণ্ডার সাহেব মাইনের আঘাতে আহত হয়েছেন।

সম্মুখের অস্তগামী সূর্য রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে। তার কিরণ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। পরিবেশে কেমন এক শোকাতুর ভাব বিরাজ করছে। তার কথা শুনে আমার মুখ দিয়ে হঠাৎ চিৎকার বের হয়ে আসে। আমাকে হতবিহবল দেখে মাওলানা সাআদাতুল্লাহ সাহেব সাস্তবনা দিয়ে বলেন খেঁ, “এখন কান্নার সময় নয়। সাহস কর। অভিজ্ঞ সাথীদের বেশির ভাগই শহীদ হয়েছেন। ওদিকে গিয়ে কমাণ্ডার সাহেবকে উঠাও।”

আমি দৌড়ে সেদিকে যাই। কয়েক কদম সম্মুখে আরশাদ তার পর খালেদ মাহমূদ আহতাবস্থায় পড়েছিলেন। তাঁদের কাটা পা দেখে আমি পুনরায় কেঁদে ফেলি এবং আল্লাহ তাআলার নিকট দুআ করি, “হে আল্লাহ! কমাণ্ডার সাহেব এবং পুরাতন অভিজ্ঞ সাথীরা আহত। তাঁদেরকে উঠানোর এবং সামলানোর শক্তি দান করো” সাথে সাথে এমন মনে হলো, যেন আমার ভিতর এক অজানা শক্তি এসে গেল। অশ্রু বন্ধ হয়ে গেল। আর আমি দৌড়ে কমাণ্ডার সাহেবের নিকট চলে গেলাম।

মাওলানা সাআদাতুল্লাহ বলেন যে, “'আদীলকে কমাণ্ডার সাহেবের নিকট পাঠিয়ে আমি আহত পা নিয়ে কোন রকমে খালিদ মাহমূদের দিকে অগ্রসর হই। তখন সে একথা বলে আমাকে থামিয়ে-দেয় যে, “সাআদত ভাই! এখানে আসবেন না। এখানে মাইন রয়েছে।

আমি ক্লাসিনকোভের রড দ্বারা মাইন পরিষ্কার করার চেষ্টা করছিলাম ইতিমধ্যে আবদুল গাফফার খঞ্জর নিয়ে আসে। সে খগ্জার দ্বারা মাইন বের করে পথ করে নিয়ে দ্রুত খালেদ মাহমুদের নিকট পৌঁছে এবং তাকে তুলে নিয়ে সাথে সাথে নিচে চলে যায়।

আমি তাঁর খঞ্জর দিয়ে পথ তৈরী করে ভাই আরশাদের নিকট গিয়ে পৌছি। কয়েকজন সাথীর সাহায্যে তাঁকে একটি চাদরে উঠিয়ে আমরাও নিচে রওনা হয়ে যাই।

আদীল বলেন, “কমাণ্ডার সাহেবের নিকট যাওয়ার সময় এক জায়গায় আমার পা মাটির সাথে লাগতেই কোন এক অজানা শক্তি সাথে সাথে তাকে ফিরে টেনে আনে। সেখানে আমি একটি মাইন দেখতে পাই। এটি আল্লাহ তাআলার বিশেষ নুসরাত ছিল যে, আমার পা মাইনের গিয়েও হলো না। আমি সেটি উঠিয়ে অকেজো করার চেষ্টা করি, কিন্তু তার ফিউজ বাইরে বের হলো না। দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম, কারণ তা নিক্ষেপ করতে পারছিলাম না, কারণ কোন সাথীর পা তার উপর পড়তে পারে। বাধ্য হয়ে মাইনটিকে যো ছোট চাকার মত গোল) হাতের মধ্যে নিয়ে হাতের উপর ভর করে পাথরের উপর দিয়ে উপর দিয়ে কমাণ্ডার সাহেবের নিকট চলে যাই।

তাঁদের থেকে একটু দুরে মুশতাক এবং শফিকুল ইসলাম দাঁড়িয়েছিলেন। কমাণ্ডার সাহেব কেবলামূখী হয়ে পড়েছিলেন। লোড করা ক্লাসিনকোভ তাঁর হাতে ধরা ছিল। ডান পা নলা পর্যস্ত ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। বাম রানে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল। পেটের মধ্যে গুলির টুকরা ঢুকে গিয়েছিল। যে কারণে

কয়েকটি নাড়ি কেটে যায়। আল্লাহর মহিমা দেখুন ! মাইন তাঁকে শূন্যে তুলে নিচে যে জায়গায় নিক্ষেপ “করেছিল, সেটি ছিল চূড়ার প্রান্ত। আর যদি মাত্র আধা মিটার বাম দিকে পড়ে যেতেন , তাহলে তার নিচেই হাজার ফুট গভীর গর্ত ছিল।

***قربت بھی، فاصلے بھی، کرم بھی،گریز بھی***

***کس کس ادائے یار کے قربان جایئے !***

“নৈকট্য ও দূরত্ব , বরণ করে নেওয়া ও দূরে ঠেলে দেওয়া ,

বন্ধুর কোন্ কোন্ রংঢং এর প্রতি জান কুরবান করবে ?

## আহত কমাণ্ডার

আদীল বলেন, “আমাকে দেখতেই কমাণ্ডার সাহেব দূর থেকে “আসসালামু আলাইকুম " বলে নিশ্চিন্তে বলেন _-“আদীল আমার জন্য চিন্তা করো না। আমার পা আল্লাহর রাস্তায় কাটা গেছে। খালেদ মাহমুদ এবং আরশাদ আহত , যাঞ্জ তাদেরকে উঠাও। আমার ক্লাসিনকোভের মধ্যে এখনো সাতাশটি গুলি অবশিষ্ট রয়েছে। দুশমন এদিকে এলে দীর্ঘক্ষণ পর্যুত্ত বাধা দিতে পারব। তুমি গিয়ে অন্যান্য সাথীদেরকে সামলাও।

কিন্তু অন্যান্য আহতদের নিকট অপর সাথীরা পৌঁছে গিয়েছে। আমি আমার কালো পাগড়িটা মাথা থেকে নামাই। আমার হাত কাঁপছিল। .তাঁর পা কিভাবে উঠাবো ! কিভাবে বাঁধবো ! তাঁর দেহ থেকে এত .অধিক রক্ত

প্রবাহিত হয়েছে যে, রক্তশূন্য রগ বাইরে বের হয়ে পড়েছিল। রক্ত জমাট বেঁধে গিয়েছিল। আমি মন শক্ত করে পাগড়ি দ্বারা কোন রকমে তাঁর ডান নলা এবং বাম রান কযে বাঁধি।

এখন সমস্যা হলো তাকে তুলে নেওয়া। আমি তো পাথরের উপর: পার্জায় ভর করে ঝুকিপূর্ণ এই স্থান পর্যন্ত কোন রকমে এসে পৌছি। রাস্তায় অসংখ্য মাইন বিছানো ছিল। কমাণ্র- সাহেবকে উঠানোর জন্য অবশ্যই তিন চারজন সাথী প্রয়োজন। কিন্তু তাদের আসার রাস্তা ছিল না।

আল্লাহ তাআলা আমার অন্তরে সুরাহা বের করে দেন। আমি আমার ধীরে এ জায়গায় পৌঁছে যাই, যেখানে খালেদ মাহমূদ ও আরশাদ আহত হয়ে পড়েছিলেন। এখান পর্যস্ত আমি দশটি মাইন বের করে রাস্তা পরিষ্কার করি। সম্মুখের রাস্তা আমি পূর্বেই দেখেছিলাম যে, পরিষ্কার রয়েছে। এখানে কয়েকজন সাথী আছেন, কিন্তু সবাই নতৃন। আমি তাদেরকে পথ বাতলে দিয়ে বলি_-ষ্টরেচার এনে এদিক দিয়ে আমার নিকট চলে এসো।”

আমি দৌড়ে পুনরায় কমাণ্ডার সাহেবের মিকট এসে তাঁকে উঠাতে আরম্ভ করি। সাথে সাথে দূর থেকে শফিক ডেকে বলে, “সামনে অগ্রসর হয়ো না, মাইন আছে।’

আমি সজাগ হয়ে দেখি, কমাণ্ডার সাহেবের একেবারে নিকট__যেখানে পা রেখে আমি তাঁকে উঠাতে যাচ্ছিলাম_-একটি মাইন বিছানো রয়েছে। আমি আল্লাহর শোকর আদীয়,করতে করতে সেটি উঠিয়ে সাবধানে একটি বড়

পরিষ্কার পাথরের উপর অন্যান্য মাইনের সঙ্গে রেখে দেই, যেন সাথীরা দূর থেকে তা দেখতে পারে।

কমাণ্ডার সাহেব যুদ্ধে সর্বসময় মেগাফোন সঙ্গে রাখতেন। লড়াইয়ের পূর্বে অনেক সময় তিনি দুশমন সেনাকে পশতূ এবং ফার্সী ভাষায় ইসলামের দাওয়াত দিতেন, বিজয়ের পর তা" দ্বারা প্রয়োজনীয় ঘোষণা দান করতেন। সেই মেগাফোনটি এখন তাঁর পাশে পড়েছিল। আমি তার উপর হাত রেখে তাঁর পার্শ্ব পরিবর্তন করতে গিয়ে সাথে সাথে ছেড়ে দেই। এমনিই মনে হলো যে, প্রথমে মেগাফোন উঠিয়ে নেই। সেটি উঠিয়ে দেখি তার নিচেও মাইন রয়েছে। আসলে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ক্যাম্প পর্যস্ত পৌঁছার একটি পথ করে দিয়েছিলেন, অন্যথায় আশপাশের এ সমস্ত এলাকায় জালের মত মাইন বিছানো ছিল।

সফদর স্ট্রেচার নিয়ে আসে? আমরা অতি কষ্টে তার মধ্যে কমাণ্ডার সাহেবকে শোয়ায়ে আল্লাহ আল্লাহ করে পাহাড়ের নিচে নিয়ে আসি। কমাণ্ডার সাহেবকে দেখে বার বার আমার চোখে অশ্রু চলে আসছিল। আমাকে বিষাগগ্রত্ত দেখে তিনি বলেনঃ

“আদীল দুঃখ করো না। ইনশাআল্লাহ আমার 'খুনের বরকতে খোস্ত জয় হবে। তিনি সারা রাস্তা আমাদেরকে সাত্তবনা দিতে থাকেন।

মাওলানা সাআদাতুল্লাহ বলেন “আমি কয়েকজন সাথীর সাহায্যে আরশাদ ভাইকে চাদরের মধ্যে (মুজাহিদরা চাদরকে স্ট্রেচারের মত বানিয়ে নিতেন) উঠিয়ে

নিয়ে আসছিলাম, এমন. সময় পিছন থেকে কমাণ্ডার সাহেবকে ষ্ট্রেচারে করে বহনকারী সাথীরাও এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হন। তাঁদের মধ্যে আদীল ভাইও ছিলেন। কমাণ্ডার সাহেব তাঁকে আমার (সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আমি আরশাদ ভাইকে অন্য সাথীদের হাতে । দিয়ে অবিলম্বে কমাণ্ডার সাহেবের নিকট চলে আসি। তাঁর দুই পা ছাড়া 'সীনাও ক্ষতবিক্ষত হয়ে চালনীর মত হয়ে গিয়েছিল। পেটের আশংকাজনক ক্ষতের কারণে তাঁর পেশাব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যে কারণে
- তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছিল, আমাকে দেখতেই জিজ্ঞাসা কবেন, “কি অবস্থা?

আমি বেদনায় বিহবল ছিলাম। অনেক চেষ্টা করেও উত্তর দিতে পারলাম না। তিনি আমার বিষাদপূর্ণ চেহারার উপর একবার নজর দিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বলেনঃ

“দুশ্চিন্তা করবেন না, ইনশাআল্লাহ আমি সুস্থ হয়ে পায়ের উপর ভর করে চলতে না. পারলেও ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আপনাদের সঙ্গে লড়াইয়ে শরীক হবো।’

তারপর বললেন “আচ্ছা আমি আপনাদেরকে কবিতা শুনাচ্ছি। একথা বলে'তিনি অভ্যাস মাফিক বড় করুণ সুরে বিদগ্ৰ কণ্ঠে কবিতা শুনাতে আরম্ভ করেন। কিন্ত প্রথম লাইনের দেড় পংক্তি পাঠ. করর্তেই তাঁর আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়। অতি কষ্টে তিনি বলেন, “আমি পড়তে পারছি না।

সম্মুখের পথ ছিল দুর্গম ও খুবই সংকীর্ণ। অতি কষ্টে একজন লোক চলতে পারে। সাথীদের এই কষ্ট দেখে তিনি বলেন_-

বন্ধুরা আমার! আমি জানি আপনারা বড়ই ক্লান্ত, আর. কেউ কেউ আহতও.রয়েছেন। আমাকে এখানেই রেখে যান।

ক্ষতবিক্ষত কমাণ্ডারের মুখে একথা শুনতেই শক্তিহীন সাথীদের মধ্যে নতুন শক্তি সঞ্চার হয়। তারা পুনরোদ্দমে চলতে আরম্ভ করে।

আমার পা ফুলে যাওয়ার কারণে এবং তীব্র ব্যথার কারণে কমাণ্ডার সাহেবকে বহন করার কাজে শরীক হতে পারছিলাম না, তাই তাঁর: ম্যাগজিন: ভর্তি জ্যাকেট এবং আটটি ক্লাসিনকোভ বহন করে চলছিলাম। নলার ছোট হাড্ডিটি ভিতরে ভিতরে ভেঙ্গে গিয়েছিল।- _আমার জানা ছিল না যে, হাড্ডি ভেঙ্গে গেছে। একথা আমি ১৪ দিন. পর করাচী এসে জানতে পারি__। তখন আমি শুধু কষ্ট আর ফোলাই অনুভব করতে পারছিলাম। ভাঙ্গা হাড্ডি বোঝার চাপ সইতে পারেনি। আমি. হঠাৎ গড়িয়ে পাঁচ ফুট নিচে ঢালুর মধ্যে গিয়ে পড়ি। ক্লাসিনকোভগুলি আমার উপর এসে 'পড়ে। দুআ করতে করতে অনেক কষ্টে আমি উঠে দাড়াই। দুটি ফ্লাসিনকোভ একজন ফিলিপাইনী ছেলেকে দিয়ে দ্রুত -শিয়ে আমি কমাণ্ডার সাহেবের সঙ্গে মিলিত হই।

তারপর কোন রকমে আমরা সেই বর্ষাকালীন নালায় গিয়ে পৌছি, যেখানে, আমরা আজকে যোহর নামায আদায় করেছিলাম। এখানে ভাই খালেদ মাহমুদ. ও অন্যান্য আহত সাথীদেরকেও পৌঁছানো হয়েছিল। কমাণ্ডার সাহেব তাঁদেরকে দেখে বললেন-_“খালেদ ভাই; আজ তো কমাণ্ডারদের পালা ।”

***ملال یہ کہ نشیمن جلا گئ بجلی !***

***خوشی یہ ہے کہ گلستان بچا لیا میں نے***

দুঃখ এই যে , বিদ্যুত নীড় জ্বালিয়ে গিয়েছে ।

আনন্দ এই যে , আমি কানন রক্ষা করেছি ।”

## অন্যান্য আহত ও দু'জন শহীদ মুজাহিদ

পরিপূর্ণরূপে ছেয়ে গেছে। মাইনের আঘাতে আহত মাহবুব হামদানীকেও এখানে পৌছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এখানে জনাব আগা জহীর সফদর ও তার দলের লোকেরা প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম সহ উপস্থিত -ছিলেন। তারা ব্যান্ডেজ ও পটি করছেন এমন সময় মাওলানা আবদুর রহমান মাহমূদের আহত হওয়ার সংবাদ পাই। মাওলানা 'তোরকামার সার " চূড়ার উপর . রকেটবাহী বাহিনীর আমীর ছিলেন। বিজদ্বলাভের পর তিনি নিচে ক্যাম্পে চলে আসেন। সেখানে একজন আহত সাথীর ক্লাসিনকোভ পড়ে থাকতে দেখেন __সেটি উঠানোর জন্য সম্মুখে অগ্রসর হলে তাঁর পা -ও মাইনের উপর পড়ে। ফলে নলা পর্যন্ত পা উড়ে যায়। ”

মাওলানা সাআদাতুল্লাহ বলেন , “আমরা কারী গোলাম রাসূলকে মাওলানা আবদুর রহমান মাহমুদ ও অন্যান্য আহত সাথীদেরকে আনার জন্য এবং অন্তর স্থানান্তর করার জন্য পুনরায় ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেই। ”

খালেদ মাহমুদ -_-যার ডান পা নলা পর্যন্ত উড়ে গিয়েছিল -_-বলেন-

‘শীত ছিল খুব তীব্র। প্রচুর পরিমাণে রক্তক্ষরণের কারণে শরীর আরো হীম হয়ে গিয়েছিল। সাথীরা নালার মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দেন। ফলে অনেক আরাম বোধ হয়। তখন ক্ষতস্থানে তেমন ব্যথা ছিল না, তবে যখন বারুদের ক্যামিক্যাল দেহের মধ্যে প্রবেশ করত, তখন কষ্ট হতো। আগুনের একদিকে ছিলাম আমি আর অপরদিকে ছিলেন কমাণ্ডার সাহেব। আমাদের মাথার দিকে মাহবুব হামদানী এবং পায়ের দ্রিকে মৌলভী আবদুর রহমান মাহমুদ, আরশাদ কাশ্মীরী ও অন্যান্য আহত অনেক সাথী।

কমাণ্ডার সাহেব আমার চেয়ে বেশী আহত ছিলেন। কিন্ত এমতাবস্থাতেও তিনি শুয়ে শুয়ে আগুনের পিছন দিক থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, খালেদ ! তোমার কি অবস্থা ? আমিও তাঁর অবস্থা জিজ্ঞাসা করি। এর বেশী আমাদের মধ্যে কোন কথা হয়নি + কারণ, আমাদেরকে ঘুমের ইনজেকশন দেয়া হয়েছিল। ”

আদিল বলেন, "আজ আমাদের দু'জন সাথী শহীদ হন। ফিলিপাইনের আবু মুসআব তো ঘটনাস্থলেই শহীদ হন। আর মাহবুব হামদানী নালার মধ্যে পৌঁছানোর পর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কিন্তু রাত একটার সময় তিনি আঘাতের জ্কালা সইতে না পেরে আল্লাহর দরবারে চলে যান। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

***فرشت موت کا چھوتا گو بدن تیرا***

***تر وجود ک مرکز س دور رتا***

‘[illegible]

তোমার অস্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দু থেকে
অনেক দূরে অবস্থান করে 7

মাওলানা সাআদাতুল্লাহ বলেন , "রাত প্রায় একটার সময় আমরা পুনরায় কমাণ্ডার সাহেবকে তুলে নিয়ে আমাদের ক্যাম্পের দিকে যাত্রা করি। এখান থেকে ক্যাম্প পর্যন্ত শুধুই চড়াই শুধুমাত্র একজন মানুষ আরোহণ করার মত পথ ছিল। ত্বার উপর আবার বরফ জমে ছিল। প্রতি পদে পিছলে পড়ার আশংকা। বামদিকে শত শত ফুট গভীর খাদ। আল্লাহর নিকট দুআ করতে করতে সারা রাত উপরে আরোহণ করতে থাকি।

আদীল বর্ণনা করেন ,আমরা রাস্তার মধ্যে থাকতেই কয়েকজন আফগান মুজাহিদ এসে পৌঁছেন। তাঁরা কমাণ্ডার সাহেবকে নিয়ে অবিলম্বে আমাদের ক্যাম্পের দিকে রওয়ানা হন। আগা জহির সফদরসহ কয়েকজন সাথীকে তীদের সঙ্গে দিয়ে আমি অন্যান্য সাথীর প্রতীক্ষায় পিছনে রয়ে যাই। পথ ছিল অতি দুর্গম এবং সংকীর্ণ। তীব্র শীত। পাথুরে পথ। উপর থেকে তুষারপাত হচ্ছে। এই পিছল পথে কয়েকজন সাথী আহতদেরকে বহন করে আনতে রুয়েকবার পড়ে যায়। মোটকথা , পড়তে পড়তে উঠতে উঠতে সকল আহত সীদেরকে সঙ্গে করে আমরা মারকাযে পৌঁছে দেখি , কমাণ্ডার সাহেবকে রাতারাতিই মিরাণশাহ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সকালবেলা আমি আরশাদ এবং খালেদ মাহমৃদকে সঙ্গে নিয়ে মিরাণশাহ পৌঁছে দেখি কমাণ্ডার সাহেবকে সেখান থেকে পেশওয়ার নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এদিনটি

ছিল ১৫ই জানুয়ারী। আগামীদিন "বাড়ী"র রণাঙ্গনে আক্রমণের প্রোগ্রাম ছিল। রাত নাগাদ আমার সেখানে পৌঁছা জরুরী ছিল। ফলে আমি পেশওয়ার যেতে পারিনি।

***زندگی کھیلتی ہے طوفان سے***

***اب تمنا نہیں ہے ساحل کی***

"আমার জীবন ঝড়-বঞ্চার সঙ্গে খেলা করে, তাই এখন আর কুলে পৌঁছার বাসনা নেই?"

## লাঙেমাল পোষ্ট বিজয়

যে সময় কমাণ্ডার যুবাইর এবং তাঁর সাথীরা তোরকামার পোষ্ট্রের উপর আক্রমণ করছিলেন, ঠিক তখনই সহকারী কমাণ্ডার মাওলানা আবদুর রহমান ফারুকী তাঁর ত্রিশজন জানবাজ সাথী নিয়ে লাঙেমাল পোষ্টের উপর চড়াও হন। এ পোষ্টটিও তোরকামার ক্যাম্পের অধীন ছিল। দুশমন কিছুক্ষণ অবিচলভাবে মোকাবেলা করে। পরিশেযে পালিয়ে আত্মরক্ষা করার মধ্যে কল্যাণ মনে করে। বিজয়ের পর মুজাহিদগণ সেখানেই ইশার নামায আদায় করেন। এই লড়াইয়ে বাংলাদেশের একজন মুজাহিদ আবদুল মুমিন মাইনের আঘাতে আহত হন।

দুশমন সৈন্যরা পোষ্ট থেকে পালিয়ে যখন খোলা প্রান্তরে তিন মাইল দূরের হেড কোয়ার্টারে পৌঁছে, তখন সেখান থেকে অকস্মাৎ এই বিজিত পোষ্টের উপর তোপ ও কামান দ্বারা এমন তীব্র গোলাবর্ষণ করা হয় যে, ফারুকী সাহেবের ভাষায় --বৃষ্টির ন্যায় তীব্র গোলা বর্ষণ দেখে একবার তো এমন

জানবাজ মুজাহিদ

লাগছিল যে, আজ আমাদের একজনও বাঁচতে পারবে না।”

কিন্তু সেখানে দুশমনের নির্মিত মোর্চাসমূহকেই আল্লাহ তাআলা মুজাহিদদের হেফাজতের উপকরণ বানিয়ে দেন। মোর্চাগুলি এত মজবুত ছিল যে, গোলা তীদের কোনই ক্ষতি করতে পারেনি। অবিরাম আড়াই ঘন্টা পর্যন্ত চরম গোলা বর্ষণের পর যখন দূশমনের সম্ভবত নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে যায় যে, এখন পোষ্টে কোন মুজাহিদ আর জীবিত নেই তখন এই গোলা বর্ষণ বন্ধ হয়। মুজাহিদরা মোর্চা থেকে ৯ ক্ষতাবস্থায় বাইরে বের হয়ে আসেন।

এই পোষ্টে পনেরটি বাসকক্ষ ছিল। পানাহার সামগ্রীর ভাণ্ডারও ছিল আদায় করেন। প্রচুর পরিমাণ গণীমতের মালও লাভ করেন। তার মধ্যে একটি মর্টার তোপ, একটি গ্রেনোফ মেশিনগান, গোলা-বারুদ, প্রচুর হাতবোমা ও রকেট ছিল।

ফারুকী সাহেব গনীমতের মাল বের করে বাইরে রাখার ব্যবস্থা করেন। পোষ্টের মধ্য থেকে অপ্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড় এবং কমিউনিজমের বইপুস্তক ইত্যাদি বাইরে জমা করে সেই স্তূপের, উপর কেরোসিন তেল ছিটিয়ে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেন। কক্ষের ছাদের শক্ত কাঠের মোটা শাহতাঁরসমূহেও আগুন ধরে যায়।

তেরেলোটা পোষ্টও জয় হয়
বিজিত পোষ্টের অগ্নিশিখা যখন আকাশের সঙ্গে কোলাকুলিতে লিপ্ত, তখন বিজয়ী

মুজাহিদগণ নিকটবর্তী সহযোগী পোষ্ট “তেরেলোটা 'র উপর আক্রমণ করেন। গ্রেনোফ মেশিনগান এবং রকেট লাঞ্চার দ্বারা তীব্র ফায়ারিং আরম্ভ করেন। কিন্তু লাণ্ডেমাল পোষ্টের পরিণাম দেখে এখানকার সৈন্যরা আগেই পালিয়েছিল।

এদিকে রাত দুষ্টার সময় যখন এই অপারেশন শেষ হয় , তখন মারাত্মক আহত বাংলাদেশী জানবাজ মুজাহিদ আবদুল মুমিন সর্বপ্রকার চিকিৎসা থেকে চিরদিনের জন্য মুক্তিলাভ করে আল্লাহর দরবারে চলে যান। ইন্নলিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

***آواز جرس تھک ک□ ج□اں بیٹھ گئی □□***

***ٹھرا □□ و□یں قافل□ عمر رواں بھی***

কাফেলার ঘন্টাধ্বনি ক্লান্ত হয়ে যেখানে
বসে পড়েছে

সেখানেই জীবনের কাফেলাও থেমে গিয়েছে □”

শহীদকে তুলে নিয়ে এঁরা নিজেদের কাম্পের দিকে যাত্রা করেন। নিকটেই ছোট একটি পাহাড় ছিল। যেখানে মাইন থাকার কোন ধারণাও ছিল না , সেখান দিয়ে অতিক্রমকালে হঠাৎ একটি মাইন বিস্ফোরিত হয়। ৪জন মুজাহিদ __আবুবকর, মুনির , নেছার এবং নো "মান মারাত্মক আহত হন। টর্চ জ্বালিয়ে সন্ধান করে আরো দুটি মাইন পাওয়া যায়। মাইনগুলোর তার কেটে দিয়ে অকেজো করে দেওয়া হয়।

সম্মুখে 'তেরেলোটা ” নামের একটি জায়গা রয়েছে। বিজিত পোষ্টটিকে এই সূত্রেই

তেরেলোটা পোষ্ট বলা হয় ) সেখানে কয়েকটি বিরান বাড়ী ছিল। বিশ্রাম করার জন্য এবং আহতদের সেবা শুশ্রাধা করার জনা মুরাছিনরানজরারে অর করেন! আতেনানিযিআিজ্রেয়কে তার পাশে শুইয়ে দেওয়া হয়।

ফারুকী সাহেবের পায়েও ক্ষত ছিল। পরশু সকালে তাঁকে "বাড়ীতে আক্রমণের কমাণ্ড করতে হবে। তিনি সাথীদেরকে নির্দেশ করেন যে, "তোমরা এখানে অপেক্ষা কর। আমি মারকাযে গিয়ে কিছু সতেজ সাথীকে পাঠাচ্ছি। তারা আহতদেরকে বহন করার কাজে তোমাদেরকে সাহায্য করবে ?"

ফারুকী সাহেব বলেন যে , "আমি মুজাহিদদের মারকাযে (দরবেশ কারারগাহ ) গিয়ে দেখি সেখানকার সম্পূর্ণ পরিবেশ শোকে মুহ্যমান। কমাণ্ডার সাহেব এবং আরো কয়েকজন .অভিজ্ঞ সাথীকে আশংকাজনক অবস্থায় পেশওয়ার নিয়ে যাওয়া হয়েছে। : দু 'জন মুজাহিদ শহীদ দিকে পাঠিয়ে দেই , আর আমি নিশ্চল পা টেনে টেনে সম্মুখে যাত্রা করি। যোহরের সময় (পাকিস্তানের সীমান্ত শহর) মিরানশাহতে পৌঁছে আহত ও শহীদদের ব্যবস্থাপনা করি। মাগরিবের পূর্বে ভাই হিজবুল্লাহ , আদীল ও মুহাম্মাদ জহিরকে সাথে নিয়ে "বাড়ী " অভিমুখে যাত্রা করি। আমাদের সেখানকার মারকাযে যখন পৌঁছি , তখন রাত দশটা বেজে গেছে।

***مسای جبریل امین بند خاکی***
***اس کا نشیمن بخارا ن بدخشاں***

"মৃত্তিকার তৈরী মানব সে জিবরাঈলের
প্রতিবেশী ,
তার আবাস না বুখারা , না বদখশাঁ ”

## "বাড়ী 'র বিপদসংকুল লড়াই

সহকারী কমাণ্ডার আবদুর রহমান ফারুকী এখানে এসে তোরকামার বিজয়ের সুসংবাদ শুনান , কিন্তু সেখানকার শহীদদের কথা - উল্লেখ করেননি। সাথীদের মনোবল সতেজ রাখার জন্য কমাণ্ডার যুবাইরের বিষয়টি কাউকে ঘুনাক্ষরেও জানতে দেননি।

পূর্ব প্রোগ্রাম মত "বাড়ী "র গুরুত্বপূর্ণ পোষ্ট "সাকালিয়া , ও "যারমানকায়ী 'র উপর আফগান মুজাহিদগণকে মাওলানা পীর মুহাম্মাদের নেতৃত্বে আক্রমণ করতে হবে। এই পোষ্টদ্বয় এখানকার মুজাহিদদের মারকায থেকে উত্তরে অবস্থিত। তার পিছনে প্রায় উত্তর দিকেই খোলা প্রান্তরের নিকটে এখানকার প্রধান ক্যাম্প 'ট্যাংকওয়ালী অবস্থিত ! ফারুকী সাহেবের নেতৃত্বে হরকাতুল জিহাদিল ইসলামীর মুজাহিদগণকে পিছন দিক থেকে এই কাশ্পের উপূর আক্রমণ করতে হবে।

আক্রমণ করা হবে দিনের বেলা , কিন্তু দিনের বেলায় ট্যাংকওয়ালী ক্যাম্পের নিকটে পৌঁছা সম্ভবপর ছিল না। কারণ , মুজাহিদদের মাঝে এবং এ ক্যাম্পের মাঝে দুশমনের উক্ত দুই পোষ্ট প্রতিবন্ধক ছিল। তাই বাধ্য হয়ে সেই জানবাজদেরকে রাতারাতি পশ্চিম দিক হয়ে উত্তর দিকে চক্র কেটে

প্রথমে দুশমনের খোলা প্রান্তরে অবতরণ করতে হবে। তারপর ঐ প্রান্তরের ভিতর দিয়ে কয়েক কিলোমিটার পথ পূর্ব দিকে গিয়ে ওয়ালী ক্যাম্পের নিকটে পৌঁছে বর্ধাকালের একটি শুষ্ক নালাকে তাদের ঘাঁটি বানাতে হবে।

ফারুকী সাহেব তাঁর মারকাযে পৌঁছার মাত্র ৫ ঘন্টা পর যখন ১৬ই জানুয়ারীর ভোর হওয়ার আর মাত্র দুই আড়াই ঘন্টা সময় অবশিষ্ট ছিল_-সাথীদেরকে নিয়ে লক্ষ্যপানে যাত্রা করেন।

নিঝুম প্রান্তরের নিস্তব্ধ নিশি। জমাট বাঁধা তুষারাচ্ছাদিত পাহাড় ও উপত্যকা। অস্থি -র ভিত্তরস্থ মগজ জমে যাওয়ার মত তীব্র শীত। খোলা প্রান্তরের জায়গায় জায়গায় দুশমনের পোষ্ট, ক্যাম্প, মোর্চা ও ট্যাংকসমূহ। পদব্রজে পথ চলা। কাঁধের উপর নানারকম ভারী অস্ত্র ও সমর -সরঞ্জাম। নিবিড় অন্ধকার। পদে পদে প্রাণসংহারক মাইনের আশংকা।

***شب تاریک و بیم موج و گردا بے چنیں حائل***

***کجا دانند حال ماسبک ساران ساحل***

"অন্ধকার নিশি, আর বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ ও ঘূর্ণাবর্তন আমার প্রতিবন্ধক

কুল ধরে দ্রুত পথ অতিক্রমকারীরা কি করে আমার অবস্থা

উপলব্ধি করতে পারবো ?"

জানবাজ মুজাহিদ

কিন্তু ধন্যবাদ এ সমস্ত খোদাপ্রেমিকদের পরিকল্পনা তৈরী, কষ্ট সহিষ্ণুতা এবং বীরত্ব ও দক্ষতার জন্য__তাঁরা খোলা প্রান্তরে অবতরণ করে প্রায় ছয় মাইল পথ এমন নির্বঞ্চাটভাবে অতিক্রম করেন যে, দুশমনকে বুঝে উঠতেও দেননি। প্রভাতকিরণ ফুটে ওঠার পূর্বেই সমস্ত মুজাহিদ নালার মধ্যে বহু দূর পর্যস্ত ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু এটি ছিল চরম বিপদসংকূল পরিস্থিতি। কারণ, তাঁদের সম্মুখে মাত্র কয়েক শ' মিটার দুরে দুশমনের বিশাল ক্যাম্প ‘ট্যাংকওয়ালী’ ছিল। যা ছিল তাঁদের লক্ষ্যস্থল। এই পূর্বদিকেই আরো একটু সম্মুখে “তোরগোড়ার" সেই সুউচ্চ চূড়া রয়েছে, যার উপর দুশমনের শক্তিশালী পোষ্ট দূরপাল্লার তোপের সাহায্যে সর্বদা অগ্নি ও ধাতব বর্ষণের জন্য অস্থির ছিল। ডানদিকে একটু পিছনে দুশমনের সেই পোষ্টদ্বয় কিছু দূর ব্যবধানে অবস্থিত ছিল, যেগুলোর উপর মাওলানা পীর মুহাম্মাদ, এবং তাঁর সাথীরা সকালে আক্রমণ করবেন। বামদিকে খোস্তের খোলা প্রান্তর, যাকে দুশমন তাদের দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা লাইন বানিয়েছিল। দুশমন যদি এই মুজাহিদদের সামান্য গন্ধও পেত, তাহলে সর্বদিক থেকে সৈন্য ও তোপের ঝেষ্টনীতে ফেলে তাদেরকে সুস্বাদু গ্রাসে পরিণত করত। রসদপত্রের পথ তো আদৌ ছিলই না। তখন তারা কোন আশ্রয়স্থলও পেত না। কারণ, এই নালাটি দক্ষিণের পাহাড়সারি এবং উত্তরের প্রান্তরের প্রায় তীরে ছিল। যেখানে ছোট বড় কোন পাহাড় ছিল না।

নিবেদিতপ্রাণ এই মুজাহিদগণ খুব বুঝে- শুনেই ঝুঁকি নিয়েছিলেন এবং মহান আল্লাহর উপর ভরসা করেই এই ঝুঁকি নিয়েছিলেন। কারণ, ট্যাংকওয়ালী ক্যাম্প ধবংস করার এ ছাড়া বিকল্প কোন পথ ছিল না। আত্মরক্ষামূলক সর্বোচ্চ যেই ব্যবস্থা তারা গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, তা শুধুমাত্র এতটুকু ছিল যে, পনেরজন মুজাহিদের একটি প্রতিরক্ষা বাহিনীকে-যার আমীর ছিলেন তাজ মুহাম্মাদ আর সহকারী আমীর ছিলেন সারফারাজ__ময়দানের দিকে খোস্তের পথে বসিয়ে দেওয়া হয়। যেন ওদিক থেকে দুশমন অগ্রসর. হলে এঁরা তাদেরকে প্রতিহত করতে জান বাজি রেখে লড়াই করেন।

টর্চ জ্বালাল কে?
মুহাম্মাদ ইলিয়াস কাশ্মিরী- যার সম্পর্কে পাঠক অনেক পূর্বে পাঠ করে এসেছেন যে, জামাখোলার বিপদসংকূল লড়াইয়ে সর্বপ্রথম তিনিই আহত হন। তিনি এখানেও আগে আগে ছিলেন। “বাড়ীর মুজাহিদগণ মারকায থেকে নালা পর্যন্ত আসতে পথের মধ্যে একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে। তিনি.এ ঘটনা ইসলামাব'দের জনাব আইন খানকে অনেক দিন পর ব্যস্ত করেন এবং তা" প্রকাশ না করার জন্য তাকিদ করেন। কিন্ত আইন খান সাহেব মাসিক আল ইরশাদ (জুমাদাল আখিরাহ/রজব ১৪০৯ হিজরী সংখ্যা)-এ ঘটনাটি এই নোট সহকারে প্রকাশ করেন যে, আমি আল্লাহর নুসরাতের এই বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা না করে থাকতে পারছি না।

ইলিয়াস বর্ণনা করেন যে, “রাতের বেলা যখন আমরা দুশমনের এলাকার ছয় কিলোমিটার ভিতরে ঢুকে বর্ষার নালার দিকে যাচ্ছিলাম, তখন আমাদের কমাণ্ডার সাহেব আমাকে দশজন সাথী নিয়ে অন্য এক পথে সেখানে পৌঁছার নির্দেশ দেন! সর্বাগ্রে আমি। আমার পশ্চাতে সারিবদ্ধ হয়ে দশ সাহী এগিয়ে চলছে। চলাচলের কোন পথ ছিল না। বরফাচ্ছাদিত উঁচুনিচু টিলা, পাথর ও ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ আমার আশংকা জাগল যে, অমি তো কোন ভূল পথ ধরে চলছি না?

এই আশংকা জাগতেই আমি চরম দুশ্চিন্তায় পড়ে যাই। ঘোর অন্ধকারের কারণে নিজের হাত পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল না। ভুলপথে চলতে চলতে আমরা নিকটবর্তী কোন শত্র সেনাচৌকির মধ্যে চলে খাওয়ার বা মাইনের শিকার হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা ও ঝুঁকি ছিল। চরম অসহায় অবস্থায় আমার মুখ দিয়ে এই দুআ বেরিয়ে পড়ে__

“হে আমার আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে পথ বলে দাও। আমরা দ্বীনের পথে বের হয়েছি।”

হঠাৎ আমার সম্মুখে একটি আলো দেখা দেয়। ফলে পরিষ্কারভাবে পথ দেখা যাচ্ছিল। আমি ধারণা করলাম যে, পিছনের সাথীটি টর্চ জ্বালিয়েছে। আমি তড়িৎ পিছন ফিরে ঝাঁঝালো কণ্ঠে তাকে বললাম, “আল্লাহর বান্দা! তুমি জাননা আমরা দুশমনের এলাকায় রয়েছি? তুমি টর্চ জ্বালালে কেন? -

সে মিনতী করে বলল, ইলিয়াস ভাই! আমার কাছে তো টর্চ নাই!”

আমরা পুনরায় চলতে আরম্ভ করি। কয়েক কদম অগ্রসর হলে পুনরায় আলো জ্বলে উঠলো এবং পরিষ্কার পথ দেখা যাচ্ছিল। আমি পিছন ফিরে সেই সাথীকে ধমক দিয়ে বলি , “আল্লাহর ওয়াস্তে এমন কাজ আর করো না। সাথীদেরকে কেন মারতে চাচ্ছো ? দুশমন দেখে ফেললে আমাদের আর বাঁচার পথ থাকবে না। ”

সে আল্লাহর নামে কসম করে আমাদেরকে নিশ্চিত বিশ্বাস করালো যে , সে টর্চ জ্বালায়নি এবং তার নিকট টর্চ নাইও।

এবার তো আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই যে, ব্যাপার কি ? তারপর সেই আলোটি আমার সম্মুখে সম্মুখে নালা পর্যন্ত দেখতে পাই। আনন্দে আমার চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে। আল্লাহ তাআলার এই ওয়াদার কথা স্মরণ হয়ে আমার দেহের প্রত্যেক লোমকুপ থেকে কৃতজ্ঞতার ফোয়ারা প্রবাহিত হয় -

**وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ**

“আর যারা আমাকে পাওয়ার জন্য পরিশ্রম করবে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমাকে পাওয়ার পথসমূহ প্রদর্শন করবো , আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ এমন নিষ্ঠাবানদের সঙ্গে রয়েছেন।
সুরা আনকাবুত ৬৯ )

কারী আবদুর রশীদ কাউসার বলেন “নালার মধ্যে আড়াল ছিল সামান্য। আমরা রুদ্ধশ্বাস ভোরের প্রতীক্ষা করতে থাকি। কিন্তু সুবহে সাদেক উদিত হতেই আমি আর থাকতে পারলাম না। আমি আমীর সাহেব থেকে অনুমতি শ। নিয়েই আযান দিয়ে দেই। নিকটবর্তীর সাথীরা নালার মধ্যেই

জামাআতের সাথে নামায আদায় করে। দূরের মুজাহিদগণ পৃথকভাবে নামায পড়ে নেয়।

***یہ نغمہ ، فصل گل و لالہ نہیں پابند***

***بہار ہو کہ خزاں "لا الہ الا اللہ"***

এ সঙ্গীত বসন্ত ঋতুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়

বসন্ত ও হেমন্ত সর্বকালেই ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ প্রাণবন্ত

## ক্ষুধার্ত সিংহ

পূর্ব পরিকল্পনা মত ঠিক আটটার সময় আফগান মুজাহিদদের তোপ দুশমনের “সাকালিয়া” ও “যারমানকায়ী” পোষ্টদ্বয়ের উপর গোলা ও মিসাইল হানতে আরম্ভ করে। দুপুর ১২টার সময় গোলা ও মিসাইল বর্ষণের ধারা খতম হতেই মাওলানা পীর মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথীরা বিভিন্ন দিক থেকে পোষ্টদ্বয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন।

বর্ষার নালার মধ্যে মুজাহিদগণ যখন যোহর নামায আদায় করেন, তখন পোষ্টদ্বয়ে __যা এখান থেকে নিকটেই ছিল -_তুমুল লড়াই চলছিল। কামানের বজ নির্ঘোষ শব্দ এবং গোলার বিস্ফোরণ -নাদে সমস্ত এলাকা প্রকম্পিত হচ্ছিল। নামাযান্তে সকল মুজাহিদ আল্লাহ রববুল ইজ্জতের দরবারে কেদে কেঁদে বিজয় ও সাহায্য কামনা করেন। .

প্রায় দেড়টার দিকে যখন আফগান মুজাহিদগণ তীব্র বেগে একযোগে আক্রমণ চালিয়ে পোষ্টসমূহের মধ্যে প্রবেশ করছিলেন_-তখন এখানে কমাণ্ডার ফারুকী

বজ্রকণ্ঠে না’রায়ে তাকবীরের আওয়াজ বুলন্দ করেন এবং সাথীদেরকে ট্যাংওয়ালী) ক্যাম্পের উপর আক্রমণ চালানোর নির্দেশ প্রদান করেন।.

ক্যাম্পের উপর আক্রমণ করার জন্য তিনি তাঁর সাথীদেরকে চারটি দলে বিভক্ত করেন। সম্মুখ দিক থেকে আক্রমণকারী বাহিনীর নেতৃত্ব কমাণ্ডার ফারুকী নিজে দান করছিলেন। আদীল ছিলেন তাঁর সহকারী কমাণ্ডার। ডান ও বাম দিক থেকে আক্রমণ করার জন্য একটি বাহিনী নেআমতুল্লাহ জরওয়ারের নেতৃত্বে। কারী সাহেবের সহকারী ছিলেন বাংলাদেশের মৌলভী আলী আহমদ।

চতুর্থ বাহিনীটির পরিচালনাকারী ছিলেন জহীর আহমদ কাম্মীরী এবং কারী আবদুর রশীদ কাউসার ছিলেন তাঁর সহকারী প্রধান__তীদের দায়িত্ব ছিল আক্রমণকারী বাহিনীকে সহযোগিতা করার জন্য এম.এম. ৮২ এবং ক্লাসিনকোভ দ্বারা দুশমনের উপর আক্রমণ করা। যখন এ সমস্ত বাহিনী ক্যাম্পের উপর আরোহণ করতে আরম্ভ করবে, তখন এরাও তাদের সঙ্গে মিলিত হবে।

বাহিনী চতুষ্টয়-_যাঁরা রাত থেকে এ মুহূর্তের জন্য অস্থিরভাবে প্রতীক্ষা করছিলেন-_নালা থেকে বের হয়ে ক্ষুধার্ত নেকড়ের ন্যায় দুশমনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ক্যাম্প এই আক্রমণের কথা স্বপ্নেও ধারনা করেনি। তবে: সম্মুখস্থ পোষ্টসমূহে সংঘটিত লড়াই তাদেরকে বিশেষভাবে সজাগ করে দিয়েছিল। তারা সাথে সাথে সর্বপ্রকার ফায়ার আরম্ভ করে।

কারী নেআমতুল্লাহ বলেন -পদুশমন ছিল কিছুটা উপরে। আমরা তাদের ডান, বাম ও সম্মুখ দিক থেকে উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলাম। তোরগোড়া পোষ্টের লোকেরা আমাদেরকে দেখে ফেলে। তাদের পক্ষ থেকেও বৃষ্টির ন্যায় ফায়ারিং আরম্ভ হয়।

কমাণ্ডার আবদুর রহমান ফারুকী-_যিনি সবার আগে আগে দ্রুত সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিলেন_-আশেপাশে বিস্ফোরিত গোলাসমূহের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে পাগলের ন্যায় সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকেন। পথের জায়গায় জায়গায় মাইন পোতা ছিল। সেগুলোর তার মাটির উপর পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল--তিনি দ্রুতগতিতে তারগুলো কেটে কেটে দুশমনের নিকটে চলে যাচ্ছিলেন।

প্রথম শহীদ
ক্বারী আবদুর রশীদ কাউসার বলেন,আমি জহির সাহেবের সঙ্গে ছিলাম। তিনি এম.এম: ৮২ তোপ দ্বারা__যা কাধের উপর রেখে চালানো হয়__অবিরাম ফায়ার করছিলেন। তাঁর পাশে থেকেই আমরা ছয় সাথী ক্লাসিনকোভ দ্বারা ফায়ারিং করছিলাম। আক্রমণকারী তিনটি বাহিনীই আমাদের ফায়ারের ছায়ায় ছায়ায় সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিল। অকস্মাৎ বিকট এক বিস্ফোরণের আঘাতে আমাদের সাথী আবদুস সাত্তার বেলুচ__-যিনি বেলুচিস্তানের “খাজদার, এলাকার অধিবাসী ছিলেন-_ মারাত্মক আহত হন। ভূমি মাইনের উপর তাঁর পা পড়েছিল। সাথে সাথে একটি গোলা

এসেও তাঁর উপর পতিত হয়। তার আধা ঘন্টা পর তিনি শহীদ হয়ে যান।

দেখতে দেখতে একটি গুলি এসে আমাদের সাথী “গুলযেবকে আঘাত করে। তাঁর পেট যেটে যায়। তিনি সেখানেই পড়ে যান।

জহির সাহেব এ অবস্থা দেখতে পেয়ে অনতিবিলম্বে আহতদেরকে এবং অন্যান্য সাথীদেরকে নালার মধ্যে পৌঁছে দেন। সেখানে নেওয়ার পর তারেক সিদ্দিকী সাহেব সাথে সাথে তীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

জহির সাহেব আমাদেরকে পুনরায় রণাঙ্গনে নিয়ে আসেন।

কারী নেআমতুল্লাহ সাহেব--যিনি একটি আকত্রমণকারী বাহিনীর আমীর ছিলেন__ বলেন যে, “এই ক্যাম্পে যে লড়াই হয়েছিল, তা কোনদিন আমরা ভুলতে পারব না। এটি একটি অবিস্মরণীয় লড়াই ছিল। এখানে সেনাবাহিনীর সদস্যদের চেয়ে আফগান মিলিশিয়ার সঙ্গে আমাদের অধিক মোকাবেলা করতে হচ্ছিল। তারা ছিল কট্টর কমিউনিষ্ট এবং মারাত্বক লড়াকু। কমাণ্ডার ফারুকী সাহেব সে কথা আমাদেরকে পূর্বেই বলে দিয়েছিলেন। সুতরাং সাথীরাও মারাত্মক এই লড়াইয়ের জন্য খুব করে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে এসেছিলেন। কয়েকজন সাথী আহত হন। তাঁদেরকে কেউ উঠাতে এলেই আহত ব্যক্তি বলতেন যে, “সম্মুখে অগ্রসর হও, আমাকে নিয়ে চিন্তা করো না।”

সম্মুখে অগ্রসর হতে হতে আমরা ক্যাম্পের নিকটে চলে আসি। সম্মুখে পথের মধ্যে একটি টিলা ছিল, সেখান থেকে বৃষ্টির

মত গুলি আসছিল। আমি সাথীদেরকে বললাম , “আল্লাহর নাম নিয়ে দৌড়ে টিলার সম্মুখে চলে যাও ! কেউ আহত হয়ে পড়ে গেলে সে সেখানেই থাকবে। বাকিরা সামনে চলে যাবে। ”

“ওয়াকার জাহলামী ” একথা শুনতেই আল্লাহু আকবার আওয়াজ তুলে ক্যাম্পের দিকে দৌড় দেন। তাঁর দেখাদেখি অন্যরাও দৌড় দেয়। আল্লাহ পাক সবাইকে অক্ষত রাখেন। আমরা টিলা অতিক্রম করে ক্যাম্প পর্যন্ত পৌঁছে যাই।

***نظر اللا▯ پ▯ رکھتا ▯▯ مسلمان غیور***

***موت کیا شی ▯▯؟ فقط عالم معنی کا سفر***

“আত্মমর্যাদাশালী মুসলমানের দৃষ্টি সর্বদা আল্লাহর উপর নিবদ্ধ থাকে ▯

মৃত্যু সেতো আখেরাতের পানে সফর করা মাত্র ▯

## মহান বিজয়

কমাণ্ডার ফারুকী বলেন যে , যখন আমি দুশমন থেকে আনুমানিক ১০০ মিটার দূরে পৌঁছে যাই , তখন ক্যাম্পের সৈন্যরা বাইরে বের হয়ে আসে। তারা বাইরে দাঁড়িয়ে এত তীব্র ফায়ারিং আরম্ভ করে যে , আমি আর এক ইঞ্চিও সম্মুখে অগ্রসর হতে পারছিলাম না।

সম্মুখে ছোট একটি টিলার মত ছিল। যার উচ্চতা বেশী হলে দশ মিটার হবে। আদীল এবং আরো কিছু সাথী তাতে আরোহণ করেন। সেখান থেকে তাঁরা দুশমনের উপর রকেট নিক্ষেপ করেন এবং জবাবী ফায়ারিং করেন। আমি কিছু

সাথীকে নিয়ে ক্যাম্পের অপরদিক থেকে উপরে আরোহণ করি। তখন আমাদের সাথীরা সর্বদিক থেকে উপরে আরোহণ করছিলেন। আমাদেরকে একেবারে মাথার উপর দেখতে পেয়ে দুশমন হতবুদ্ধি হয়ে যায়।

এখানে মুখোমুখী লড়াই হয়। পরিশেযে সম্মুখস্থ কিছু সৈন্য লাশে পরিণত হয়। অনেকে পালিয়ে যায়। আর কিছু সৈন্য অস্ত্র সমর্পণ করে। যে সমস্ত অফিসার এবং সেনাসদস্য পালাতে সক্ষম হয়নি, তারা কক্ষসমূহের মধ্যে আত্মগোপন করে। মুজাহিদরা তাদের বেশ কয়েকজনকে হাতবোমা মেরে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয়।

একজন সেনা অফিসার একটি ট্যাংকের মধ্যে থেকে বের হয়ে খালি হাতে নিচের দিকে আসছিল। তখন আমি আমার যেই পা মর্টার তোপের গোলার অংশ লেগে ক্ষত হয়েছিল, তাতে পট্টি বাধছিলাম__আমি তাকে থামার নির্দেশ দেই। কিন্ত সে নিচের একটি কক্ষের মধ্যে ঢুকে পড়ে । পরে জানতে পারি যে, এঁ কক্ষে ওয়ারলেস সেট ছিল। সম্ভবত সে ওয়ারলেসের মাধ্যমে খোস্তের ছাউনির সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাচ্ছিল। উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দু'জনে কৃস্তাকৃত্তি হচ্ছে এমন সময় সিন্ধের অধিবাসী ইসমাইল অনতিবিলম্বে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে ক্লাসিনকোভের বাট দ্বারা তার মাথায় আঘাত করে। আমি গিয়ে দেখি সে ভূপাতিত হয়ে আছে। আমার ক্লাসিনকোভ তার ইহলীলা সাঙ্গ করে দেয়।

মৌলভী আবদুল কাইয়ুম তল্লাশীর জন্য একটি কামরায় প্রবেশ করতে গেলে উবাইদুল্লাহ ও তাহের আওয়াজ দিয়ে বলে_-

ওখান থেকে দূরে থাকুন, ভিতর থেকে গুলি আসছে। কিন্তু মৌলভী আবদুল কাইয়ুম দরজার একদিকে সরে গিয়ে ভিতরে হাতবোমা নিক্ষেপ করে। তারপর আরেকটি নিক্ষেপ করে। কিছুক্ষণ পর নিজে ভিতরে চলে যায়। একটি লোড করা ক্লাসিনকোভ ভিতরে পড়েছিল। তার ব্রেটও উঠানো ছিল। চৌকির নিচে তাকিয়ে দেখে একজন সৈন্য কম্বল জড়িয়ে পড়ে রয়েছে। তার হাতে একটি ক্লাসিনকোভ ছিল। তিনি তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেন। পরে জানতে পারি যে, সেও একজন সেনা অফিসার ছিল।

মৌলভী আলী আহমাদ বাংলাদেশী একটি কামরায় প্রবেশ করেন, তখন দু'জন সশস্ত্র সৈন্য সেখানে লুকিয়ে বসেছিল! আলী আহমাদ সাহেবের নিকটে রকেট লাঞ্চার ছিল। কামরার মধ্যে তা ব্যবহার করা আর মৃত্যুকে নিমন্ত্রণ জানানো ছিল এক কথা। তিনি অনতিবিলম্বে তরবারী বের করে সেনাদ্ধয়ের দিকে এগিয়ে যান। তারা দু'জন ভয়ে কাঁপছিল। তারা তাদের লোড করা ক্লাসিনকোভও ব্যবহার করতে পারেনি। তাদেরকে বন্দী করা হয়।

ওয়াকার, তিনজন সৈন্যকে একটি কক্ষে প্রবেশ করতে দেখতে পান। তিনি সাথে সাথে দরজার নিকট গিয়ে আওয়াজ দিয়ে বলেন, তাসলিম শো (আত্মসমর্পণ কর)। আওয়াজ শুনতেই তারা তিনজন বাইরে এসে হাত উপরে তুলে মাফ চাইতে আরম্ভ করে। তিনি এভাবে আরো কয়েকজন সৈন্যকে বন্দী করেন।

ক্যাম্পের উপরের একটি মোর্চা থেকে তখনও গুলি আসছিল। কমাণ্ডার ফারুকী ওয়াকার ও ইফতিখারের সঙ্গে চারজন

মুজাহিদকে সেদিকে পাঠিয়ে দেন। সেখানেও কয়েকজন সৈন্য অস্ত্র সমর্পণ করে। বাকিরা পালিয়ে  -

***کج کلاہی سرنگوں ہے، سرکشی ہے سر بخم***

***گرنے والوں کو ذرا نظر اٹھا کر دیکھئے***

বক্র টুপি হলো নত মস্তক ,আর অবাধ্যতা হলো নত শির

একটু চোখ তুলে পতনশীলদের পানে তাকিয়ে দেখো ”

## আরেকজন শহীদ

হিযবুল্লাহ সাহেব বর্ণনা করেন যে , এই লড়াইয়ে অধিকাংশ সাথী ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত ছিলেন। লড়াই করার জন্য সাধারণত মারকায থেকে কিছু পানাহার করে বের হওয়ার নিয়ম আছে। কিন্তু আজ রাত তিনটায় যখন আমরা বের হই , তখন যে দলের নিকট খেজুর ছিল , তারা পিছনে পড়ে যায়। পরে সারা দিনে এক ফোটা পানিও পাওয়া যায়নি। এ অবস্থাতেই সারাক্ষণ লড়াই করা হয়।

বিজয় লাভের পর ক্যাম্প থেকে অনেক খাদ্যসামগ্রী পাওয়া যায়। এক ড্রাম পানিও ছিল। সকলেই পিপাসার্ত ছিল। কিছু সাথী কোথাও থেকে চিনি জোগাড় করে আনে। জগের মধ্যে শরবত বানিয়ে মাত্র পান করা আরম্ভ করা হয়েছে এমন সময় উপরের একটি পোষ্ট থেকে হঠাৎ ট্যাংকের একটি গোলা এসে আমাদের মাঝে পড়ে ভয়ংকর আওয়াজে বিস্ফোরিত হয়। গোলাম সরওয়ার , আদীল এবং

ইসমাইল আহত হন। টোবা টেকসিংয়ের আবদুর রহমান নামের অপর একজন সাথী শাহাদাত মদিরা পান করেন। ইনা লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

গোলার একটি টুকরা আদীলের বাম বাহুর উভয় হাজ্ডিকে চূর্ণ চূর্ণ করে এপার ওপার হয়ে যায়।

কারী নেআমতুল্লাহ জরওয়ার তাঁর নিজের আহত হওয়ার ঘটনা শুনান যে, আমি আহত সাথীদেরকে তুলে নিয়ে নিচে নেমে আসছিলাম এমন সময় কমাণ্ডার ফারুকী সাহেব_যিনি নিজেও আহত ছিলেন আমাকে নির্দেশ করেন যে, আপনি ক্যাম্পে চলে যান, গিয়ে দেখুন, আরো আহত বা শহীদ সাথী রয়ে গেছে কিনা?

আমি যে পথ ধরে এসেছিলাম, এ পথ ধরেই আবার ক্যাম্পে ফিরে যাই। এখানে সর্বত্র মাইন বিছানো ছিল। সেগুলির তার কেটে কেটে আমি পথ করে নিচ্ছিলাম, ইতিমধ্যে একটি মাইন চোখে পড়ে। তা থেকে আত্মরক্ষা করে মাত্র এক দুই ধাপ অগ্রসর হয়েছি ইতিমধ্যে বিকট আওয়াজে বিস্ফোরণ হয়। আমি মনে করেছি যে, কোন গোলা এসে যেটেছে। কারণ, তখন দুশমনের অপর একটি পোষ্ট থেকে গোলা বর্ষণ হচ্ছিল। কিন্ত আসলে হয়েছিল এই যে, মাটির মধ্যে লুকানো এ মাইনের তারটি আমার গোছার মধ্যে টুকে পড়ে এবং মাইন বিস্ফোরিত হয়। ফলে আমার নলার হাড্ডি ভেঙ্গে যায় এবং সেখানকার খোশতও উড়ে যায়।

কোন সাথী এখানে ছিল না। আমি বিশেষ প্রতীকী ফায়ার করি। ফায়ারের আওয়াজ শুনতেই কয়েকজন সাথী এসে আমাকে তুলে

নিয়ে যায়। রাত নয়টার পর পর্যন্ত সাথীরা ক্যাম্প থেকে আহতদেরকে তুলে আনেন। আমাদের ১৯জন মুজাহিদ আহত এবং ২ জন শহীদ হন।

যে দুই পোষ্টের উপর মাওলানা পীর মুহাম্মাদ এবং তাঁর সাথীরা হামলা করেছিলেন, তাও বিজিত হয়েছিল। রাতের বেলা আমরা সবাই যখন আমাদের মারকাযে ফিরে আসছিলাম, তখন দুশমনের বিমান এসে প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ করে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সকল মুজাহিদকে রক্ষা করেন। এই লড়াইয়ে দশজন কমিউনিষ্ট নিহত, পনের জন আহত এবং আঠারো জন- যার মধ্যে সেনা অফিসারও ছিল -_বন্দী হয়।

গনীমতের মালের বিবরণ এই -

১, ট্যাংক ১টি, ২. এন্টি এয়ারক্রাফট গান ১টি, ৩. শালকা মেশিন গান ১টি, ৪. মর্টার তোপ ৫টি, ৫. গ্রেনোফ মেশিনগান ২টি, ৬. ক্লাসিনকোভ ৪৫টি, ৭. পানির ট্যাংকার ১টি, ৮. ওয়ারলেস সেট ৬টি, ৯. বাইসাইকেল ৯টি, ১০. টেলিফোন, টেপরেকর্ডার, টিভি ইত্যাদি, ১১. গোলা-বারুদের বিশাল ভাণ্ডার, ১২. পানাহার সামগ্রীর বিরাট ভাণ্ডার।

# وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ

'সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যই।'

আমার মন সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, হযরত নফীস শাহ সাহেব মুদ্দাযিল্লুহুর কথা [illegible]-

***سواد خوست سے منکر خدا کے بھاگنے کو ہیں***

***مسلمانوں کا قبضہ لا محالہ ہونے والا ہے***

খোস্তের মাটি থেকে আল্লাহর
অস্বীকারকারীরা পলায়ন করবে ।
সেখানে মুসলমানদের দখল অবশ্যই
প্রতিষ্ঠিত হবে ।”

## মঞ্জিল পানে কমাণ্ডার যুবাইর

পেশওয়ার রেডক্রস হাসপাতালে আশংকাজনক অবস্থায় দুদিন অতিবাহিত করার পর কমাণ্ডার যুবাইরের অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটে। নাকে পাইপ লাগানো ছিল। পাইপটি গলার ভিতর দিয়ে পেট পর্যন্ত চলে গেছে, ফলে কথা বলা খুব কষ্টকর ছিল। মুজাহিদদের মুখপত্র মাসিক আল ইরশাদের সম্পাদককে বিষাদগ্রস্ত দেখতে পেয়ে তিনি অতি কষ্টে বলেন “আপনার দুঃখ করা উচিত নয়, আমরা তো নিজেদের জন্য এ পথই মনোনিত করেছি।”

আল-ইরশাদের সম্পাদক বললেন - আমরা সর্বই আন্তরিকভাবে দুআ করছি, আল্লাহ পাক আপনাকে সত্বর সুস্থ করে তুলুন। আমরা আপনাকে জিহাদের ময়দানে আগের চে' জোরে শোরে জিহাদ করতে দেখতে চাই। সাথীরা আপনার পথ চেয়ে আছে”

কমাণ্ডার যুবাইরঃ আহ! .... ইনশাআল্লাহ আপনারা আমাকে আগামীতেও ভাঙ্গা পা নিয়ে রণাঙ্গনেই দেখতে পাবেন। এ আঘাত মুজাহিদকে তার মঞ্জিলে পৌঁছতে বাঁধ সাধতে পারে না।

অধিক কষ্ট হতে আরম্ভ হলে এই বাক্য বলে তাঁদের কথোপথন শেষ হয় --“আমার সাথীদের জন্য আমার পয়গাম এই যে, শহীদ আমীর

[মাওলানা ইরশাদ (রহঃ)] এই মহান মিশনের জন্য স্বীয় জান কুরবানী করেছেন। আমরাও যেন এর জন্য আমাদের সর্বকিছু কুরবানী করতে তৈরী থাকি।

***راضی برضا ہوں تو سکون ابدی ہے***

***ہر درد میں آرام ہے ، ہر غم میں خوشی ہے***

"আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকতে পারলে রয়েছে চিরস্থায়ী শান্তি ,

প্রত্যেক বেদনায় রয়েছে প্রশান্তি , আর প্রত্যেক দুঃখে রয়েছে আনন্দ ।"

তাঁর বড় ভাই হাজী ফয়েজ রাসূল সংবাদ শোনামাত্র পেশওয়ার চলে আসেন। তার উপর দৃষ্টি পড়তেই তিনি সালাম দিয়ে বলেন ঃ "ভাইজান ! ঘাবড়াবেন না। আল্লাহর রাস্তায় এমনটি হয়েই থাকে। বড় বড় কুরবানী দিতে হয় , এতো কিছু নয়। "

হাজী সাহেবের সঙ্গে তাঁর বড় ভাই মুহাম্মাদ যাহেদ সাহেবও এসেছিলেন। তাঁর প্রতি অভিযোগ করে বলেনঃ

"আপনি আহত হওয়ার ভয়ে আমার সঙ্গে রণাঙ্গনে যেতেন না এবং পেশওয়ারেও আসতেন না। এবার তো এসেই গেছেন। আমার সঙ্গে ওয়াদা করুন আপনি জিহাদে অংশগ্রহণ করবেন .... আমি যদি সুস্থ হই তাহলে এখান থেকে সোজা রণাঙ্গনে চলে যাবো। আপনাদের সবাইকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে। আর আমি যদি শহীদ হয়ে যাই , তাহলে আমার মিশনকে ছাড়বেন না। "

১৯শে জানুয়ারী রাতে ডাক্তারগণ হঠাৎ বলেন যে , তাঁর বাম উরুতে বারুদের বিষ ছড়িয়ে পড়েছে। অনতিবিলম্বে তার এ রানও কেটে ফেলতে হবে। সংগঠনের আমীর সাহেব ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করে অনতিবিলম্বে 'আলফাউযান জাররাহী” নামক অপর একটি হাসপাতালে তাঁকে এ উদ্দেশ্যে স্থানান্তর করেন যে, হয়ত এখানকার চিকিৎসকগণ তাঁর একমাত্র পা ’টিকে রক্ষা করতে পারবেন। কিন্তু ভাগ্যলিপিই বিজয়ী হলো। ফলে দ্বিতীয় পা ’টিও রান থেকে এঁ রাতেই কেটে ফেলতে হয়।

২৫শে জানুয়ারী পেশওয়ারের খায়বার হাসপাতালে সকাল সাড় আটটায় তার চেতনা ফিরে এলে সদা হাস্যোজ্জ্বল এই তরুণ ফজরের নামায কাযা হয়েছে বলে অঝোরে কাঁদতে আরম্ভ করেন। তায়াম্মুম করে ইশারার মাধ্যমে কাযা নামা আদায় ররেন। এটি ছিল ১৪০৯ হিজরীর জুমাদাল আখিরাহ মাসের ১৬ তারিখ। দুপুর একটা বাজতে সাত মিনিট বাকি রয়েছে .এমন সময় উপস্থিত লোকদেরকে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীস পড়ে শুনান —

**مَنْ كَانَ اَخِرُ كَلَامِهِ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ**

অর্থ -“যে ব্যক্তির শেষ কথা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”[20] (আবু দাউদ শরীফ)

---

[20] এই হাদীসটি এবং এই অর্থের অন্যান্য হাদীস কতিপয় সাহাবী এবং পরবর্তী কালের কতিপয় বুযুর্গ ব্যক্তি নিজেদের মৃত্যুকালে উপস্থিত লোকদেরকে পড়ে শুনান। শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহঃ )-এর এই রহস্য ব্যক্তি করেছেন যে , এমন

এটিই তাঁর শেষ কথা হয়। জান্নাতের জন্য পাগলপারা প্রাণ মুহূর্তের মধ্যে দেহপিঞ্জিরা থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

পরের দিন আড়াইটার সময় যখন পাকিস্তান .ও আফগানিস্তানের উলামায়ে কেরাম, মুজাহিদীন, মাদরাসার তালিবে ইলম ও জনসাধারণের বিশাল জমায়েত 'আবদুল হাকীম' নামক কসবার বিশাল মাঠে জানাযা নামাজের উদ্দেশ্যে সারিবদ্ধ হয়েছিলেন এবং মুফতী আবদুল কাঁদের সাহেব জানাযা নামাজ পড়াচ্ছিলেন, তখন শহীদের সোয়া দুই বছরের কচি মেয়ে 'সফিয়া' মূর্তিমান প্রশ্নরূপে, নিষ্পাপ হৃদয়ে ও বিস্ময়াভিভূত হয়ে নাজানি কি ভাবছিল? .... আর আবদুল্লাহ!!

**مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا**

---

করঞ্ক পিছনে এ সমস্ত বুযুর্গের উদ্দেশ্য ছিল হাদীসস্থ কালিমায়ে তায়্যেবা তাঁদের শেষ বাক্য হওয়া। তাঁদের আরো উদ্দেশ্য ছিল যে, তাঁদের জীবনের অন্তিম মুহূর্ত হাদীস বর্ণনা করা এবং তার প্রচার-প্রসারের কাজে ব্যয় হওয়া। হাদীসের প্রখ্যাত ইমাম আবু যুরআ'র মৃত্যুকালে উপস্থিত লোকেরা তাঁকে কালিমায়ে তায়্যেবা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে এই হাদীস আলোচনা করতে থাকেন। তখন ইমাম আবু যুরআ' তাঁর নিজের 'সনদে' এই হাদীস শুনাতে আরম্ভ করেন। হাদীস শুনাতে শুনাতে যখন তিনি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', পর্যন্ত পৌঁছেন, তখন তাঁর প্রাণবায়ু. বের হয়ে যায়। তিনি হাদীসের শেষাংশ 'দাখালাল জান্নাহ' (জান্নাতে প্রবেশ করবে) বলতে পারেননি। তাঁকে স্বাগতম জানানোর উদ্দেশ্যে আগমনকারী ফেরেশতাগণ তা" বলে থাকবেন! ফাতহুল মুলহিম, পৃঃ ২০৬, খণ্ড-১

জানবাজ মুজাহিদ

অর্থাৎ, মুমিনদের মধ্যে কতক লোক এমন রয়েছে যে, তারা আল্লাহর সাথে যে ওয়াদা করেছে যে, আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হলে হবো, তবুও মুখ ফিরাবো না) তা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ কৃত প্রতিশ্রুতি পুর্ণ করেছে, (শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দৃঢ়পদ থেকে শহীদ হয়েছে।) আর কেউ কেউ এখনো শাহাদাতের অপেক্ষায় আছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি। (সুরা আহযাব, ২৩ আয়াত)

মুজাহিদদের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার
শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের জীবদ্দশায় মুজাহিদদের সাত দলীয় এক্যজোট সর্বসম্মতভাবে প্রস্তাবিত “অন্তর্বতীকালীন সরকার, গঠন করেছিল। মরহুম প্রেসিডেন্টের শাহাদাতের কয়েক মাস পর ১৯৮৮ ঈসায়ীর শেষ দিকে যখন রুশবাহিনী মার খেয়ে আফ' থেকে দ্রুত প্রত্যাবর্তন করছিল এবং দৃশ্যত সেখানে ক্ষমতা র্ধ সময় ঘনিয়ে করে। এজন্য সমস্ত মুজাহিদ দল, তাদের সহযোগী বাহিনী এবং তাদের কমাণ্ডারদের একটি, প্রতিনিধি সমাবেশ ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে আফগানিস্তানের সমস্ত এলাকা এবং সমস্ত কবিলার প্রায় গাটশ' গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব অংশগ্রহণ করেন। এমনকি পাক সেনাবাহিনীর গোপন সংস্থা 'আই এস আইএর তৎকালীন প্রধান জেনারেল হামীদ গুলের বর্ণনা মতে সেই নির্বাচনী সমাবেশে জহির শাহের পক্ষের লোকও অংশগ্রহণ করে।

কয়েকদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে সর্বসম্মতিক্রমে আফগানিস্তানের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে নির্বাচিত করা হয়।

সে সময় আমি উলামায়ে কেরা:শর একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশের কাজে রাওয়ালপিপ্তিতে অবস্থান করছিলাম। মাওলানা আরসালান খান রহমানী ইসলামাবাদে আমার রাওয়ালপিণ্ডিতে অবস্থান করার বিষয়. অবগত হয়ে নির্বাচনী কর্ম থেকে অবসর লাভ করার সাথে সাথে অনুগ্রহপূর্বক আমার সঙ্গে সাক্ষাত করতে এখানে চলে আসেন।

তিনি. নির্বাচনের যে পন্থার কথা আলোচনা করেন, তা” ছিল অত্যন্ত সঠিক, স্বাভাবিক ও বাস্তবসম্মত। আর বাস্তবেও যুদ্ধ-বিধবস্ত আফগানিস্তানের জন্য-_যার সমস্ত নাগরিক বিক্ষিপ্ত ও বিপর্যস্ত ছিল--এর চে" উত্তম কোন পন্থা সম্ভবত সম্ভবপরও ছিল না।

নির্বাচণের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে যেই পন্থা অবলম্বন করা হয়েছিল, তা” এই ছিল যে, নিম্নবর্ণিত ক্রমানুসারে একটি পদ-তালিকা তৈরী করা হয়__তাতে প্রথমে প্রেসিডেন্ট তারপর প্রধানমন্ত্রীর পদ তারপর গুরুত্বানুক্রমে কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়সমূহের নাম লিপিবদ্ধ ছিল। এ সমস্ত পদের জন্য উপস্থিত প্রত্যেককে দু'জন করে ব্যক্তির নাম পেশ করতে হয়। তবে শর্ত ছিল যে, দু'জনের মধ্যে থেকে কমপক্ষে একজনের নাম নিজের সংগঠনের বাইরে থেকে প্রস্তাব করতে হবে। তারপর যে পদের জন্য যে ব্যক্তি সর্বাধিক ভোট লাভ করে, তাকে এ প্রদের জন্য নির্বাচিত সাব্যস্ত করা হয়।

নির্বাচনে প্রযেসর সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দেদী প্রেসিডেন্ট এবং উত্তাদ আব্দে রাব্বির রাসূল সাইয়াফ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। গুলবদীন হিকমতইয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং মাওলানা আরসালান খান রহমানী সম্ভবত ওয়াকফ ও ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় লাভ করেন। (অন্যান্য মন্ত্রীদের নাম এখন স্মরণ নেই)

সন্দেহাতীতভাবে এটি ছিল সম্ভাব্য পর্যায়ের একটি নির্বাচিত অন্তরবতীকালীন সরকার। সউদী আরবসহ আরো চারটি মুসলিম দেশ এই সরকারকে স্বীকৃতিও দিয়েছিল। কিন্তু পশ্চিমা বিশ্বের নিকট এ সরকারের মারাত্বক অপরাধ ছিল এই যে, এটি ছিল এঁ সমস্ত মুজাহিদের সরকার, যারা মূলত সারা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীর প্রতিনিধি যাদের ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র সেখানকার জনসাধারণ এগার বছর যাবত বড় থেকে বড় কুরবানী দিয়ে আসছে। এই অপরাধ আমেরিকা ও তার মিত্রদের নিকট এ জন্য অমার্জনীয় ছিল যে, তাদের নিজেদের দেশে তো জনগণের নিকট গণতান্ত্রিক সরকারের মাপকাঠি হলো, সে পশ্চিমা বিশ্ব এবং আমেরিকার স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করবে। মুসলিম দেশসমূহে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের প্রতি তাদের সবিশেষ অনীহা রয়েছে, বরং এমন সরকারকে তারা ভয় করে থাকে।

এ অথর্ব মাপকাঠির যুক্তির নিরীখেই ইয়াসির আরাফাতের প্রবাসী সরকারকে__যার হাতে ফিলিস্তীনের এক গজ জায়গাও ছিল না এবং যার বিরুদ্ধে সেখানকার জনগণ আজ

পর্য্ত আপাদমস্তক প্রতিবাদী হয়ে আছে- স্বীকৃতি দেওয়া হলো, কিন্তু আফগান মুজাহিদদের নির্বাচিত সরকারকে_-দেশের ৯০ ভাগ এলাকা যাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে_স্বীকৃতি দেওয়া হলো না। বরং শর্তারোপ করা হলো যে, প্রথমে আফগানিস্তানের বড় কোন শহর দখল করে দেখাও, তারপর তোমাদেরকে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে ভেবে দেখা যাবে! আমাদের পাপের অবিশ্বাস্য প্রতিফল এই হলো যে, পাকিস্তানের উপর চাপিয়ে দেওয়া নারীশাসিত সরকার (আর সম্ভবত তাকে চাপিয়ে দেওয়ার পিছনে একটি উদ্দেশ্য এও ছিল) সর্বপ্রথম মুজাহিদদের অন্তর্বতীকালীন সরকারকে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে।

পাকিস্তান দীর্ঘ দশ বছর ধরে নজিরবিহীন কুরবানী করে বিরাট আশা সরকার তার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে চলতে আরম্ভ করে এবং বহুবিধ কুরবানীর যেই সুদূরপ্রসারী ফলাফল আঞ্চলিকভাবে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পাকিস্তান ও আফগানিস্তান লাভ করতে যাচ্ছিল, আমাদের পাপের পরিণতিতে তা নিজেও উসূল করতে রাজি ছিল না এবং আফগানীদেরকেও তা দিতে প্রস্তুত ছিল না।

পাকিস্তান সরকারের নির্বোধমূলক এই নির্দয় আচরণ অন্যদের জন্য হিকমতইয়ার সমগ্র বিশ্ব ঘুরে এলেন, কিন্তু কোন দেশকে অস্তর্বতীকালীন সরকারকে স্বীকৃতিদানের জন্য উদৃদ্ধ করতে সক্ষম হননি।

হিকমতইয়ার নিজেও এক বছর পর এ সরকার থেকে এ কথা বলে পদত্যাগ করেন যে, নির্বাচনের সময় সরকার এ দায়িত্ব গ্রহণ

করেছিল যে, এক বছরের মধ্যে সে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করবে। (কারণ তখন বিভিন্ন লক্ষণ দ্বারা বোঝা যাচ্ছিল যে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে কাবুল সহ সমগ্র দেশ অন্তর্বতীকালীন সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে এবং এক বছরের মধ্যে মুহাজিররা স্বদেশে ফিরে আসবে ।) এই প্রতিশ্রুতি যেহেতু পুরা হয়নি, তাই সে নিজেও এখন এই সরকারকে মেনে নিতে পারে না।

মুজাহিদদের সাতদলীয় এঁক্যজোটের মধ্যে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে সর্বপ্রথম এই ফাটলটি আত্মপ্রকাশ করে। সময়ের প্রবাহের সাথে সাথে এই ফাটল এত গভীর, প্রশস্ত ও ভয়ানক আকার ধারণ করে যে, তা" মুজাহিদদের অর্জিত ইতিহাস নির্মাণকারী সমস্ত সফলতাকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করে দেয়। যে সফলতা পরবতীতে সমগ্র বিশ্বের চিত্র' যদিও পাল্টে দেয়, কিন্তু আফগানিস্তান এবং সমগ্র আলমে ইসলাম তার সেই সুফল লাভের জন্য আজও হা-হুতাশ করছে।

রুশবাহিনীর সম্পর্ণরূপে পশ্চাদাপসরণ
জীবনের অন্তিম মুহূর্তে এসে শহীদ যুবাইরের জন্য এবিবয়টি বড়ই সান্তনাপূর্ণ ও আনন্দময় ছিল যে, মুজাহিদরা তাদের কয়েক বছর ব্যাপী জিহাদের বিরাট একটি সফলতা লাভ করেছে__রুশ সৈন্য-_যার সত্তর. বছরের ইতিহাস এই যে,

তারা যে দেশেই প্রবেশ করেছে , সেখান থেকে কেউ তাদেরকে বের করতে পারেনি __সেই সৈন্যই আজ আফগানিস্তান থেকে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে, লাঞ্ছিত হয়ে আঘাতের উপর আঘাতে নিস্তেজ হয়ে , উঠিপড়ি করে দ্রুত পালিয়ে যায়। “জেনেভা চুক্তিতে ” তাদের পরিপূর্ণ প্রত্যাহারের তারিখ নির্ধারিত হয়েছিল ১৯৮৯ ঈসায়ীর ১৪ই মার্চ। কিন্তু তারা “দতর্কতামূলকভাবে , পূর্ণ এক মাস পূর্বেই সম্পূর্ণরূপে 'বাড়ী ফিরে যাওয়ার ” কথা ঘোষণা করেছিল। তাদের অবশিষ্ট প্রত্যেকটি সৈন্য তাদের সেই ব্যক্তিগত প্রয়োজনের " প্রস্তুতির কাজে লেগেছিল।

কমাণ্ডার যুবাইরের শাহাদাতের মাত্র বিশ দিন পর ১৪ই যেব্রুয়ারীতে যখন পরাজিত এই সেনাবাহিনীর সর্বশেষ কাফেলাটি "আমুদরিয়া ” অতিক্রম করছিল , তখন অনেক দেশের টেলিভিশনই শিক্ষণীয় এই দৃশ্য দেখিয়ে বিশ্ববাসীর নিকট থেকে যুবাইরের মত শহীদদের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি আদায় করে।

***غبار رہگذر ہیں، کیمیا پر ناز تھا جن کو***

***جبینیں خاک پر رکھتے ہیں جو ،اکسیر گر نکلے***

“পরশ পাথরের জন্য যাদের ছিল গর্ব , তারা আজ পথ-ধুলী ।

ধুলির উপর ললাট রাখত যারা , তারাই আজ পরশ পাথর ।”

যুবাইরের পিছনে ফারুকীও
সংগঠন কমাণ্ডার যুবাইরের স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করে তাঁর প্রধান সহকারী কমাণ্ডার আবদুর রহমান ফারুকী সাহেবকে। সে সময়েই তিনি করাচী এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তাঁর কৃতিত্বের কথা তো দীর্ঘদিন ধরেই শুনে আসছিলাম; ইতিপূর্বে তার কিছুটা লিপিবদ্ধও করেছি। কিন্তু তাঁর সাথে সাক্ষাত এই প্রথম। আর এই সাক্ষাতই হয় শেষ সাক্ষাত। মুজাহিদ হওয়ার সাথে সাথে তাঁর বুযুগীর গভীর চিত্র আজও আমার অন্তরে অক্কিত রয়েছে। এখান থেকে তিনি পুনরায় খোস্ত রণাঙ্গনে চলে যান।

“বাড়ী” বিজয়ের পর তোরগোড়ায় আরোহণের পথ বহুলাংশে উন্মুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু তার পূর্বে মুজাহিদদেরকে আরো কয়েকটি ক্ষুদ্র-বৃহৎ লড়াই শেষ করতে হয়।

এমনই একটি বড় ধরনের অপারেশনের কাজে ১৯৮৯ ঈসায়ীর মে মাসের দশ তারিখে কমাণ্ডার ফারুকী কয়েকজন মুজাহিদ সহকারে দুশমন কবলিত এলাকা “মলংগাণ্ড' এর আশেপাশে বসানো ভূমি মাইনসমূহকে অকেজো করে আক্রমণের পথ উন্মুক্ত করার কাজে লিপ্ত ছিলেন। স্বভাবমাফিক তিনি ছিলেন এ কাজে সবার আগে আগে।

হঠাৎ বিকট বিস্ফোরণের শব্দে সমগ্র এলাকা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। সম্ভবত কয়েকটি মাইন এক সঙ্গে বিস্ফোরিত হয়। ধোঁয়া ও ধুলির মেঘ কেটে গেলে তাঁকে রক্তে

জবজবা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। দেহের কয়েকটি অঙ্গ গায়েব হয়ে গিয়েছিল। দেহের কতক অংশের গোশত বিচ্ছিন্ন হয়ে ছোট ছোট টুকরা হয়ে আশেপাশে বিক্ষিপ্তাকারে পড়েছিল। তাজা শোনিত ধারা পাথুরে ভূমিকে সিক্ত ও পরিতৃপ্ত করছিল। ওষ্ঠদ্বয় ভেদ করে কাতর স্বরে “পানি” “পানি, শব্দ শ্রুতিগোচর হলো।

কিন্তু এখানে তো খুনের ফোয়ারা প্রবাহিত হচ্ছে। এক ফোটা পানির অস্তিত্বও ছিল না। নাসরুল্লাহ

21ও অন্যান্য সাথীদের
অসহায়ত্ব দেখে ক্ষীণ স্বরে তিনি বললেন? “কোন অসুবিধা নেই আমার আল্লাহ্র এই মঞ্জুরী হলে আমিও এতে খুশি।’

দম বন্ধ হয়ে আসছে দেখে এক মুজাহিদ সাথী দুঃখ-বেদনায় কেঁদে ফেলেন। যাকানদানী অবস্থায় তিনি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেনঃ “মুজাহিদ কখনো কাঁদে না। সাহসিকতার সাথে কাজ কর।”

তারপর দেখতে দেখতে একজন ক্লান্ত মুসাফিরের ন্যায় চোখ বন্ধ করে তিনি শাহাদাতের সুখনিদ্রায় শায়িত হন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

21 এই সেই নাসরুল্লাহ, যিনি "ট্যাংক সংহারক' উপাধি লাভ করেছিলেন এবং পরবততীতে তিনি একাই ছয়টি হেলিকপ্টারকে পরাজিত করে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পূর্বে তার ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

তাঁর ওসীয়ত অনুসারে 'লিযা ' নামক স্থানে জানাযা পড়ে ময়দানের এক প্রান্তে তাঁকে সমাহিত করা হয়। .

"খোস্ত ' সম্পূর্ণরূপে বিজয় হওয়ার পর যখন আমি আমার সফরসঙ্গীদের নিয়ে "গারদেষ ' রণাঙ্গনে যাওয়ার পথে ১৯৯১ ঈসায়ীর আগষ্ট মাসে সেখানে যাই , তখন সেই বিরানভূমিতে পরদেশী এই শহীদের কবরেও গমন করি। ঝোপঝাড়ের আড়ালে তার সঙ্গে একজন আরব মুজাহিদের কবরও ছিল।

তাঁদের সমাধিদ্বয় যেন বলছিল -_

***خزینہ□ □وں، چپھا یا مجھ کو مشت خاک صحرا ن□***

***کسی کو کیا خبر □□، میں ک□ا ں □وں، کس کی دولت □وں***

আমি গুপ্ত ধনভাণ্ডার , মরুমাটি আমাকে লুকিয়ে রেখেছে ,

আমি কার সম্পদ আর কোথায় রয়েছি --তা কি কারো জানা আছে?

## জেনারেল তানায়ীর বিদ্রোহ

৬ই মার্চ ১৯৯০ ঈসায়ীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। কাবুলের কমিউনিষ্ট সরকারের প্রধান নজিবুল্লাহর বিরুদ্ধে তার কমিউনিষ্ট সেনাবাহিনীর একজন জেনারেল এবং কাবুল সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শাহ নওয়াজ তানায়ী অতি দ্রুত ও শক্তিশালী বিদ্রোহ করেন। সেই বিদ্রোহে বিমান বাহিনী এবং চার ডিভিশন

সৈন্য অংশগ্রহণ করে। বিমান, ট্যাংক ও স্কাড মিসাইলও তাতে ব্যবহার করে। পত্রিকার রিপোর্ট মতে তারা রেডিও স্টেশন ধ্বংস করে এবং কাবুল এয়ারপোর্টসহ দেশের বেশ কয়টি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে।

মুজাহিদদের অন্তর্বতীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী উত্তাদ আব্দে রাব্বির রাসূল সাইয়াফ পেশাওয়ারে একটি তড়িৎ সাংবাদিক সম্মেলন করে ঘোষণা করেন যে, আফগানিস্তানের দুই কমিউনিষ্ট পার্টি “খলক' ও “পরচমের' মাঝের এই গৃহযুদ্ধকে আমরা জিহাদের অনুকূলে মনে করি। তিনি মুজাহিদদেরকে নির্দেশ প্রদান করেন যে, তারা যেন এই পরিস্থিতিকে জিহাদের অনুকূলে কাজে লাগান এবং সম্মুখে অগ্রসর হয়ে নিকটবর্তী সেনাকেন্দ্রসমূহ দখল করেন।

সাথে সাথে তিনি পরিষ্কার ভাষায় একথাও ব্যক্তি করেন যে, এরা উভয় পার্টিই কমিউনিষ্ট এবং আমাদের দুশমন। তাদের কারো সঙ্গেই আমাদের সম্পর্ক নেই এবং আমরা কারো পক্ষেও নই। আমরা মুজাহিদদেরকে এ নির্দেশও দান করেছি যে, এ দুই দলের যে কেউ ব্যক্তিগতভাবে বা সম্মিলিতভাবে মুজাহিদদের সামনে অস্ত্র সমর্পণ করলে_- (এমন লোকদের জন্য) যেমনভাবে পূর্ব থেকে আমরা সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা দিয়ে রেখেছি- _সেই অনুপাতে তাদের সঙ্গে আচরণ করবো

কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার গুলবদীন হিকমতইয়ার পেশাওয়ারে পত্রিকার প্রতিনিধিদেরকে বলেন যে, আফগানিস্তানে সংঘটিত এই সেনা অভ্যুত্থান সম্পর্কে আমরা পূর্ব থেকেই অবগত আছি। এ সম্পর্কে আমি

আফগান মুজাহিদ সংগঠনসমূহের প্রধানদেরকে অবহিতও করেছি। এতদসত্বেও এ সমস্ত সংগঠন তাতে খুশি না হয়ে বরং নেতিবাচক প্রোপাগাণ্ডা আরম্ভ করেছে।

তিনি মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের নিকট অনুরোধ করেন যে, এ সময় এ বিদ্রোহকারী সেনা অফিসারদের মনোবল ভেঙ্গে যায়। তিনি বলেন যে, বিদ্বোহীদের সঙ্গে আমাদের বিভিন্নসূত্রে যোগাযোগ রয়েছে। আমরা 'পরিপূর্ণরূপে তাদের সমর্থন করি।' কাবুল বিমানবন্দর থেকে একজন কমাণ্ডার এইমাত্র আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তার সঙ্গে নজিবের সঙ্গে বিদ্রোহী সেনা অফিসাররাও উপস্থিত ছিলেন।

তিনি বলেন যে, “বাগরাম' এয়ারপোর্ট এবং নিকটবর্তী মুজাহিদ কেন্দ্রসমূহ থেকে “পরওয়ানে” অবস্থানরত নজিব পক্ষের সৈন্যদের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে।

নতুন দিল্লীতে হিষবে ইসলামীর (হিকমত ইয়ার গ্র্প) এক নেতা মুহাম্মাদ ইবরাহীম পত্রিকার প্রতিনিধিদেরকে বলেন যে, আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শাহ নওয়াজ তানায়ী কাবুল পাশ্বিতী বিমান বন্দর দখল করেছেন। তিনি ছাড়াও আরো কয়েকজন জেনারেল মুজাহিদদের পক্ষে রয়েছে। তারা পেশাওয়ার এবং তেহরানে অবস্থান রত নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন।

আবুধাবিতে হিষবে ইসলামীর (হিকমত ইয়ার গ্রুপ) নেতা আবদুল করীম সাবেত “দৈনিক খালিজ টাইমস*কে টেলিফোনে সাক্ষাতকার

প্রদান কালে বলেন যে, হিধবে ইসলামী অতীতে 'নজিব সরকারের গদি উৎখাতের জন্য একাধিক বার চেষ্টা করেছে, যেগুলো ব্যর্থ হয়েছে। কিন্ত এবার তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস রয়েছে যে, এই চেষ্টায় তারা সফল হবে।

তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট নজিবের সিংহাসন উৎখাতের জন্য তাদের দল “যে কাউকে" সাহায্য করতে প্রস্তুত আছে। তার রাজনৈতিক মনোভাব যে দিকেই থাকনা কেন। তবে সেজন্য নজিবের বিরোধিতা করা জরুরী।

তিনি দাবী করেন যে, আফগানিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে হিযবে ইসলামীর অনেক হিতাকাংখী রয়েছে, যারা প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেনারেল শাহনওয়াজের নেতৃত্বে বিদ্রোহ প্রচেষ্টায় সরাসরি অংশগ্রহণ করেছে বা তাদের সহযোগিতা করেছে।

তিনি বলেন যে, আফগানিস্তানের পরিস্থিতি এখনও স্পষ্ট নয়। তবে তারা সেখানকার বর্তমান সরকার বিরোধী যে কোন ব্যক্তি এবং সংগঠনকে সাহায্য করবে। তিনি একথারও নিশ্চয়তা ব্যক্তি করেন যে, তানায়ী মুজাহিদদের পক্ষে কাজ করবেন এবং তার বিদ্রোহ মুজাহিদদের স্বার্থে হবে।

কিন্তু এই বিদ্বোহ পরের দিনই ব্যর্থ হয়। জেনারেল শাহ নওয়াজ তানায়ীকে পাকিস্তানে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। ৭ই মার্চ ১৯৯০ ঈসায়ীতে তার সঙ্গে পাকিস্তান আগত উচ্চতস্তরের সেনা অফিসারদের মধ্যে জেনারেল আবদুল কাঁদেরও ছিলেন। যার সম্পর্কে করাচীর দৈনিক জং পত্রিকা (তারিখ ৮ই মার্চ) পেশাওয়ার থেকে

প্রাপ্ত সংবাদের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখৈ যে, ইনি হলেন আবদুল কাঁদের ডগরওয়াল, যিনি পালমন্ট সদস্য এবং স্বাধীনতা বিপ্লবের হিরো।

তোরগোড়া বিজয়
“তোরগোড়া” খোত্ত এলাকার সর্বোচ্চ পাহাড়। তার চূড়ার উপরস্থ দুশমনের পোষ্টে আরোহণ করা ছিল মৃত্যুকে নিমন্ত্রণ করার নামাত্তর। অকুতভয় মুজাহিদগণ বারবার এই নিমন্ত্রণে সাড়া দিতে থাকেন এবং জান কুরবান করতে থাকেন। অবশেযে অনেক জান এবং মূল্যবান অঙ্গ কুরবানী করে তাঁরা ১৯৯০ এব শুরুর দিকে তাও জয় করেন মুজাহিদগণ এখান থেকে খোস্তের আকাশকে আক্রমণের আওতায় এনে খোস্তে রসদ পৌঁছানোর একমাত্র আকাশ পথকেও প্রায় বন্ধ করে দেন। তাঁরা দুশমনের অবতরণকারী এবং উজ্ডয়নকারী বিমানসমূহকে মিসাইলের মাধ্যমে নিত্যদিন ধ্বংসস্তূপে পরিণত করতে থাকেন। তারপরও এক-দুর্ঘট বিমান জানবাজি রেখে রাতের অন্ধকারে অবতরণ করতে থাকে। অনেকগুলো বিমানকে রানওয়েতে খাড়া অবস্থায় ধবংস করা হয়।

চূড়ান্ত এই উন্নতি করা সত্বেও মুজাহিদগণ এ বছর খোস্ত জয় করতে পারেননি। বরৎ এ সময়ে অন্য কোন বড় শহরও জয় হয়নি।
তার কিছু কারণ ছিল এই

১. শহরের অধিবাসীদের সমস্যা সাধারণত মনে করা হচ্ছিল যে, রাশিয়ান সেনাদের প্রত্যাবর্তনের পর কাবুলের কমিউনিষ্ট সরকার কয়েক দিনেই সাহস হারিয়ে বসবে এবং তার আফগান সেনাবাহিনী ও মিলিশিয়া__যারা এখন পর্যন্ত বেশ কয়টি বড় শহর দখল করেছিল এবং প্রায় অবরুদ্ধাবস্থায় ছিল-_মুজাহিদদের মামুলি আক্রমণের মুখে অস্ত্র সমর্পণ করবে।

খোদ মুজাহিদ নেতারাও চাচ্ছিলেন যে, এখন যতদূর সম্ভব বড় ধরনের লড়াই এড়িয়ে ছোট ছোট আক্রমণের মাধ্যমে চাপ অব্যাহত রাখা হোক। শহরসমূহের অবরোধ সুদৃঢ় করার প্রতি জোর দেওয়া হোক। যাতে করে দুশমন বাধ্য হয়ে অস্ত্র সমর্পণ করে। ফলে অবশিষ্ট শহর ও তার অধিবাসীরা অধিক ক্ষতি ও খুন-খারাবী থেকে বেচে যাবে। এই দিকটিকে সামনে রেখে মুজাহিদ নেতাগণ পূর্ণ বিজয়ের জন্য কয়েক বছর সময়ও প্রতীক্ষা করতে প্রস্তুত ছিলেন।

আফগান কমিউনিষ্ট সরকার__যারা এ ধরনের মানবিক গুণ থেকে শূণ্য ছিল_ প্রত্যেক বণক্ষেত্রে নিজেদের পরাজয়ের কথা নিশ্চিত জেনেও অত্যন্ত দৃটভাবে অবিচল থাকে। তাদের নিকট বিভিন্ন প্রকার অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রের কমতি ছিল না। রাশিয়ান সৈন্যরা তাদের পশ্চাদপদতার পূর্বে এখানে বিভিন্ন স্থানে স্কাড মিসাইলসহ সর্ব ধরনের অস্ত্ব এত অধিক পরিমাণে রেখে যায় যে, তা কয়েক বছরের জন্য যথেষ্ট ছিল।

কিন্তু ব্যাপক অস্ত্র থাকার পরও যদি লড়াকু সৈন্যরা সাহস হারিয়ে ফেলে তাহলে যাবতীয় অস্ত্র বেকার হয়ে যায়। একথা স্বীকার করতেই হবে যে, রাশিয়ান সৈন্যদের বিপরীতে কাবুল সরকারের আফগানস সেনাবাহিনী এবং মিলিশিয়া প্রত্যেকটি শহর প্রতিরক্ষায় নিতান্ত নৈরাশ্যকর পরিস্থিতির নির্ভীকভাবে মোকাবেলা করে।

২. জালালাবাদের উপর ব্যর্থ আক্রমণ এমত পরিস্থিতিতে মুজাহিদদের সম্মিলিত পরিকল্পনা তৈরী করে চূড়ান্ত আক্রমণ করার জন্য এমন একটি শহরকে নির্বাচন করা জরুরী ছিল, যা জয় করা তুলনামূলক সহজ এবং যা অন্যান্য শহরকে জয় করা আরো সহজ করবে। কিন্তু তার বিপরীতে__জানিনা এটি কোন ষড়যন্ত্র ছিল নাকি কিছু আবেগপ্রবণ কমাগারের অদূরদর্শিতা-_অভিজ্ঞ ও অত্যন্ত কর্মতৎপর মুজাহিদ সংগঠন ও কমাণ্ডারদের উপর আস্থা পোষণ না করে তাড়াহুড়া করে জালালাবাদের উপর আক্রমণ করা হয়।

এই আক্রমণের জন্য জালালাবাদকে নির্বাচন করা_-তার অবস্থানস্থল ও আরো কিছু কারণে__মারাত্মক ভূল সিদ্ধান্ত প্রয়াণিত হয়। মুজাহিদদেরকে এখানে দীর্ঘদিন পর্যন্ত মারাত্বক প্রাণহানির মুখে পড়তে হয়। প্রায় এক বছর পর্যন্ত জালালাবাদ সমস্ত মুজাহিদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু থাকে । ফলে অন্যান্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ রণক্ষেত্রের আক্রমণ মন্থর হয়ে যায়।

জালালাবাদের.আক্রমণের ব্যর্থতাকে সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের দুশমন প্রচার মাধ্যমসমূহ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলে ধরে। তারা প্রোপাগাণ্ডার সুদক্ষ টেকনিকের মাধ্যমে জোরেশোরে এই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির চেষ্টা করে যে, মুজাহিদদের দ্রুতগতিসম্পন্ন অগ্রাভিযান আমেরিকান সাহায্যের কৃপাধীন ছিল। এই সাহায্য বন্ধ হওয়ার পর তাদের প্রথম বড় আক্রমণই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অপরদিকে এই প্রতিকূল লড়াইয়ের ফলে কাবুল সরকার অন্যান্য শহরের উপর জমে বসার ব্যাপক সুযোগ লাভ করে। এখন আমেরিকা, ভারত ও তাদের মিত্ররাও তাদের সহযোগিতা করে যাচ্ছে।

৩. মতবিরোধ ও বহিঃ ষড়যন্ত্রসমূহ জিহাদ আফগানিস্তানের অতি প্রাচীন গোত্রীয় বিরোধ, রাজনৈতিক ও দলীয় মতবিরোধ এবং দলীয় বিদ্বেষের বিলুপ্তি ঘটিয়ে সমস্ত মুসলমানকে একটি অপরাজেয় সম্মিলিত শক্তিতে রূপান্তরিত করেছিল। কিন্ত রাশিয়ান সেনাবাহিনীর প্রত্যাবর্তনের পর পরিপূর্ণ বিজয় যতই ঘনিয়ে আসছিল, এ সমস্ত বিরোধ ও সাম্প্রদায়িকতা ততই মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল। ধনলিপ্সা ও পদলিপ্সার যেতনা চাঙ্গা হয়ে উঠছিল। কতক সংগঠনের রাজনৈতিক নেতাদেরকে আফগানিস্তানের বহিষ্কৃত জহির শাহকে__যার কর্মফল আফগানিস্তানে এই দুর্দিন সৃষ্টি করেছিল__পুনরায় বাদশা বানানোর চিন্তায় দেখা যায়। আমেরিকান ও রাশিয়ান লবি তাদের শক্তি যুগিয়ে চলে।

কতিপয় রাজনৈতিক নেতার উপর (তাদের কমীদের উপর নয়) সন্দেহ করা হচ্ছিল এবং তার কারণও বিদ্যমান ছিল যে, তারা ১৫ লক্ষ শহীদের অস্থি-মজ্জার উপর নিজেদের ক্ষমতার গদি বিছানোর জন্য কাবুলের কতিপয় জেনারেলের সাথে নীল-নকশা তৈরী করে মুজাহিদ এবং জিহাদের লক্ষ্যসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে একাই কাবুলের সিংহাসনে গিয়ে অধিষ্ঠিত হতে প্রস্তত। এজন্য কমিউনিষ্টদেরকে ক্ষমতার ভাগী করতে হলে তাতেও তারা রাজি আছে। এই অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কারো দৃষ্টি কাবুলের দিকে আর কারো দৃষ্টি মস্কোর দিকে নিবদ্ধ দেখা যাচ্ছিল।

এই বেদনাদায়ক পরিস্থিতিতে মুজাহিদ সংগঠনসমূহের এক্য বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। যেই এক্যকে ধরে রাখার জন্য এখন কোন জিয়াউল হক বা আখতার আবদুর রহমানও বিদ্যমান ছিলেন না।

তবে নাপাকীর এই জগাখিচুড়ি শুধুমাত্র কয়েকটি সংগঠনের কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আর এই খিচুড়ি পাক হচ্ছিল একেবারে উপর পর্যায়ে। তাদের স্বেচ্ছাসেবক মুজাহিদগণ, বরং বেশির ভাগ কমাণ্ডারও__যারা বাহ্যত এ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না-_রণক্ষেত্রে অবিচল ছিলেন। তারপরও তাঁরা নেতাদের মন্থরগতির কারণে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। অবশিষ্ট সংগঠনসমূহ পূর্ববৎ নিজেদের জিহাদী মিশনে তৎপর ছিলেন। এ সমস্ত সংগঠনের নেতারা তাদের কতিপয় মিত্রের বিপদজনক আরে বত

অহির ছিলেন এব ডা সামলারোরি। ভিডি লরি ছিলেন।

এ সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রসমূহ আফগানিস্তানের অভ্যন্তরেও বহুবিধ পথ পেয়ে যায়। আফগানিস্তান স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথে এখানে মুজাহিদদের যে সরকারকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যাচ্ছিল, যে কোন মূল্যে তাকে প্রতিহত করার জন্য আমেরিকা, রাশিয়া, ভারত, ইসরাইল এবং সমগ্র বিশ্বের ইসলামের দুশমন শক্তিসমূহ জোট বেঁধে ভিতরে বাইরে বিভিন্ন প্রকারের ষড়যন্ত্র করছিল।

খোদ পাকিস্তানকে এমন সর্ব প্রতিকূল পরিস্থিতি দ্বারা জর্জরিত করা হয়েছিল যে, সে আর পূর্বের মত মুজাহিদদের পৃষ্ঠপোষকতায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। এখানে নারীশাসিত যে ধর্ম নিরূপেক্ষ সরকার ইতিমধ্যে ১৯ মাস যাবৎ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, সে মুজাহিদদের সঙ্গে এমন _ এলারজিক' (অসহযোগী), আর তাদের দুশমন কাবুলের কমিউনিষ্ট সরকারের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ছিল যে, তার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জনাব কাউসার নিয়াজীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দলও তাদের সঙ্গে সম্প্রীতি বৃদ্ধির লক্ষে কাবুল পাঠিয়ে দেয়।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গ্তপ্ত সংগঠন
আই এস আই-এর তৎকালীন প্রধান জেনারেল হামীদ গুলকেও সম্ভবত এই অপরাধের শাস্তি স্বরপই. হঠানো হয় যে, তিনি পাকিস্তানের এই দশ বছরের আফগান পলিসীর জোরালো সমর্থক ছিলেন, যার অন্তরাল থেকে ইসলামের পুনজাগরণের

প্রভাত উজ্জল সূর্যের কিরণ বিকিরণ করতে দেখা যাচ্ছিল।

খোস্তকে জয় করার জন্য সমস্ত মুজাহিদ সংগঠনের একত্রিত হয়ে সম্মিলিত পরিকল্পনা তৈরী করে চতুর্দিক থেকে একযোগে আক্রমণ করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাদের মাঝে যে দূরত্বের সৃষ্টি হয়েছিল, তা অতিক্রম করে সম্মিলিত পরিকল্পনা তৈরী করার জন্য মাওলানা জালালুদ্দীন হক্কানী, মাওলানা আরসালান খান রহমানী ও অন্যান্য বড় বড় কমাণ্ডারদেরকে প্রায় এক বছর সময় ব্যয় করতে হয়। প্রায় একই অবস্থা কান্দাহার সহ অন্যান্য বড় বড় শহরগুলোর ক্ষেত্রেও দেখা যায়।

৪. উপসাগরের প্রতারণাপূর্ণ দুর্যোগ
আফগানিস্তানের জিহাদের ফলে বিশ্ব মানচিত্রে যেই দ্রুত এবং যেই বিশালাকারের পরিবর্তন আসছিল, মুসলিম উম্মাহ পবিত্র এই জিহাদের রূহানী ছাড়াও যে সমস্ত রাজনৈতিক, ভৌগলিক, অর্থনৈতিক ও মনোত্তাত্বিক ফলাফল লাভ করছিল এবং সমগ্র আলমে ইসলামে ইসলামের পুনর্জাগরণের যেই লহর প্রবাহিত হচ্ছিল তার যুক্তিযুক্ত ও সহজাত ফলসমূহের যথার্থ উপলব্বি অনেক মুসলিম নেতা করুক চাই না করুক, কিন্তু দুশমন শক্তিসমূহ সেগুলো অতি সূক্ষ্মভাবে ও তীব্রভাবে উপলব্ধি করছিল। ফলে তার ভবিষ্যতের পথ রুদ্ধ করার জন্য সারা দুনিয়ায় এক হৈচৈ আরম্ভ হয়ে যায়।

আফগানিস্তানের পর্বতসারির সঙ্গে বার বছর ব্যাপী ভাগ্য পরীক্ষার ফলে রাশিয়া এখন বিধ্বস্ত অর্থনীতি এবং আভ্যন্তরীণ, রাজনৈতিক ও আদর্শিক ভাঙ্গনে বিপর্যস্ত ছিল। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভূমিকা রাখার মত সে আর যোগ্য ছিল না। মধ্যপ্রাচ্যেও সে তার স্থার্থীসিদ্ধি থেকে হাত গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল। মুসলিম দেশসমূহের সংগঠনের (ওআইসি) জন্য সম্মুখে অগ্রসর হয়ে এই শুন্য পূরণ করার সুযোগ এসেছিল। আফগান জিহাদে কামিয়াবীর ফলে মুসলিম উম্মাহ যেই সাহস লাভ করেছিল, তা এমন এক প্রেরণা সঞ্চারকারী মহাশক্তি ছিল, যার মাধ্যমে জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে সুদূরপ্রসারী ফল লাভ করা সম্ভব ছিল। মুসলিম দেশসমূহের এই সংগঠনের জন্য মহামূল্যবান এই এনার্জিকে কাজে লাগিয়ে আস্তর্জাতিক পর্যায়ে উম্মাহকে নেতৃত্বদান ও পথপ্রদর্শনের মহান দায়িত্ব সম্পাদন করার এবং আফগান জিহাদের বিশ্বব্যাপী ফলাফল লাভ করার জন্য পূর্ব থেকেই সুচিস্তিত পরিকল্পনা গঠন করে সুদৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করার এটি ছিল এক সুবর্ণ সুযোগ। কিন্তু সংগঠনের উপর এমন স্থবিরতা ও নিজীবি ভাব আচ্ছন্ন হয়েছিল যে, আফগানিস্তানের ১৫ লক্ষ শহীদের তপ্ত খুনও তাকে সচল ও সজীব করতে পারেনি।

পক্ষান্তরে আমেরিকা-_যে কিনা বর্তমান পৃথিবীর একমাত্র সুপার শক্তি এবং অনেক পূর্ব থেকেই সে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা গ্রহণ করে আসছিল- আন্তর্জাতিক নতুন পরিস্থিতিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে

আসার, আফগান জিহাদের ফলাফলকে নিজে হাতিয়ে নেওয়ার এবং মুসলিম উম্মাহর উত্থানমুখী আন্তর্জাতিক শক্তির একত্রিত হওয়াকে প্রতিহত করার, বরং পিযে ফেলার জন্য অতি দ্রুত বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে উপসাগর যুদ্ধরূপে অত্যন্ত চাতুরতাপূর্ণ ও ধ্বংসাত্মক নাটক রচনা করে। একদিকে তারই শক্তি বলে ইরাকের প্রেসিডেন্ট অকস্মাৎ লুষ্ঠন, অত্যাচার ও কপটতাপূর্ণ পন্থায় কুয়েত দখল করে বসে। ফলে কুয়েতের আমীরকে সউদী আরবে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। অপর সউদী আরবসহ উপসাগরীয় রাষ্ট্রসমূহকে বিশ্বাস করায় যে, সাদ্দামের সেনাবাহিনী সউদী আরবে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। অন্যান্য রাষ্ট্রও তার টার্গেটের আওতায় রয়েছে। এখন তেলের খনি এবং নিজেদের স্বাধীনতা বাঁচানোর এছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নেই যে, “নিউ ওয়ার্ড ওয়ার্ডার, এর প্রথম পর্ব হিসাবে আমেরিকার আশ্রয় ও আমেরিকান কমাণু গ্রহণ করে ইরাকের সঙ্গে চূড়ান্ত লড়াই করার জন্য প্রস্তত হয়ে যাও।

আমার বুঝে আসে না যে, কুয়েত, সউদী আরব
ও উপসাগরীয় শাসকগণ কি এতই সরল হৃদয়ের যে, তারা আমেরিকার প্রতারণা বুঝে উঠতে সক্ষম হলেন না। তবে সাদ্দামকে হাতের লাঠি বানিয়ে আমেরিকা তাদেরকে এমন কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখী করেছিল যে, তার পেশকৃত পরিকল্পনাকে “অনিচ্ছাসত্বেও কবুল না করে গত্যত্তর ছিল না। কারণ এর ব্যতিক্রম হলে সে সাদ্দামের দ্বারা এমন

সকল পদক্ষেপই নেওয়াতে পারত, যার “সংবাদরূপী ধমকি' তাদেরকে দেওয়া হচ্ছিল।

এমন জটিল পরিস্থিতিতে পাকিস্তান সহ আরো কয়েকটি মুসলিম দেশ যথার্থই সউদী আরবের হেফাযতের জন্য কোমর বেঁধে প্রস্তুত হয়ে যায়। পাকিস্তানের সৈন্যরা তো তাদের কাঁধে কীধ মিলিয়ে দীড়িয়েও যায়। কয়েকটি মুসলিম দেশ সাদ্দামের পক্ষেও অবতীর্ণ হয়। আর কিছু মুসলিম দেশ নিরূপেক্ষ থাকে।

এভাবে মুসলিম দেশসমূহ তিন ব্লকে বিভক্ত হয়ে যায়। আর আমেরিকা তার সৈন্যসামস্ত এবং পশ্চিমা মিত্রদের সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী নিয়ে 'কুয়েতকে মুক্ত করানোর জন্য এসে অস্ত্রের ব্যবহার এবং বিশ্বব্যাপী তার মুক্ত প্রদর্শনী শুধু করেনি, বরং সমস্ত লড়াইয়ের ব্যয়ও সউদী আরব এবং কুয়েতকে “কিছু অতিরিক্ত সহ বহন করতে হয়।

বেদনাবিধুর এই লড়াইয়ের ফলে কুয়েত উজাড় হয়ে" আলহামদুলিল্লাহ মুক্তিলাভ করেছে ঠিকই, কিন্তু আমেরিকা এই সম্পূর্ণ খেলা রচনা করে যে সমস্ত লক্ষ্য অর্জন করে তার দীর্ঘ তালিকার কয়েকটি এই_

১. পাকিস্তানসহ সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি আফগানিস্তান থেকে সরে গিয়ে উপসাগরের উপর নিবদ্ধ হয়। মুজাহিদগণ বিভিন্ন মুসলিম দেশ থেকে যে সহযোগিতা লাভ করত তা” অনেকটা বন্ধ হয়ে যায়।

২. আফগান মুজাহিদদেরকে আর্থিক সাহায্য দানে অগ্রণী সউদী আরব এবং কুয়েত নিজেদের

জটিলতার শিকার হয়ে বহুদিন পর্যস্ত সাহায্যদানে অপারগ হয়ে যায়।

৩. আফগান জিহাদ এবং আরো কিছু উপাদান আরব ও অন্যান্য মুসলিম দেশের মধ্যে বিশেষ নৈকট্য সৃষ্টি করেছিল; উপসাগরের যুদ্ধ তাদের মধ্যে পুনরায় দূরত্ব বরং কয়েক দেশের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে।

৪. কুয়েতকে উজাড় করে ফেলা হয়। সেখানকার অধিবাসীদের জীবন সংকীর্ণ করে দেওয়া হয়।

৫. ইরাকের অত্যাধুনিক টেকনোলজি, গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সামরিক শক্তিকে-যা একসময় ইসরাইলের বিরুদ্ধে ব্যবহার হতে পারত- টার্গেট বানিয়ে ধবংস করে দেওয়া হয়। ইরাকের অসংখ্য জনপদ ও মহল্লাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়। মুসলিম অধিবাসীদের অসংখ্য নিষ্পাপ বৃদ্ধ, যুবক, নারী ও শিশুদেরকে মৃত্যুর গ্রাসে পরিণত করা হয়। কিন্তু শিক্ষণীয় হলো, তারা সাদ্দামের কেশও স্পর্শ করতে পারেনি।

৬. এতদঅঞ্চলের সমস্ত দেশ ও রাষ্ট্রকে কৃপাধীন করে আমেরিকা সেখানকার তেল এবং সমস্ত উপাদানের পাহারাদার হয়ে বসে।,

৭. কুয়েতকে পুনর্নিমাণ করার ঠিকাদারী বিরাটাংশে আমেরিকা লাভ করে। এখানকার সম্পদ আমেরিকায় স্থানান্তর করার বড় প্রানের এটিও একটি অংশ হয়।

যাই হোক, উপসাগরের কৃত্রিম এই লড়াইও আফগানিস্তানে মুজাহিদদের অগ্রাভিযানের পথে দীর্ঘদিন পর্যন্ত প্রতিবন্ধক হয়ে

থাকে। এতদসত্ত্বেও মুজাহিদগণের নিকট যারা “বিজয় না হয় শাহাদাতের , দৃঢ় সংকল্প নিয়ে জিহাদের ময়দানে অবতরণ করেছিলেন __বেদনাদায়ক এ সমস্ত ঘটনার গুরুত্ব এর চে " অধিক ছিল না-

***ستارے ڈوبنا، شبنم کا رونا،شمع کا جلنا***

***ہزاروں مرحلے ہیں صبح کے ہنگام سے پہلے***

‘নক্ষত্ররাজি অস্তমিত হওয়া , শিশিরের
অশ্রু বিসর্জন করা এবং

প্রদীপ জ্বলে ওঠা কর্মচাঞ্চল্যময়
প্রভাত উদয়ের পূর্বে

এমন সহস্র ধাপ অতিক্রম করতে হয় ।’

## খোস্তের চূড়ান্ত লড়াই

উপসাগর সমস্যা নিয়ে শা 'বান ১৪১১ হিজরী (২৫শে যেব্রুয়ারী ১৯৯১ ) একটি মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মহাসমাবেশে অন্যান্য জ্ঞানী -গুণী , বুদ্ধিজীবি ও সাংবাদিকগণ ছাড়াও সউদী আরব ও কুয়েতের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বগণ অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীন কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী সরদার আবদুল কাইয়ুম সাহেব মহাসমাবেশের সভাপতিত্ব করেন।

তখনও উপসাগর যুদ্ধ চলছিল। সেই কনফারেন্দেও আমি “উপসাগর যুদ্ধের পট ও প্রেক্ষাপট এবং ভবিষ্যতের সুদূরপ্রসারী আশংকা সম্পর্কে উপরোক্ত বিষয়গুলো কিছুটা সবিস্তারে উপস্থাপন করি। এখন সে সমস্ত বিষয় বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

ঠিক সে সময়েই আফগানিস্তানে খোস্তের উপর মুজাহিদদের চূড়াত্ত আক্রমণের প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে অবস্থান করছিল। পাকিস্তানী মুজাহিদদের সংগঠন হরকাতুল জিহাদিল ইসলামীর সম্মুখে এই বিরাট আক্রমণের পূর্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বিষয় উপস্থিত ছিল। সে বিষয়টি তারা আমার লাহোর অবস্থানকালে সমাধান করতে চাচ্ছিলেন। সংগঠনের দীর্ঘদিনের পৃষ্ঠপোষক মাওলানা আরসালান খান রহমানী সাহেবকেও পেশওয়ার থেকে ডেকে আনা হয়। শাইখে তরীকত হযরত সাইয়্যেদ নফীস শাহ সাহেবও [মুদ্দাযিল্লুহুম) তাতে অংশগ্রহণ করেন। আলহামদুলিল্লাহ দুদিনের অবিরাম পরামর্শের পর এই সমস্যা সমাধান হয়ে যায়।

দীর্ঘ এই বৈঠকসমূহে মাওলানা আরসালান খান রহমানী সাহেবের তীক্ষ বুদ্ধি, নিষ্ঠা, বিনয়, আত্মবিশ্বাস এবং সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা আমাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এই সুসংবাদ আমরা তার নিকট থেকেই জানতে পারি যে, আলহামদুলিল্লাহ, খোস্তের উপর আক্রমণের জন্য মুজাহিদদের সমস্ত সংগঠন সম্মিলিত পরিকল্পনা প্রায় তৈরী করে ফেলেছে। অবশিষ্ট বিষয়সমূহে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। তাই তিনি মজলিস শেষ হতেই আমার অবস্থান কেন্দ্র থেকে সোজা পেশাওয়ার চলে যান।

হরকতের অনেক মুজাহিদ পূর্ব থেকেই রণাঙ্গনে ছিলেন। অবশিষ্টরাও এঁদিনই রওনা করেন। আর আমি তাদের সহযাত্রী হওয়ার

আক্ষেপ নিয়ে পবিত্র রমাযানের তিন চার দিন পূর্বে করাচী ফিরে আসি।

হযরত সাইয়্যেদ নফীস শাহ সাহেব দামাত বারাকাতুহুম , যিনি একজন শায়খে তরীকত এবং দেশের একজন স্বনামধন্য হস্তলিপিকার তো বটেই , তাছাড়া তিনি উচ্চ পর্যায়ের কাব্য প্রতিভাও রাখেন এবং সে অনুপাতে কবিতাও লিখে থাকেন। তিনি লাহোরের এই পরামর্শ বৈঠকের কয়েক মাস পূর্বে ১লা যিকাদাহ ১৪১০ হিজরী খোস্তের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কেন্দ্র “করড়ি পোষ্টের উপর একটি আক্রমণে স্বশরীরে অংশগ্রহণ করেন। তখন তিনি একটি উদ্দীপনাব্যপ্রক কবিতা রচনা করেন। আমার মনে পড়ছে যে , সেই কবিতার কয়েকটি চরণ ইতিপূর্বেও বিভিন্নস্থানে উদ্ধৃত করেছি। সেই কবিতার তিনটি চরণ এই —

***شہیدوں کے لہو سے خوست کو سیراب ہوتا ہے***

***یہ خطہ آج کل میں کشت لالہ ہونے والا ہے***

***شہادت چاہنے والو! مبارک وقت آپہنچا***

***تمہارا زیب تن ، خلدی دو شالہ ہونے والا ہے***

***نفیس! ایمان کہتا ہے، مرا وجدان کہتا ہے***

***ظہور نصرت باری تعالی ہونے والا ہے***

শহীদদের খুন দ্বারা খোস্ত সিক্ত হবে ।

এই ভূমি আজ হোক কাল হোক ফলে ফুলে সুশোভিত হবে ।

ওহে শাহাদাত প্রত্যাশীরা ! সুবর্ণ মুহূর্ত চলে এসেছে ,

তোমাদের পরিধেয় জান্নাতের , শ্রাল হবে ।

নফীস ! আমার ঈমান বলছে, আমার উপলব্ধি সাক্ষ্য দিচ্ছে ,

সত্বরই আল্লাহর নুসরাত প্রকাশিত হবে ।”

তাঁর ঈমান এবং উপলব্কি যা বলেছিল , পরবর্তী অবস্থা ছিল তারই বাস্তবতা ।

## কমাণ্ডারদের উপদেষ্টা পরিষদ

১৯৯০ ঈসায়ীর জুন মাসে যখন আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহ আফগান সমস্যাকে “জিহাদের পরিবর্তে আলোচনার” মাধ্যমে সমাধান করার এবং আফগানিস্তানে তাদের ভাষায় ব্যাপকভিত্তিক (মুজাহিদ , কমিউনিষ্ট এবং মুজাহিদ সংগঠনসমূহের নেতাদের উপর বিভিন্ন প্রকারের রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করছিল, তখন আফগানিস্তানের বড় বড় কমাণ্ডারগণ সাংগঠনিক মতবিরোধের উর্ধ্বে উঠে এসে

**سرتا سری شوری قوماند انان افغانستان**

(আফগানিস্তানের আত্মোৎস্গী কমাণ্ডারদের পরামর্শ সভা ) নামে . একটি পরিষদ গঠন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, দলীয় প্রধানদের সিদ্ধান্ত যাই হোক না কেন প্রত্যেক কমাণ্ডার নিজ নিজ এলাকায় পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে জিহাদের গতিকে অব্যাহত রাখবেন। সেই উপদেষ্টা

পরিষদে মুজাহিদদের সাতটি সংগঠনের কমাণ্ডারগণই শামিল ছিলেন।

উপদেষ্টা পরিষদের একটি সমর পরিকল্পনার অধীনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল যে, সমস্ত সংগঠনের কমাণ্ডারদের সাথে সম্মিলিতভাবে উত্তর আফগানিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ শহর 'খোজাগার-এর উপর কমাণ্ডার আহমদ শাহ মাসউদ এবং দক্ষিণ আফগানিস্তানের শহর খোস্তের উপর মাওলানা জালালুদ্দীন হকানী আক্রমণ করবেন। কিছু অজ্ঞাত কারণে “খোজাগারের” উপর আক্রমণ করা হয়ে ওঠেনি। পরবতীতে কোন সময় আক্রমণ হয়ে থাকলে তা আমার জানা নেই। তবে ১লা রমাযানূল মুবারক ১৪১১ হিজরী (৮ই মার্চ ১৯৯০ ঈসায়ী) খোস্তের উপর আক্রমণ করা হয়।

জালালাবাদের বিপরীতে সাত সংগঠনের কমাণ্ডারগণ সম্মিলিতভাবে করেন। ছোট ছোট বিষয়সমূহেও সবিস্তারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সাতটি কমিটি তৈরী করে তাদের উপর বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। সাত সংগঠনেরই অভিজ্ঞ কমাণ্ডারদের সমন্ময়ে প্রত্যেকটি কমিটি গঠন করা হয়। বিভিন্ন দিক থেকে নিজ নিজ টার্গেটের দিকে নির্ধারিত সময়মত অগ্রসর হওয়া ও অন্যান্য তৎপরতা পরিচালনা করা জাদের দায়িত্বে ছিল। কেন্দ্রীয় কমাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যেক কমিটির যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত ছিল। সাতটি সংগঠনের নিম্নবর্ণিত উর্ধ্বতন কমাণ্ডারদের সমবুয়ে কেন্দ্রীয় কমান্ড গঠিত হয়।

22

22 দেখুন, মাওলানা পীর মুহাম্মাদের সাক্ষাৎকার, মাসিক আল ইরশাদ, ইসলামাবাদ। খোস্ত বিজয় সংখ্যা,

১. মাওলানা জালালুদ্দীন হক্কানী, হিযবে ইসলামী ছউনুস খালেস গ্রুপ)

২. ইঞ্জিনিয়ার ফয়েজ মুহাম্মাদ সাহেব, হিযবে ইসলামী হিকমত ইয়ার গ্রুপ)

৩. মাওলানা পীর মুহাম্মাদ, ইত্তেহাদে ইসলামী প্রেযেসর সাইয়্যাযের সংগঠন)

৪. তোরান আমানুল্লাহ খান, জমইয়্যতে ইসলামী প্রযেসর বুরহানুদ্দীন রব্বানীর সংগঠন)

৫. কমাণ্ডার গুল মজিদ, হরকতে ইনকিলাবে ইসলামী (মাওলানা নাসরুল্লাহ মনসুর গ্রুপ)

৬. হাজী মালাখানা, হরকতে ইনকিলাবে ইসলামী মোওলানা মুহাম্মাদ নবী মুহাম্মাদী গ্রুপ)

৭. নূর আহমাদ শাহ সাহেব, নাজাতে মিল্লী প্রযেসর সিবগাতুল্লাহ মুজান্দিদীর সংগঠন)

৮. ঝগড়ন খুজাক কিংবা কমাণ্ডার শের খান কুটী) মাহাযে মিল্লী (পীর সাইয়্যেদ আহমাদ গিলানীর সংগঠন)।

এ সমস্ত সংগঠনের আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ কমাণ্ডারের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি ছিল মাওলানা আরসালান খান রহমানীর

পৃঃ ৬ ও ১১ কমাণ্ডারদের নামের কিছু বিবরণ কাশ্মীরী সাল্লামাহু আমার ফরমায়েশে পুত্রযোগে আমাকে অবহিত করেন। তিনি এই লড়াইয়ে বড় একটি মোর্চার আমীর ছিলেন। ইতিপূর্বে কয়েকটি লড়াইয়ের আলোচনায় তার কথা এসেছে। কিছু বিবরণ মাওলানা আরসালান খান রহমানী সাহেবের নিকট থেকে পরবর্তীর একটি সাক্ষাতে অবগত হই।

নেত্ত্বাধীন। যাঁরা যুদ্ধের পূর্বে এবং যুদ্ধকালীন সময় খোস্তের সমস্ত রণাঙ্গন অবিরাম পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। যাতে করে বিভিন্ন মুজাহিদ দলের নিকট গিয়ে তাদের সাহস বৃদ্ধি করা যায়, অনাকাংখিত পরিস্থিতির যথাসময়ে বিহিত করা যায়, আর আল্লাহ না করুন কোথাও কোন মনোমালিন্য হয়ে থাকলে সাথে সাথে তার সমাধান করা যায়।

মুজাহিদরা এ লড়াইয়ে দুশমন থেকে ছিনিয়ে নেওয়া কয়েকটি রাশিয়ান ট্যাংকও অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ব্যবহার করেন। গেরিলা যুদ্ধের মূলনীতি হলো . অকস্মাৎ আক্রমণ করে উধাও হয়ে যাও। পক্ষাত্তরে খোস্তের এই শেষ লড়াই ছিল সামনাসামনি একটি সুসংহত লড়াই। যার উদ্দেশ্য আঘাত করে উধাও হওয়া নয়, বরং শহরসহ পূর্ণ খোস্ত জেলা জয় করে তার উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। সম্মুখ লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা মুজাহিদরা খোস্তের ময়দানে এই'প্রথমবার.লাভ করেন।

প্রত্যেক সংগঠনের কমাণ্ডারগণ এক প্রাণ হয়ে এবং দলীয় রাজনীতির উধের্ব উঠে পরিপূর্ণ একতা ও পারস্পরিক পরামর্শের যেই ঈমানোদ্দীপক পরিবেশে এই যুদ্ধ করেন, তা" দুশমনের অজস্র অস্ত্র এবং যাবতীয় আস্তর্জীতিক ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলে।

রমাযানের প্রায় দেড়মাস পূর্ব থেকে মুজাহিদগণ, তাদের রেডিও যোগে অবিরাম ঘোষণা করছিল এবং সংবাদ প্রচার করছিল যে, খোস্ত পরিপূর্ণ বিজয় হওয়া পর্যন্ত

তাদের সম্মিলিত এই আক্রমণ অব্যাহত থাকবে। যারা কমিউনিষ্ট সরকারকে পরিত্যাগ করবে এবং লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে তাদেরকে ইসলামী এঁতিহ্যমত পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করা হবে। রেডিও এবং পুত্র মারফত শহরের অধিবাসীদেরকে (যা এখন অনেকটাই কমিউনিষ্ট, মিলিশিয়া এবং সৈন্যদের পরিবার সম্বলিতই ছিল) বলা হচ্ছিল যে, যারা শহর থেকে বের হয়ে অন্য কোথাও আশ্রয় নিতে চায়, তাদেরকে অবরোধ থেকে বাইরে চলে যাওয়ার পথ দেওয়া হবে।

এ সমস্ত ঘোষণার ফলে দেখতে দেখতে খোস্তের অধিকাংশ অধিবাসী চতুর্দিকে নিজ নিজ কবিলার লোকদের নিকট চলে যায়। মুজাহিদদের ট্রাকও তাদের সাহায্য করে। এই পরিস্থিতি শত্রসেনা এবং মিলিশিয়ার সাহসের উপর চরম আঘাত হানে।

আক্রমণের জন্য পবিত্র রমাযানকে নির্বাচিত করা কয়েকটি কারণে বরকতপূর্ণ এবং যথার্থ ছিল।

১. এতিহাসিক গাযওয়ায়ে বদর এবং
মক্কা বিজয়ের ঘটনাসমূহও পবিত্র রমাযান মাসে সংঘটিত হয়।

২. বসন্ত খতু আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। শীতের তীব্রতা দিনদিন কমে আসছিল।

৩. এই দুই মাস মাদরাসাসমূহের বার্ষিক ছুটির সময়। এ সময় তালিবে ইলম এবং উত্তাদগণ একাগ্রতার সাথে এতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং বাস্তবেও তাই হয়েছে।

৪. উপসাগরের প্রজ্বলিত "নমরুদের অগ্নি তখনও নির্বাপিত হয়নি। ঠিক এই সময়েই মুজাহিদদের সম্মিলিত এই আক্রমণ দ্বারা মুসলিম বিশ্ব এই পয়গাম লাভ করে —

***آج بھی □و ، جو ابراھیم کا ایمان پیدا***

***آگ کر سکتی □□ انداز گلستاں پیدا***

"আজও ইবরাহীমের (আঃ) মত ঈমান জন্ম নিলে অগ্নিকুণ্ড

পুষ্পকাননে পরিণত হতে পারে □"

## রণাঙ্গনের বর্তমান পরিস্থিতি

খোস্তের আশপাশের দীর্ঘ পাহাড়সারি —যা দুশমনের প্রথম প্রতিরক্ষা ব্যূহ —তোরগোড়া বিজয়ের মাধ্যমে পূর্বেই মুজাহিদদের হাতে পরিপূর্ণরূপে চলে এসেছিল। এখান থেকে তারা এয়ারপোর্টকে টার্গেটের আওতায় এনে যদিও খোস্তে রসদ পৌঁছার আকাশ পথকেও বন্ধ করে দিয়েছিল, কিন্তু এতদিনে দুশমন একটি নতুন এয়ারপোর্ট তৈরী করেছিল। এই এয়ারপোর্ট এ রমাযানেরই তিন মাস পূর্বে চালু করা হয়। তারপরও মুজাহিদগণ দুশমনের চলাচলকারী বিমানসমূহকে এখান থেকে টার্গেট বানাতে থাকে। এ পর্যায়ে কাবুলের বিমান প্যারাসুটের মাধ্যমেও খোস্তে তাদের রসদ নিক্ষেপ করতে থাকে।

খোস্তের চতুর্দিকে দুশমনের দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা লাইন ছিল খোলা ময়দান। তোরগোড়া বিজয়ের পর মুজাহিদগণ পদে পদে

নিজেদের জান এবং মূল্যবান অঙ্গ কুরবানী করে পশ্চিম, দক্ষিণ এবং পুর্বদিক থেকে কয়েক কিলোমিটার করে ময়দানী এলাকা মুক্ত করে দুশমনকে "শামিল নদীর" তাঁর পর্যন্ত হটিয়ে দিয়েছিল। খোলা ময়দানের যেই বিশাল এলাকা মুজাহিদগণ আযাদ করেছিলেন, তার কয়েকটি জায়গা সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তার কিছু বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হলো_

১. এয়ারপোর্ট থেকে অনেকটা পূর্ব দিকে “লাকান” নামক একটি গোত্রের বাস রয়েছে। সেখানে অনেক “কোটী”ও (বেদুঈন) রয়েছে বা এক সময় ছিলু। এজন্য এলাকাটিকে “বেদুঈন পল্লী” বা 'লাকানদের এলাকা, বলা হয়। তারাকায়ীর শাসনকালে তাদের একটি মসজিদ কমিউনিষ্টরা জালিয়ে দেয়। বর্তমানে লাকান গোত্রটি শামিল নদী অতিক্রম করে এয়ারপোর্টের পূর্ব পাশে এসে সেখানকার পাহাড় ও টিলার মধ্যকার জনশূণ্য পল্লীকে নিজেদের সামরিক ঘাঁটি বানিয়েছে। আবদুল মান্নান কোচী এই এলাকায় বিরাট গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব সম্পাদন করেন। তিনি দুশমনের ২৭টি বিমানকে ধ্বংস করেন। কিন্তু তিনি খোস্তের শেষ লড়াইয়ের পূর্বেই মাইন বিস্ফোরণে শহীদ হয়ে যান। এখান থেকে এয়ারপোর্ট এবং শহরের দিকে যেতে নদীটি প্রতিবন্ধক ছিল না। অধিকন্ত এই জানবাজরা রমাযানের মাত্র দুইদিন পূর্বে বিমান বন্দরের দিকে অগ্রসর হয়ে 'ফারান বাগ” কসবাটিকেও আযাদ করে মাওলানা জালালুদ্দীন হক্কানীর নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দেয়। এখান থেকে বিমান বন্দর এত নিকটে ছিল

যে, রানওয়েতে দাঁড়ানো বিমানের ডানা এখান থেকে পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হতো।

২. তোরগোড়া বিজয়ের পর মুজাহিদগণ দক্ষিণ-পশ্চিমে মানিকাণ্ডু এবং তোরকামারের দিক থেকে 'খোস্তের গুরুত্বপূর্ণ থানা দারগায়ী, মুক্ত করেন। শুধু তাই নয়, বরং তারা আরো সম্মুখের কিছু খোলা ময়দান দুশমন থেকে মুক্ত করে ওয়ালিম দুর্গ দখল করেন। দূর্গটি ছিল তোরকামার থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে। সফল-এই অভিযানে মাওলানা নাসরুল্লাহ মানসূরের সংগঠন হরকতে ইনকিলাবে ইসলামী ছিল সর্বাগ্রে। দুশমন থেকে ছিনিয়ে নেওয়া তাদের দুটি ট্যাংকও এই লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিল। তাছাড়া মাওলানা পীর মুহাম্মাদের নেতৃত্বে ইন্তেহাদে ইসলামী আফগানিস্তানের জানবাজ মুজাহিদগণ এবং হরকাতুল জিহাদিল ইসলামীর মুজাহিদগণ নাসরুল্লাহ লেংড়িয়ালের নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ কর্ম সম্পাদন করেন।

23

বর্তমানে ওয়ালিম দূর্গ ছিল রণাঙ্গনের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের জিহাদের সর্ববৃহৎ মারকায। এটি খোস্ত শহরের অনেকটা দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এখান থেকে শহরের

23 নাসরুল্পাহ লেংড়িয়াল সেই গৌরবময় জানবাজ মুজাহিদ, যিনি একাই দুশমনের ছয়টি গানশিপ হেলিকপ্টারকে পরাস্ত করেছিলেন। এটি তাঁর বহুবিধ কৃতিত্বপূর্ণ ঘটনার একটি-যা অনেক পূর্বে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। তিনি গুজরাটের লেংড়িয়াল বংশের লোক। তাই নামের শেযে 'লেংড্য়াল” যোগ না করলে তাঁকে চেনা যেত না। খোস্তের শেষ লড়াইয়ের সময় তাঁকে সংগঠন-_ প্রধানের সহকারী কমাণ্ডার নিযুক্ত করা হয়েছিল।

দিকে প্রায় দুই কিলোমিটার দুরে দুশমনের এদিকের সর্ববৃহৎ সামবিক ঘাঁটি “করড়ি পোষ্ট”! তার উপর আক্রমণ করার জন্য খোলা ময়দান হওয়ার কারণে মুজাহিদগণ কিছুদূর পর্যস্ত একটি স্রোতবিহীন ঝর্ণার মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করতেন, আর তারো সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য হরকতের সাথীগণ অকল্পনীয় এই কীর্তি সম্পন্ন করেন যে, প্রায় এক কিলোমিটার পর্যন্ত এক মানুষ পরিমাণ গভীর পরিখা খনন করেন। এই পরিখা করড়ি পোষ্টের নিকট পর্যন্ত চলে গেছে। মুজাহিদগণ পরিখার পথ ধরে নিত্যদিন এ পোষ্ট্রের উপর আক্রমণ করতেন।

24 পরিখা
খননের এই বিশাল কর্ম সম্পাদন করেছিলেন হরকাতুল জিহাদিল ইসলামীর জওয়ানেরা। এভাবে দুশমনের এই বৃহৎ সামরিক ঘাঁটিটিও মুজাহিদদের আক্রমণের আওতায় চলে আসে।

৩. দক্ষিণ-পূর্ব দিকে “বাড়ীর, দিক
থেকে মুজাহিদগণ প্রায় চার কিলোমিটার পর্যস্ত খোলা ময়দান দুশমন থেকে মুক্ত করে তাদের 'শালাকা, পোষ্ট কব্জা করেছিলেন। এখান থেকে শহরের দিকে (উত্তরে) একেবারে সম্মুখে দুশমনের “চানার পোষ্ট” নামক একটি সামরিক ঘাঁটি ছিল। মুজাহিদগণ তার আশেপাশে

24 পরিখা খনন করা সহ এদিকের সকল কাজে আলহামদুলিল্লাহ দারুল উলৃম করাচীর কয়েকজন তালিবে ইলমও অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন “নূরুল আমীন, (সাল্লামাহু)। তাঁর পরিবারের লোকেরা কোন এক সময় বার্মা থেকে হিজরত করে পাকিস্তান এসেছিলেন। 'দারগায়ী” ও “ওয়ালিম' দূর্গের দিক থেকে পরিচালিত তৎপরতাসমূহের তথ্যসমূহ আমি তাঁর নিকট থেকে এবং হরকাতুল জিহাদিল ইসলামীর বিখ্যাত গেরিলা মুজাহিদ আদীল আহমাদ (সাল্লামাহু)এর নিকট থেকে অবগত হই।

একটি পরিখা এবং কয়েকটি মোর্চা বানিয়ে তাকেও আক্রমণের আওতায় নিয়ে এসেছিলেন। তার পিছনে 'শামিল' নদী পর্যন্ত দুশমনের অন্য কোন সামরিক ঘাঁটি ছিল না। গুরুত্বপূর্ণ এই কাজটি মাওলানা জালালুদ্দীন হককানীর নেতৃত্বে আফগান ও আরব মুজাহিদগণ এবং পাকিস্তানী মুজাহিদদের অপর একটি সংগঠন হরকাতুল মুজাহিদীন সম্পাদন করেছিল।

25

25 পাকিস্তানী মুজাহিদদেক্র সংগঠন “হরকাতুল জিহাদিল ইসলামীর অলোচনা তো আপনারা এ কিতাবে বার বার পড়ে আসছেন। কারণ, তার আমীর, কমাণ্ডার ও মুজাহিদদের সঙ্গে আমার খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু পাকিস্তানী মুজাহিদদেরই অপর একটি সংগঠন 'হরকাতুল মুজাহিদীন-_যা মাওলানা জালালুদ্দীন হক্কানীর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল_-তার আলোচনা এই প্রথম এলো। তার কারণ এই যে, আমি তার জিহাদী খেদমত সম্পর্কে মোটামুটি অবগত ছিলাম এবং তার সম্ভাবনাময় মুজাহিদ এবং আমীর সাহেবের সঙ্গে মুলাকাতও হতে থাকে, বরং দারুল উলুম করাচীতে এ সংগঠনের কয়েকজন জানবাজ মুজাহিদও অধ্যয়ন রত ছিলেন, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে এমন খোলামেলা এবং অকৃত্রিম মুলাকাতের সুযোগ হয়নি যে, আমার অভ্যাসমত প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসাবাদ করে খুটে খুটে ঘটনার যাচাই করতে পারি। এখন এই সংগঠনের একজন অতি করাচীতে দাওরায়ে হাদীসের তালিবে ইলম হয়েছেন। তাই এখন তাঁর থেকে বিভিন্ন তথ্য অবগত হওয়ার পর্যাপ্ত সুযোগ হয়েছে। মৌলবী গিয়াস খান খোস্তের উপর সম্মিলিত আক্রমণের সময়ও শালাকা পোষ্টের দিক থেকে পরিচালিত সামরিক তৎপরতায় শরীক ছিলেন। এদিক থেকে অগ্রাভিযানের বিস্তারিত বিবরণ আমি তার নিকট থেকে অবগত হই। এ ব্যাপারে এ সংগঠনের মাসিক পত্রিকা “সদায়ে মুজাহিদ" থেকেও সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

৪. মুজাহিদগণ দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে শহরের দিকে অনেক সম্মুখে অগ্রসর হয়ে দুশমনের “দারমুলক পোষ্ট” প্রায় ছয় মাস ধরে দখল করে রেখেছিলেন। এটি এখানকার ইউনিয়ন “শেখা মীর" এর একটি প্রতিরক্ষা চৌকি। এই লড়াইয়ে আফগান মুজাহিদগণ এবং পাকিস্তানের উভয় সংগঠন অংশগ্রহণ করে। দারমুলক পোষ্টকে নিজেদের সামরিক ঘাঁটি বানিয়ে মুজাহিদগণ “শেখা মীরকেও অনেকটা আক্রমণের আওতায় এনেছিলেন। যা এদিকে শামিল নদীর দক্ষিণ তীরের নিকটবর্তী দূশমনের সর্ববৃহৎ সামরিক ঘাঁটি এবং বিরাট সেনা বসতিপূর্ণ এলাকা।

মোটকথা, ১লা রমাযানুল মুবারক ১৪১১ হিজরী খোস্তের উপর চূড়ান্ত আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই দুশমনের দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা ব্যুহটিও দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ-পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিক থেকে শামিল নদী পর্যস্ত সংকুচিত হয়ে এসেছিল। পূর্বাদকে মুজাহিদগণ শামিল নদীও অতিক্রম করে বিমানবন্দর এবং শহরের পশ্চাতে পৌঁছে নিজেদের পজিশন সুদৃঢ় করেছিলেন।

রমাযানের পূর্বে মুজাহিদগণ খোস্তের উত্তর দিক থেকে খোলা ময়দানে কতটুকু পর্যন্ত সম্মুখে অগ্রসর হয়েছিলেন তার বিবরণ আমি অবগত হতে পারিনি। এদিককার কোন মুজাহিদের সঙ্গে আমার যোগাযোগই হয়নি। তবে হরকাতুল জিহাদিল ইসলামীর সম্তাবনাপূর্ণ জানবাজ মুজাহিদ আদিল আহমাদ সোল্লামাহু যিনি খোস্তের পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণের রণাঙ্গনসমূহে গত তিন বছর ধরে লড়াই করে আসছেন, বরং সবার আগে আগে

রয়েছেন_-তিনি বলেন যে, এদিককার খোলা ময়দানের অনেক দূর পর্যন্ত মুজাহিদরা অগ্রসর হয়েছিলেন, কিন্তু উত্তর পশ্চিমের 'কিকার্ক যিয়ারত বাবা" নামে প্রসিদ্ধ উঁচু পাহাড়ের উপরের দুশমনের শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটিটি তখনও বিজিত হয়নি।

রণাঙ্গনের বিস্তারিত এই পরিস্থিতি দ্বারা প্রতিভাত হয় যে, খোস্তের আসল লড়াই রমাযানের শেষ লড়াইয়ের পূর্বেই বিগত 'এগার বছরের ছোট-বড় অসংখ্য লড়াইয়ের রূপে সম্পন্ন করা হয়েছিল। দীর্ঘ এগারো বছরব্যাপী বিস্তৃত এই ধৈর্যসংকুল লড়াইসমূহে মুজাহিদগণ একটি করে ধাপ সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য যেই নির্ভীকভাবে নিজেদের মূল্যবান প্রাণ ও অঙ্গসমূহ কুরবানী করেছেন, দুশমনের প্রতিরক্ষা ব্যুহকে ভেঙ্গে ফেলার জন্য প্রতি মুহূর্তে যেই দুঃখ ও দুযেগি সহ্য করেছেন এবং দৃঢ়তা ও বীরত্বের যেই উদ্দীপনাময় আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা" এ যুগে বিস্ময়কর তো বটেই, তবে তা এত অধিক যে, তা, আলোচনা করার জন্য স্বতন্ত্র পুস্তকের প্রয়োজন। এই রণাঙ্গনের যে সমস্ত মুজাহিদ সম্পর্কে আমি ব্যক্তিগতভাবে অবগত রয়েছি, তাদের মধ্য থেকে মাত্র কয়েকজনের কৃতিত্ব গাঁথা তাও আবার অতি সামান্যই বর্ণনা করতে পেরেছি। কয়েক পাতা পূর্বে তোরকামার এবং 'বাড়ী”র দুটি যুদ্ধের ইতিবৃত্তও খোস্তের আশেপাশে সংঘটিত এ সমস্ত লড়াইয়ের শুধুমাত্র করেছে। এই রণাঙ্গনের হাজার হাজার শহীদ এবং খুনের মধ্যে সাতার কেটেই আজ গাজী

মুজাহিদগহ শামিল নদীর নিকটে পৌঁছে . দুশমনের বুকের " উপর চড়ে বসেছেন। এখান থেকে পিছন ফিরে এঁরা যখন খোলা ময়দান এবং ভয়ঙ্কর পাহাড়সারির দিকে তাকিয়ে দেখেন __যা তারা দীর্ঘ এগারো বছরে পার হয়ে এসেছেন__তখন ভাইজান মরহুমের ভাষায় এমন মনে হয় যে —

***محو تحير سوچ ر□□ □يں، اب سر منزل ا□ل وفا***

***کیس□ آساں آساں گذر□ ، رست□ کیسا مشکل تھا!***

প্রেমিকদল মঞ্জিলে উপনীত হয়ে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে ভাবছে যে ,

পথ কত বন্ধুর ছিল , অথচ তা কত সহজেই তারা অতিক্রম করেছে □

## স্কাড মিসাইল

রাশিয়ান সেনাবাহিনীর পশ্চাদপদতার পর মুজাহিদদেরকে যে দুশমনের সঙ্গে এখন মোকাবেলা করতে হচ্ছে , তাদের শিরায়ও আফগানী রক্তই প্রবাহিত ছিল। তারা এখনও সাহস হারায়নি। রাশিয়ার ক্রীড়নক কাবুল সরকার খোস্তের প্রতিরক্ষার জন্য তাদের সর্বোচ্চ ও পরিপূর্ণ শক্তি ব্যবহার করছিল। মুজাহিদদের বিরুদ্ধে তাদের বিমান যোগে আক্রমণ ও স্কাড মিসাইলের আক্রমণ তীব্রতর হয়েছিল।

ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপযোগ্য রাশিয়ান স্কাড মিসাইল উপসাগরীয়

যুদ্ধের সময় সাদ্দাম হোসেন যার কয়েকটি তেল আবিবে এবং কয়েকটি সউদী আরবের সীমান্তের বসতি এলাকায় নিক্ষেপ করে সমগ্র বিশ্বে হৈচৈ রটিয়েছিল এবং তাকে ভাঙ্গার জন্য বীর আমেরিকা পেট্রিয়াট মিসাইল নিক্ষেপ করে নিজেদের টেকনোলজির স্বীকৃতি আদায় করেছিল। একটি পত্রিকায় আমি পড়েছিলাম যে, কাবুল সরকারই সাদ্দাম হোসেনকে এগুলোর যোগান দিয়েছিল, কাবুল সরকারের নিকট এসকল মিসাইলের কমতি ছিল না।

১৯৮৮ ইঈসায়ীতে যখন তথাকথিত জেনেভা চুক্তি হয় এবং রুশ সৈন্যরা তাদের প্রত্যাবর্তনের (পশ্চাদপদতার) শিডিউল ঘোষণা করে, তখন তারা নিজেদের স্থলাভিষিক্ত কাবুল সরকারের হাতে এ সমস্ত মিসাইল দিয়ে যায়। করাচীর 'দৈনিক জং পত্রিকায় এ সংবাদের সাথে একটি মিসাইলের চিত্রও প্রকাশ করা হয়েছিল। এ সমস্ত মিসাইলকে অনেক মোটা ও বেঢং একটি উচা মিনারের মত দেখা যায়। এখান থেকে এগুলোর রেঞ্জের অনুমান করা যায় যে, সাদ্দাম এগুলোকে ইরাক থেকে ফায়ার করে ইসরাইলের তথাকথিত রাজধানী তেল আবিবকে এবং সউদী আরবের সীমান্ত শহরগুলোকে নিশানা বানিয়েছিল।

১৯৮৮ ঈসায়ীতে কাবুল সরকার অনেকগুলো মিসাইল নিক্ষেপ করলে আমি একবার শহীদ কমাণ্ডার যুবাইরকে এগুলোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি তিনি স্বভাব মাফিক মুচকি হেসে উত্তর দেন যে, "হযরত! এগুলো আমাদের কিছুই করতে পারবে না। পাহাড়ের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে টুকরা টুকরা হয়ে যাবে।”

বর্তমান পরিস্থিতি তার এই উত্তরকে সঠিক প্রমাণিত করেছে। কারণ, এ সমস্ত মিসাইল শহরের মধ্যে তো অনেক ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে পারে, কিন্তু পাহাড় ও পাথরের মধ্যে বসবাসকারী 'ঈগলদের”কে লক্ষ্যে পরিণত করা এগুলোর জন্য সহজ ব্যাপার ছিল না। তারপরও ১৯৮৮ ঈসায়ীতে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে অকৃষ্ঠচিত্তে এগুলো ব্যবহার করা হচ্ছিল। যার লক্ষ্য ছিল তিনটি__

১. পাকিস্তানকে ভয় দেখানো যে, তার কয়েকটি শহর তাদের আওতায় রয়েছে।

২. মুজাহিদদের মধ্যে ভীতি ও হতাশা বিস্তার করানো।

৩. মুজাহিদগণ কোন শহর জয় করলে বা খোলা ময়দানে তাদের কেন্দ্র থাকলে তাকে লক্ষ্যে পরিণত করা।

এবার যখন মুজাহিদগণ পাহাড় থেকে বের হয়ে খোস্তের উন্মুক্ত প্রান্তরেও তাদের ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরবর্তীর সমস্ত তৎপরতা এ ময়দান থেকেই পরিচালিত হবে, এমতাবস্থায় দুশমনের যুদ্ধবিমান এবং কাবুল থেকে নিক্ষেপ করা-এ সমস্ত মিসাইল মুজাহিদদের জন্য বিরাট এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

রমাযানের প্রথম সপ্তায় কিংবা তার দুর্তিন দিন পূর্বে মাওলানা জালালুদ্দীন হককানীর মারকাযে খলীলের উপর-_যেটি বর্তমানে সমস্ত সংগঠনের সামরিক হেড কোয়ার্টার-_দুটি স্কাড মিসাইল এসে পতিত হয়। যার আঘাতে বিশজন জানবাজ মুজাহিদ শহীদ হন। চল্লিশ জন আহত হন। ইতিপূর্বে

এখানে আরো কয়েকজন মুজাহিদ মিসাইলের আঘাতে শহীদ হন।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল যে, দুশমনের বিমান প্যারাসুটের মাধ্যমে রসদপত্রের সাথে খোস্তের জন্য রিজার্ভ ফৌজও পৌঁছাচ্ছিল। কারণ, রময়ানের একদিন পূর্বে দীনার শাহ পোষ্ট থেকে পালিয়ে আসা এক সৈন্য মাওলানা পীর মুহাম্মাদকে বলে যে, কারড়ি পোষ্ট এবং দীনার শাহ পোষ্ট ও অন্যান্য পোষ্টে গালিম জান এবং দুস্তম মিলিশিয়ার তিনশ' সৈন্যের রিজার্ভ ফোর্স সম্প্রতিই পৌঁছানো হয়েছে। এতদসত্বেও দুশমনের এত সর্ব দৌড়ঝাঁপ এ আধমরা নাগিনী সাপের লম্ফবাম্প থেকে ব্যতিক্রম ছিল না, মৃত্যুর পূর্বে শেষ চেষ্টা স্বরূপ যার বিষাক্ত ফনা চতুর্দিকে মরিয়া হয়ে আঘাত করতে থাকে। অথচ তার কোমর ভেঙ্গে গেছে।

খোস্ত শহর জয় করার জন্য এখন এমন একটি বড় ধরনের আক্রমণের জরুরত ছিল, যা সকল মুজাহিদ সংগঠন সম্মিলিতভাবেই কেবল করতে পারে। ফসল তৈরী ছিল। তা" কাটার জন্য প্রয়োজন ছিল কিছু মূল্যবান প্রাণ কুরবানী করা। যা পেশ করার জন্য আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ছাড়াও আরো অনেক দেশ থেকে আগত নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদগণ একে অপরের চেয়ে অগ্রগামী হওয়ার জন্য ব্যাকুল ছিলেন। এবং প্রত্যেকের বক্ষ এই সংকল্প দ্বারা টইটুম্বুর ছিল –

***وہ سنگ گراں جو حائل ہیں رستے سے ہٹا کر***
***دم لیں گے***

***ہم راہِ وفا کے رہرو ہیں، منزل ہی پر جا کر دم لیں گے***

'পথের প্রতিবন্ধক -পাষাণ পথ থেকে হটিয়েই
আমরা ক্ষান্ত হবো ।

আমরা প্রেমপথের পথিক , গন্তব্যে পৌঁছেই
আমরা ক্ষান্ত হবো ।"

## যুদ্ধের সফল সূচনা

১লা রমাযানুল মুবারক ১৪১১ হিজরী (১৮ই মার্চ ১৯৯১ ঈসায়ী ) দক্ষিণ -পশ্চিম রণাঙ্গনের মুজাহিদগণ -_যাঁদের কেন্দ্র ছিল ওয়ালিম কেল্লা __কারড়ি পোষ্টের উপর চূড়ান্ত আক্রমণের প্রস্তুতির কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ করেই বিকাল বেলা সংবাদ পান যে , আজ সকালে মাওলানা পীর মুহাম্মাদের নেতৃত্বে মুজাহিদগণ "বাড়ী 'র দেক্ষিণ ) দিক থেকে শিখা মীরের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা পোষ্টের উপর আক্রমণ করেন এবং সেগুলো জয়ও করেন।

উদ্দীপনাময় এই সুসংবাদের সাথে সাথে তারা এই নির্দেশও লাভ করেন যে , এখন কারড়ি পোষ্টের উপর শক্তি ও সময় ব্যয় না করে তারা যেন শিখামীরেরই পশ্চিম দিকের পোষ্ট ও ক্যাম্পসমূহের উপর আক্রমণ করেন।

নতুন এই কর্মকৌশলের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, শিখামীরের পূর্ব ও পশ্চিম দিকের অরক্ষিত নিরাপত্তা চৌকিসমূহও পরিচ্কার করে শিখামীরের উপর তিন দিক থেকে একযোগে আক্রমণ করা হবে। এটি জয় করে সেখান দিয়ে এবং তার আশপাশ দিয়ে নদী অতিক্রম করে

শহরের দিকে অগ্রসর হবে এবং কারডিপোষ্টের মত দূরবর্তী পোষ্টসমূহের উপর- যেগুলো জয় করা ছাড়াও শহরের দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব- চাপ প্রয়োগের জন্য মুজাহিদদের কয়েকটি বাহিনী নিকটবর্তী ক্যাম্প এবং মোর্চাসমূহে অবস্থান করবে।

দক্ষিণ_পশ্চিমের এই রণাঙ্গনে দেড় সহস্র মুজাহিদ ওয়ালিম কেল্লা এবং আশপাশের ছোট ছোট কেল্লা (হাঁবিলি) ও মোর্চাসমূহে নিয়োজিত ছিলেন। ধাদের নেতৃত্ব দান করছিলেন কেন্দ্রীয় কমাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য গুল মজিদ” নিজে। তার অধীনে বিভিন্ন সংগঠনের মুজাহিদগণ নিজ নিজ আমীরের উপ-নেত্ত্বাধীন ছিলেন। হরকাতুল জিহাদিল ইসলামীর ১৭০ জন মুজাহিদের উপ-নেতৃত্ব ছিল নাসরুল্লাহ লেংড়িয়ালের হাতে।

রমাযানের তৃতীয় রাতে ২টার সময়ই সাহরী খেয়ে ৩০০ জানবাজ মুজাহিদ ওয়ালিম কেল্লা থেকে পূর্ব দিকে পদব্রজে যাত্রা করেন। রাতের অন্ধকারে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে দুশমনের মোর্চার প্রায় ২০০ মিটার পূর্বে একটি শুকনা পুকুরের মধ্যে পৌঁছে পাড়ের আড়ালে থেমে যান। এই পাটি ছিল শকত্রর দিকে। কিন্ত এত লম্বা ছিল না যে, তার আড়ালে সবাই অবস্থান নিতে পারে। অবশিষ্ট মুজাহিদের জন্য মোর্চা খনন করতে হয়। ফজরের নামায এখানেই পড়া হয়। দল-প্রধানের পক্ষ থেকে রোযা না রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়__জিহাদে দুর্বল হয়ে যাওয়ার আশংকা হলে শরীয়তে রোযা না রাখারই হুকুম রয়েছে। রমাযানের পরে সে

রোযার কাযা করে নিবে। তারপরও যাদের এরূপ আশংকা ছিল না তারা রোযা রাখেন।

দুশমনের যে সমস্ত ক্যাম্প এবং পোষ্ট তাদের লক্ষ্যবস্তু ছিল সেগুলো এবং কারড়ি পোষ্টের মাঝে পুরাতন হাবিলিসমূহের মধ্যে মুজাহিদদের গুরুত্বপূর্ণ তোপখানাসমূহের মধ্য থেকে তিনটি তোপখানা প্রায় ১০৭ মিটার পরপর অবস্থান নিয়েছিল। একটির আমীর ছিলেন মুহাম্মাদ ইলিয়াস কাশ্মীরী, দ্বিতীয়টির লিয়াকত কাশ্মীরী, আর তৃতীয়টির ছিলেন খালেদ মাহমুদ (করাচী)। এই সেই খালেদ মাহমুদ, যাঁর ডান পা তোরকামারের রক্তাক্ত লড়াইয়ে মাইন বিস্ফোরণে হাঁটু পর্যন্ত উড়ে গিয়েছিল। শহীদ কমাণ্ডার যুবাইরের সঙ্গে তাঁকেও আশংকাজনক অবস্থায় হাসপাতালে পৌঁছানো হয়েছিল। সুস্থ হওয়ার পর তিনি কৃত্রিম পা দ্বারা কাজ চালানোর চেষ্টা করেন। রমাযানের এই লড়াইয়ের কয়েকদিন পূর্বে লাহোরে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়। তখন তাঁর সঙ্গে ক্র্যাচও ছিল। এর কারণ হিসাবে তিনি বললেন যে, কৃত্রিম পায়ের উপর চাপ দিলে রানের মধ্যে ব্যথা অনুভূত হয়। আমরা কল্পনাও করিনি যে, এ অবস্থাতেও তিনি খোস্তে গিয়ে গোলাবর্ষণের মাধ্যমে দুশমনের ১২টা বাজাবেন।

এই মোর্চা তিনটি ছিল পুকুরের মধ্যে আত্মগোপনকারী মুজাহিদদের পিছনে বেশ দূরে একটু বামদিকে। পুকুরের ডান দিকে দূরবর্তী পাহাড়সারির নিকটে আরব এবং আফগান মুজাহিদগণ তাঁদের তোপখানার মধ্যে প্রভাত উদয়ের প্রতীক্ষায় ছিলেন। ওয়ারলেসযোগে

সবারই পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ বহাল ছিল। সম্মুখে একটু ডানদিকে দুশমনের একটি শক্তিশালী মোর্চা এবং তার পিছনে তাদের ক্যাম্প ছিল। ক্যাম্পের বাম দিকে একটি নিরাপত্তা চৌকি এবং পশ্চাতে দু’টি পোষ্ট ছিল।

ভোরের আলো ফুটতেই ক্যাম্প এবং তার নিরাপত্তা চৌকিসমূহের উপর ডান দিক থেকে আরব এবং আফগান মুজাহিদরা রকেট বর্ষণ করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু সম্মুখের নিকটবর্তী মোর্চার উপর তারা রকেট বর্ষণ করেননি। যেন নিকটেই পুকুরের মধ্যে আত্মগোপনকারী মুজাহিদগণ তাদের রকেটের আওতায় চলে না আসেন।

৯টার সময় কমাণ্ডার গুল মজিদ রকেট বহনকারী একটি বাহিনীকে ঝোপঝাঁড়ের আড়াল দিয়ে এ মোর্চার দিকে পাঠিয়ে দেন। তাঁরা মাত্র ১৫০ মিটার দূর থেকে মোর্চার উপর রকেট নিক্ষেপ করেন। এঁ বাহিনীর সম্মুখ ভাগে আসলাম উধির আফগানী এবং দারুল উলুম করাচীর স্তাবনাময় তালিবে ইলম মৌলভী মতিউর রহমান ছাড়া আদীলও ছিলেন। “বাড়ী'র লড়াইয়ের দু” বছর পূর্বে আদীলের একটি বাহু মারাত্মকভাবে ভেঙ্গে যায়। সেই হাতটি এখনও সীনার ঈঙ্গে ঝুলিয়ে বাঁধা ছিল। তিনি এক হাত দিয়েই লাঞ্চার ধরে রেখে রকেটের পর রকেটের ফায়ার করছিলেন। দুশমন সেনারা এই দৈব-বিপদ সহ্য করতে না পেরে মোর্চা ছেড়ে এমন দক্ষতার সাথে পালিয়ে যায় যে, পালানোর সময় একজনকেও দেখা যায়নি।

মুজাহিদদের ট্যাংক
পৌনে দশটার সময় সেখানে মাওলানা নাসরল্লাহ মনসুরের সংগঠন হরকতে ইনকিলাবে ইসলামীর দুটি ট্যাংক চলে আসে। একটি একটু নষ্ট থাকার কারণে সম্মুখে অগ্রসর হতে পারেনি। দ্বিতীয়টি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে ক্যাম্প এবং নিরাপত্তা চৌকিসমূহের উপর অগ্নিবর্ষণ আরম্ভ করে। আর পদাতিক মুজাহিদগণ তার আড়ালে ফায়ার করতে করতে এবং শ্লোগান দিতে দিতে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকে। প্রাথমিক চিকিৎসাদানের দায়িত্বে নিয়োজিত বাহিনী এবং প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে কিছু মুজাহিদ পুকুরের মধ্যেই রয়ে যান। কমাণ্ডার নাসরুল্লাহ লেংড়িয়ালকেও প্রধান কমাণ্ডার গুল মজিদ এখানেই নিয়োজিত করেন এবং নিজে সম্মুখে চলে যান।

ট্যাংকটি ক্যাম্প ও তার বাম দিকের পোষ্টের নিকট পৌঁছলে দুশমন উভয় স্থান থেকে পরিখা পথে যো ক্যাম্পকে আশপাশের পোষ্টসমূহের সাথে সংযুক্ত করত) পালিয়ে যায়।

দারুল উলুম করাচীর সম্ভাবনাময় তালিবে ইলম মৌলভী নূরুল আমীন (সাল্লামাহু) বলে যে, আমরা পলায়নপর সৈন্যদের উপর ক্লাসিনকোভ দ্বারা ফায়ার করি, কিন্তু তারা দেখতে দেখতে পিছনের নিরাপত্তা চৌকির পিছনে অদৃশ্য হয়ে যায়। আর সাথে সাথে আমাদের উপর তিন দিকে থেকে মারাত্মক গুলি বর্ষণ আরম্ভ হয়ে যায়। ক্যাম্পের পিছনের নিরাপত্তা চৌকির পশ্চাত থেকে দুশমনের একটি ট্যাংক

ভূগর্ভস্থ মোর্চার মধ্যে লুকিয়ে থেকে এলোপাতাড়ি অগ্নি উদগীরণ আরম্ভ করে। আমরা তার শুধুমাত্র ব্যারেলটি দেখতে পাই। তার বামদিকে অনেক দূরে একটি বুরুজবিশিষ্ট দূর্গ ছিল। স্খোন থেকে বড় মেশিনগান এবং এন্টিএয়ারক্রাফটের গুলি বৃষ্টির মত আসতে থাকে এবং ডানদিকে দক্ষিণ-পূর্বের দূরের একটি কেল্লা থেকে রকেট ও গোলা বর্ষণ আরম্ভ হয়।

দুশমনের ফায়ারের প্রধান টার্গেট ছিল আমাদের ট্যাংক। একজন আফগান মুজাহিদ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ট্যাংকটি চালাচ্ছিলেন। তাঁর ষোল-সতের বছর বয়সী পুত্র ছিল সেই ট্যাংকের তোপচি। ট্যাংকটি দুশমনের উপর গোলাবর্ষণ করতে করতে এবং আত্মরক্ষা করে ঝিগঝাগ পদ্ধতি অনুসরণ করে আড়াল থেকে তৎপরতা অব্যাহত রাখার জন্য ক্যাম্পের পিছনের নিরাপত্তা চৌকির দিকে চলে যায়।

পদাতিক মুজাহিদদের কয়েকজন ক্যাম্পের দিকে এবং কয়েকজন বামদিকের পোষ্টের দিকে দৌড়ে ও ক্রোলিং করে পেটের উপর শুয়ে পড়ে কনুইয়ের উপর ভর করে চলতে চলতে) ঢুকে পড়ে। পোষ্টের মধ্যে পৌঁছে কমাণ্ডার গুল মজিদের নির্দেশে আদীল, মতিউর রহমান এবং অন্যান্য মুজাহিদ দুশমনের ট্যাংকের উপর রকেটের আঘাত করে। কিন্তু ট্যাংক মোর্চার মধ্যে ছিল বিধায় রকেটের আঘাত নিস্ফল হয়।

নাসরুল্লাহ (লেংড়িয়াল) পুকুরের মধ্যে থেকে এই অবস্থা দেখতেই ইলিয়াস কাশ্মীরী, লিয়াকত কাশ্মীরী এবং খালেদ

. মাহমূদ করাচীকে ওয়ারলেস যোগে ইশারা করে। এরা তিনজন সাথে সাথে বুরুজওয়ালা কেল্লার উপর উপর্যুপরি গোলাবর্ষণ আরম্ভ করে। দেখতে দেখতে সেদিক থেকে ফায়ার বন্ধ হয়ে যায়। ওদিকে দুশমনের ট্যাংকের উপরও নিরবতা ছেয়ে যায়। পোষ্টসমূহের পিছনে - যারা লুকিয়েছিল, তারা আমাদের ট্যাংককে নিকটে দেখতে পেয়ে সেখান থেকেও পালিয়ে যায়।

এক ঘন্টাব্যাপী রক্তাক্ত এই লড়াইয়ে এ পর্যন্ত ৮ জন আফগান মুজাহিদ শহীদ হন এবং কয়েকজন আহত হন। দূরবর্তীর দক্ষিণ-পূর্বের দূর্গ থেকে তখনও গোলা ও রকেট বর্ষণ হচ্ছিল। এ অবস্থাতেই কিছু সাথী শহীদ ও আহতদেরকে শুকনা পুকুরে পৌছিয়ে দেন। কিন্তু দুশমনের ট্যাংক থেকে এবং বুরুজওয়ালা দূর্গ থেকে পুনরায় ফায়ার আরম্ভ হয়।

ক্লাস্টার বোমা
ইতিমধ্যে শহরের দিক থেকে একটি বিমান এসে ক্লাষ্টার বোমা (যার মধ্যে প্রচুর পরিমাণ গ্রেনেড, থাকে। প্রতিটি গ্রেনেড প্রায় দেড় ফুট লম্বা এবং নয়-দশ ইঞ্চি মোটা হয়) বর্ষণ করতে করতে চলে যায়।

দুশমনের চতুর্মুখী ভয়ংকর এই আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল বিজিত ক্যাম্প, পোষ্টসমূহ এবং মুজাহিদদের ট্যাংককে ধ্বংস. করা। অধিকাংশ সাথী তখন ক্যাম্পের মধ্যে গনিমতের অস্ত্র সংগ্রহ করছিলেন। সেই বিমানটি পুনরায় আসার সাথে সাথে আল্লাহর

এই সাহায্য লাভ হয় যে , বিমানটি হাওয়ায় গ্রেনেড বর্ষণ করে মাত্র উঠতে যাচ্ছিল এমন সময় সে অজ্ঞাত একটি গোলার শিকার হয়। ধোঁয়ার মেঘ ছড়াতে ছড়াতে দুশমনের এলাকায় অনেক দূর গিয়ে বিমানটি ভূপাতিত হয়। তার বর্ষণকৃত সমস্ত গ্রেনেডও ময়দানে পতিত হয়।

মতিউর রহমান (সাল্লামাহু ) বর্ণনা করেন যে , এমন সময় দুশমনের কেল্লা থেকে একটি গোলা এসে ক্যাম্পের মধ্যে বিস্ফোরিত হয়। বেশির ভাগ মুজাহিদ ক্যাম্পের পাকা মোর্চার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু ফয়সালাবাদ থেকে আগত আমাদের মুজাহিদ সাথী আবদুল আলীম মারাত্মকভাবে আহত হয়। এদিকে আমাদের ট্যাংকের স্বল্প বয়স্ক তোপচির ঘাড়ে _যে ট্যাংকের টুপি থেকে মাথা বের করে দূশমনের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করছিল - _মেশিনগানের একটি গোলা এসে আঘাত করে। সদ্য প্রস্ফুটিত এই পুষ্প বাপের চোখের সামনে এ সমস্ত শহীদদের কাফেলায় গিয়ে মিলিত হয় , যাঁরা উম্মতের ভবিষ্যত প্রজন্মকে এই সুসংবাদ শুনিয়ে যায় -

***سیلاب کی رفتار میں، موجوں کی تڑپ میں***

***ہم سینہ دریا پہ ابھرتے ہی رہیں گے***

‘প্লাবনের স্রোতধারার মাঝে ,বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের মাঝে

এবং সাগরের উপরে আমরা আমাদের বক্ষ উঁচু রাখবই ।”

১২টার কাছাকাছি দুশমনের ফায়ারের তীব্রতা কমে আসলে মুজাহিদগণ তাদের শহীদ তোপচিকে এবং নতুন আহতদেরকে সঙ্গে নিয়ে ঝোপ-ঝাঁড়ের আড়ালে চলতে আরম্ভ করে। ক্যাম্পের বাইরে দক্ষিণে ও. পশ্চিমে প্রচুর পরিমাণে মাইন বিছানো ছিল। ধোকা দেওয়ার জন্য কিছু ট্যাংক বিধ্বংসী মাইন মাটির উপরও রাখা অবস্থায় পাওয়া যায়। সেগুলোর নিচে “ববিটারপাস, লাগানো থাকে, যেন মুজাহিদরা তা উঠালে এগুলো বিস্ফোরিত হয়। কিন্তু মুজাহিদগণ তাদের প্রতারণার ফাঁদে পা না দিয়ে সতর্কতার সাথে পুকুরের নিকট গিয়ে পৌঁছেন। বিভিন্ন রকমের মেশিন গান, ছোট-বড় তোপ, রকেট লাঞ্চার এবং অসংখ্য গোলা-বারুদসহ গনিমত রূপে প্রাপ্ত সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্রও স্থানান্তর করা হয়। ওদিকে খালেদ মাহমৃদ প্রমুখের মোর্চা থেকে তীব্রভাবে দুশমনের উপর সন্ধ্যা নাগাদ গোলা বর্ষণ হতে থাকে। দুশমনের ট্যাংকও তাদের উপর গোলা বর্ষণ করতে থাকে। তাদের ওখানে আবদুস সাত্তার বাংলাদেশী আহত হয়।

নাপাম বোমা
যোহর নামাযের পর আহতদেরকে মিরান শাহ এবং শহীদদেরকে নিরাপদ স্থানসমূহে পৌঁছানোর জন্য গাড়িতে রওয়ানা করা মাত্র দুশমনের বিমান পুনরায় মাথার উপর চলে আসে এব দক্ষিণ-পশ্চিমের খালি বস্তিসমূহে মুজাহিদগণ লুকিয়ে আছে মনে করে__নাপাম বোমা বর্ষণ করতে থাকে। ফলে অনেক দূর পর্যন্ত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু

মুজাহিদদের তার ছোঁয়াও লাগেনি। এ সময় একটি স্কাড মিসাইল দুশমনের এলাকাতেই পতিত হয়ে টুকরো টুকুরো হয়ে যায়। আসর নামাযের পর বিজয়ী মুজাহিদগণ “ওয়ালিম কেল্লায়' এমন অবস্থায় ফিরে আসেন যে, খোস্ত ক্যাম্প ও তার নিকটবর্তী পোষ্টসমূহ ধবংস হওয়ার পর আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই “শেখামীর-এ যেই আক্রমণ করা হবে তাতে বড় ধরনের কোন বাধা সৃষ্টি করার মত অবস্থা আর অন্যান্য পোষ্টের ছিল না।

ঐ রাতেই (পবিত্র রমাযানের চতুর্থ রাত) খোস্ত শহরের দক্ষিণ-পূর্বে “চানার পোষ্টের উপর আক্রমণ করা হয়। এই পোষ্ট শেখামীরের অনেকটা পূর্ব দিকে অবস্থিত। এই লড়াইয়ে আফগান সংগঠনসমূহের কাঁধে কাধ মিলিয়ে আরব মুজাহিদ এবং হরকাতুল মুজাহিদীনও অংশ নেয়। পিছনে “বাড়ী” নামক এলাকার পাহাড়সমূহের তিনটি গুহা, কয়েকটি কক্ষ এবং একটি মসজিদের সমন্বয়ে হরকাতুল মুজাহিদীনের ক্যাম্প ছিল।

দারুল উলূম করাচীর তালিবে ইলম মৌলভী মুহাম্মাদ গিয়াস খান কাশ্মীরী_-যিনি শাবানের ২০ তারিখ থেকেই বিজিত শালাকা পোষ্ট্রের আশপাশে পাহারা দেওয়া, রসদপুত্র স্থানাত্তর করা, তোপ স্থাপন করা এবং মোর্চা ইত্যাদি বানানোর কাজে শরীক ছিলেন_-তিনি বলেন যে, শালাকা পোষ্ট এবং চানার পোষ্টের গাঝে আমরা যে পরিখা খনন করেছিলাম, রমাযানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাত আমরা সেই পরিখার মধ্যে অতিবাহিত করি। যে কোন মুহূর্তে আমরা অগ্রাভিযানের নির্দেশ পেতে পারি। চতুর্থ রাতে এখানে

মাওলানা জালালুদ্দীন হক্কানীর দু'টি ট্যাংক চলে আসে। তার একটি চালাচ্ছিলেন মাওলানার ভ্রাতা হাজী খলীল। তাঁরা এসে পৌঁছতেই মাওলানার গ্র্প কমাণ্ডার হাজী খান মুহাম্মাদ একটি ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে সম্মুখে চলে যান। তারা চানার পোষ্ট থেকে ৪০/৫০ মিটার দূরে গিয়ে অবস্থান নেন। সম্মুখে অসংখ্য মাইনের জাল বিছানো ছিল। এই মাইনই ছিল তাদের টাগেট।

মৃত্যুবীজ এবং বারুদী ফিতা আফগানিস্তানের মুজাহিদ এবং জনসাধারণের যে পরিমাণ প্রাণহানী এবং অঙ্গহানী এই মাইন দ্বারা হয়েছে, অন্যকিছু দ্বারা তা কমই হয়েছে। এই 'মৃত্যুবীজ প্রথম বিম্বযুদ্ধের উপহার। ইতিপূর্বে দুশমনের অম্বরোহী বাহিনীর অগ্রাভিযান প্রতিরোধের জন্য তাদের আগমনের পথে লোহার শলাকা বসানো হতো। যার চতুর্দিকে চোখা চোখা পেরেক বের হয়ে থাকত। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে তার মধ্যে পেরেকের পরিবর্তে বারুদ ভরে তার নাম দেওয়া হয় 'মাইন। বর্তমানে প্লাষ্টিক দ্বারা বিভিন্ন আকৃতির এবং বিভিন্ন সাইজের মাইন তৈরী করা হয়। সাধারণত তা এত ছোট হয় যে, সহজেই পকেটে রাখা যায়। অথচ এত শক্তিশালী ও কার্যকর যে, কারো পায়ের তলে পড়লে তাকে প্রাণ হারাতে হবে অন্যথায় পঙ্গু হতে হবেই। দুশমনের পথে এগুলো বিছানো এবং লুকিয়ে রাখা খুবই সহজ। এগুলো তৈরী করতে মাত্র তিন ডলার পরিমাণ ব্যয়

হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে এই গুপ্তঘাতকের এক বিশেষ প্রকার__যা আরো মারাত্মক ও আরো অধিক ধ্বংসাত্মক ব্যবহৃত হচ্ছে। এগুলো ট্যাংককে অকেজো বানিয়ে দেয়। একে ট্যাংক বিধবংসী মাইন, বলা হয়।

স্বল্পমূল্য, সহজে ব্যবহারযোগ্য এবং মারাত্মক ধ্বংসাত্মক হওয়ার কারণে পশ্চিমা শক্তিসমূহ মিসর, এ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতি স্থানে, আর এখন সর্বচে, বেশী আফগানিস্তানে এগুলো নিদ্বিধায় ব্যবহার করে চলছে। আমেরিকার ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট জুলাই ১৯৯৩ ঈসায়ীতে “গুপ্তঘাতক' নামে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ লোক এই মাইনের শিকার হয়। আফগানিস্তানের দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বিছানো মাইনের সংখ্যা ছয় কোটি। যেগুলো সাধারণ পন্থায় পরিষ্কার করা হলে “হেলালে 'আহমার' এর রিপোর্ট অনুযায়ী চার হাজার তিন শ' বছর সময় লাগবে।

26

এই 'মৃত্যুবীজ' থেকে পথ পরিষ্কার করার জন্য মুজাহিদগণ যত রকম পন্থা বুঝতে পেরেছেন-__সর্বগুলো ব্যবহার করেছেন। অনেক মুজাহিদ মাইন পরিষ্কার করতে গিয়ে তারই বিস্ফোরণের শিকার হয়েছেন।

সম্ভবত আজই প্রথমবার এগুলো ধ্বংস করার জন্য মুজাহিদগণ বারুদের ফিতা ব্যবহার করছিলেন। এই ফিতাগুলো একবার ব্যবহার হয়ে

26 দৈনিক জং, করাচী, ৫ই জানুয়ারী, ১৯৯৪ ঈসায়ী (মিডউইক (সাপ্তাহিক) ম্যাগাজিন, পৃঃ ৪-৫)

শেষ হয়ে যায়। এভাবে ফিতার দৈর্ঘ্যের পরিমাণ এবং এক ফুট চওড়া পথ গুপ্তঘাতক থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়। হাজী খান মুহাম্মাদ এই ফিতা সম্মুখে নিক্ষেপ করে তাঁর হস্তস্থিত প্রান্তে ব্যাটারীর মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগ করেন? ফলে ফিতা যেটে গিয়ে পথ মাইনমুক্ত হয়ে যায়। সেখান দিয়ে জানবাজরা একজন একজন করে লাইন ধরে সতর্কভাবে রাস্তা অতিক্রম করতে থাকেন।

সাহরীর সময় চারটি মোর্চা থেকেই চানার পোষ্টের, উপর একঘন্টা পর্যস্ত অবিরাম গোলা বর্ষণ করা হয়। ফজর নামাযের পর অনতিবিলম্বে ১৭০ জন মুজাহিদ তিন দিক থেকে সম্মুখে অগ্রসর হন। একটি ট্যাংক ডানদিক থেকে আর অপরটি সামনের দিক থেকে গোলা বর্ষণ'করতে করতে সম্মুখে অগ্রসর হয়। যে সমস্ত মাইন ট্যাংক বিধবংসী নয়, সেগুলো ট্যাংকের চেইনের নিচে পড়ে অকেজো হতে থাকে, ফলে ট্যাংকের পিছনের লোকদের জন্য পথ পরিষ্কার হতে থাকে। পদাতিক মুজাহিদগণ দুই সারি করে প্রত্যেক ট্যাংকের চেইনের চিহ্ন ধরে তাকবীর - ধ্বনি দিতে দিতে. এবং ফায়ার করতে করতে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকেন। পঞ্চম একটি সারি নীরবে বামদিকের সেই পথ ধরে অগ্রসর হতে থাকে, যেটি হাজী খান মুহাম্মাদ রাতে পরিষ্কার করেছিলেন।

দুশমন চানার পোষ্ট ও তার ডান_বামের মোর্চাসমূহ থেকে সর্বধরনের অস্ত্রের মুখ খুলে দেয়। আক্রমণকারী মুজাহিদদের ডানদিকে বেশ দুরে এবং কিছুটা পিছন দিকে দুশমনের একটি ট্যাংক “গিরগিরে মোর্চার

মধ্যে লুকিয়েছিল। সেই ট্যাংকও গোলাবর্ষণ আরম্ভ করে। এই ট্যাংকের পিছনে লুকানো ২৫জন জানবাজ মুজাহিদ এই মুহূর্তের অপেক্ষাতেই ছিলেন। তাঁরা বজ্রের ন্যায় ট্যাংকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। ট্যাংকের সৈন্যদের উপর এমন অকস্মাৎ এই আক্রমণ হয় যে, তারা সাহস হারিয়ে ফেলে। তাদের তিনজনকে বন্দী করা হয় এবং অন্যরা সেখানেই ট্যাংক ফেলে পালিয়ে যায়। কয়েক মুহূর্তের এই তৎপরতায় চানার পোষ্ট তার বড় একটি অবলম্বনকে হাতছাড়া করে।

ওদিকে মুজাহিদদের একটি ট্যাংক, যার পিছনের বাইরের অংশে এক আফগান জানবাজ "মোল্লা কান্দাহারী, বসে ফায়ার করছিলেন এবং পিছনে পিছনে আগমনকারী পদাতিক মুজাহিদদের পথনির্দেশও করছিলেন__পোষ্ট্রের নিকট পৌঁছতেই হঠাৎ এক বিস্ফোরণে তার চেইন টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। ট্যাংক বিধ্বংসী মাইন দুশমনের রকেটের জন্য এই ট্যাংককে স্থির ও সহজ লক্ষ্যস্থল বানিয়ে দেয়। তার আহত হন। আর মোল্লা কান্দাহারী দুইজন সাথীসহ শহীদদের পবিত্র কাফেলায় গিয়ে যুক্ত হন। কিন্তু —

***موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی***

***ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی***

“নির্বোধরা মৃত্যুকে জীবনের -সমাপ্তি মনে করে। অথচ মৃত্যু মূলত ইহকালীন

জীবনের সাঁঝ এবং চিরকালীন জীবনের প্রভাত।”

চানার পোষ্ট বিজয়
কিন্তু ইতিমধ্যে হাজী খলীলের ট্যাংক অগ্নি বর্ষণ করতে করতে পোষ্টের নিকট চলে এসেছিল। পদাতিক মুজাহিদগণ তার আড়াল থেকে বের হয়ে ক্ষুধার্ত সিংহের ন্যায় পোষ্টের মধ্যে ঢুকে পড়ে। ডান_বামের মুজাহিদগণও একযোগে হল্লা করে তাকবীর ধ্বনি দিতে দিতে এবং ক্লাসিনকোভের ব্রাষ্ট করতে করতে বাঁপিয়ে পড়ে। এই ত্রিমূখী তীব্র আক্রমণে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দুশমন পালিয়ে যায়। মুজাহিদগণ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। নদীর তীরে একটি গ্রামের নিকট তাদের দু’টি ট্যাংক দাঁড়ানো ছিল। সৈন্যরা নদী পার হওয়ার পূর্বে একটিতে নিজেরা আগুন লাগিয়ে দেয়, যেন মুজাহিদরা তা ব্যবহার করতে না পারে। দ্বিতীয়টি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু নদীর কাদার মধ্যে আটকে যায়। গ্রামের অধিবাসীরা বাড়ীঘর খোলা ফেলে রেখে এবং যাবতীয় সামানা__যার মধ্যে সর্বধরনের পানাহার সামশ্রীও ছিল__যেমন ছিল তেমনি ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। পাশেই বিধ্বস্ত একটি বিমান খেতের মধ্যে বিক্ষিপ্তাকারে পড়েছিল।

পরের দিন রাতে ডানদিকের 'মকতব পোরষ্ট'ও বিজিত হয়। বাধ্য হয়ে দুশমন বামদিকের মোর্চাসমূহও বিনা যুদ্ধে খালি করে দেয়, কিন্ত ঐ সমস্ত মোর্চার দিকে অগ্রাভিযানের সময় তিনজন দুর্নিবার তরুণ মাইনের আঘাতে শহীদ হন।

মোটকথা, রমাযানের পাঁচ তারিখের মধ্যে নদীর দক্ষিণ-পূর্ব তীরের বেশ দীর্ঘ এই এলাকা দুশমন-মুক্ত হয়ে যায়। বিমান বন্দর এখান থেকে নদীর ওপারে উত্তর-পূর্বে তিন কিলোমিটারের মত দূরে ছিল। সম্মুখে নদীর ওপারে উত্তর দিকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে খোস্তের সর্ববৃহৎ সেনাঘাঁটি “তখতাবেগ কেল্লা”। সেখান থেকে শহর আরম্ভ হয়। শহরের পিছনে রেডিও স্টেশনের নিকটে একটি পাহাড়ের উপর ছিল “মতন কেল্লা”। এই কেল্লা দুর্টি__যা খোস্তের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সেনাঘাটি__ অঝোরে অগ্নিবর্ষণ করতে থাকে। বিমানবন্দরের তোপসমূহও আসমান মাথায় তুলে নেয়। হাজী খলীল তার ট্যাংকটি নদীর তীরে মোর্চার মধ্যে সংরক্ষণ করে সেগুলোকে টার্গেট বানাতে আরম্ভ করেন।

দুশমন ১লা রমাযান থেকেই খুব জোরেশোরে বিমানযোগে বোমা বর্ষণ আরম্ভ করেছিল। তবে বিমানগুলো মিসাইলের ভয়ে নিচে না এসে অনেক উঁচু থেকেই বোমা বর্ষণ করে চলে যেত। টার্গেটের সাথে তার কোন সম্পর্ক ছিল না। ভাগ্যের মাইরে কোন বিমান নিচে এলেও তাকে কিছু না নিয়ে বরং দিয়ে যেতে হতো।

আসমানী রসদ
৭ বা ৮ই রমাধান আল্লাহ তাআলার নৃসরাতের এই বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে যে, হাজী খলীলের 'নিকট ট্যাংকের গোলা প্রায় শেষ হয়ে আসে। মৌলভী গিয়াস কাশ্মীরী_যিনি সে সময় ওয়ারলেসের ডিউটিতে ছিলেন__বলেন যে, হাজী

সাহেব ওয়ারলেস যোগে মাওলানা হককানীর নিকট ট্যাংকের গোলা চেয়ে পাঠান। তিনি সেখান থেকে সন্তোষজনক কোন উত্তর আসার অপেক্ষা করছিলেন এমন সময় দুশমনের দটি ট্রান্সপোর্ট বিমান অনেক উঁচু থেকে প্রায় ২২টি প্যারাসুট নিচে নিক্ষেপ করে। খোস্তের জন্য নিক্ষেপিত এই রসদ বড় বড় সিন্দুকের মধ্যে ভরা ছিল। তার কিছু প্যারাসুট নদীর মধ্যে আর অবশিষ্ট সর্বগুলো সেই গ্রামে এবং তার আশেপাশে পতিত হয়।

তখন ছিল সকালবেলা । আমরা দৌড়ে গিয়ে বাক্স খুলে তার মধ্যে খাদ্যসামগ্রী এবং বিভিন্ন প্রকার অস্ত্র পাই। বেশীর ভাগ বাক্সে ট্যাংকের গোলা ভরা ছিল। প্রত্যেক বাক্সে নয়টি করে গোলার প্লাষ্টিক প্যাকেট ভরা ছিল। তারপর কয়েকদিন পর্যন্ত কয়েকবার করে এই একইভাবে আসমানী রসদ আসতে থাকে। এতো অধিক পরিমাণ গোল। হাজী খলীল নিজেও প্রার্থনা করেননি।

বিমান বন্দরের পূর্বের কোচীদের এলাকা এবং ফারান বাগের দিক থেকে যেখানে মুজাহিদগণ রমাযানের পূর্বেই নদী অতিক্রম করে ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করেছিলেন__পহেলা রমাযান থেকে তাদের তোপ বিমানবন্দর এবং শহরের সেনা-ক্যাম্পগুলোকে নিশানা বানাচ্ছিল। তাদের জানবাজ বাহিনী সম্মুখে অগ্রসর হয়ে পথের মাঝের পোষ্ট ও মোর্চাসমূহ সাফ করার এবং পিছন দিক থেকে নিজেদের রসদ ও সেনাদেরকে সুসংহত করার কাজে লিপ্ত ছিলেন।

ফারান বাগের দিক থেকে
ইবরাহীম কাশ্মীরী__যার পরিবারের লোকেরা করাচীতে থাকেন-_-একজন দক্ষ গাড়িচালক। রমাযানের ২ দিন পূর্বে তিনি সেই সময় 'বাড়ী'র ক্যাম্পে পৌঁছেন, যেদিন ফারানবাগ কসবা বিজিত হয়। এ সময় থেকেই তার দায়িত্বে মুক্জাহিদ এবং সামানাসমূহ ফারানবাগ এবং চানার পোষ্টের রণাঙ্গনে আনা নেওয়ার কাজ দেওয়া হয়।

তিনি বলেন যে, বিজিত ময়দান এলাকায় তখনও জায়গায় জায়গায় অসংখ্য মাইন লুকিয়ে ছিল। আর নিত্যদিন বিস্ফোরিত হচ্ছিল। মুজাহিদগ্ণ সেগুলো খুঁজে খুঁজে গাড়ি চালিয়ে এবং অনেক সময় জান কুরবানী করে__যেই পথ বানিয়েছিলেন, আমরা সেই পথের উপর দিয়েই গাড়ি চালাতাম। সেই পথে গাড়ি চালাতে আমাদের কয়েকটি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হতো। একটি এই যে, পথ অতিক্রমকারী গাড়ির চাকার দ্বারা কাঁচা মাটিতে যে দু'টি নালার মত সৃষ্টি হয়েছিল আমাদের গাড়ির চাকাও সেই ন।লার মধ্যে দিয়েই যেতে হবে। কারণ, শুধুমাত্র এ নালাগুলোই মাইনমুক্ত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত ছিল। দুই চার ইঞ্চি এদিক সেদিক হলে মাইন বিস্ফোরিত হয়ে আমাদের প্রাণ হারানোর সমূহ সম্ভাবনা ছিল। দ্বিতীয় এই যে, মুজাহিদদের গাড়িগুলো জিগজাগ পদ্ধতিতে এই পথ বানিয়েছিল। ফ্নে দুশমনের ওৎ পেতে থাকা দূরপাল্লার তোপ এবং বিমান সেগুলোকে সহজে টার্গেট বানাতে না পারে। তৃতীয় এই যে, আমরা অতি দ্রুত গাড়ি চালাতাম, ফলে প্রচুর ধূলা উঠে আচ্ছন্ন হয়ে যেত এবং

গাড়ি ধূলার আড়াল হয়ে যেত। দুশমন ধুলা লক্ষ্য করে গুলি নিক্ষেপ করলে গাড়ি তার অনেক সম্মুখে চলে যেত। দুশমনের চোখ এড়িয়ে চলার এই খেলা রাতদিন চলত। রাতের বেলায় এই পুলসিরাতের উপর দিয়ে গাড়ির সর্ব বাতি বন্ধ করে দৌড় লাগাতে হতো।

একবার আমার গাড়ীর পানি শেষ হয়ে যায়। তখন ছিল দিনের বেলা। বাধ্য হয়ে একটি পুকুরের নিকট থামতে হয়। আমি বোন্ট খুলে নিকটেই পড়ে থাকা ব্যবহৃত একটি গোলার খোলে পানি ভরে টাংকিতে ঢালছিলাম এমন সময় ট্যাংকের একটি গোলা শো শো করে আমার এত নিকট দিয়ে চলে যায় যে, সেকেণ্ডের মধ্যে আমাকে অনেক কিছু শিক্ষা দিয়ে যায়।

একবার দুশমনের বিমান এমন হঠাৎ করে মাথার উপর চলে আসে যে, গাড়ি দাড় করে কোন আশ্রয়স্থলের দিকে পালিয়ে যাওয়ার কথা কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না। অস্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে এই বিশ্বাস নিয়ে কালিমা পাঠ করতে করতে গাড়ি চালাতে থাকি। বিমানটি একেবারে মাথার উপর চলে এসে ২টি বোমা নিক্ষেপ কবে। তা লক্ষ্যভুষ্ট হয়। আল্লাহর আরো মেহেরবানী যে, তার নিকট আর কোন বোমা অবশিষ্ট ছিল না।

দারুল উলুম করাচীর উঠতি বয়সের তালিবে ইলম হাফেয মুহাম্মাদ সাজ্জাদ। বাড়ী রহিম ইয়ার খান জেলায়। রমাযানের ৬ তারিখ পর্যস্ত নামাযে ইমামতী করে। সে বলে যে, সংগঠনের আমীর মাওলানা ফযলুর রহমান খলীলের নির্দেশে রমাযানের সাত তারিখে আমরা দশ জন সাথী ফারানবাগের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। মৌলভী মুহাম্মাদ ইবরাহীম আমাদেরকে নদীর

নিকটে গাড়ী থেকে নামিয়ে দিয়ে ফারানবাগ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী মুজাহিদদের অপেক্ষায় দেরী করেন। শীতকাল ছিল বলে নদীর পানি নাভীর একটু উপরে ছিল। কিন্তু তা রক্ত জমিয়ে ফেলার মত ঠাণ্ডা ছিল! আর স্রোভ এত তীব্র ছিল যে, মাটিতে পা ধরানো যেত না। অতি কষ্টে আমরা পূর্ণশক্তি খাঁটিয়ে একে অপরের হাত ধরে আস্তে আস্তে অগ্রসর হচ্ছিলাম। এমন সময় “মাতুন কেল্লা” থেকে দুশমনের গোলা আসতে আরম্ভ করে। ধারালো তুষারধারার সামনে দেহের শক্তি ও তাপ বারবার নিস্তেজ হয়ে আসছিল, আর গোলা আমাদেরকে মৃত্যুর পয়গাম শোনাচ্ছিল।

“আল্লাহ” “আল্লাহ, করে এই বিপদ পার হলাম। আমরা ফারানবাগ নামক সবুজ-শ্যামল গ্রামে গিয়ে পৌছলাম। এখানকার বাড়ীঘর ছিল পাকা। হরকাতুল মুজাহিদীনের পক্ষ থেকে এখানে আমাদের আমীর ছিলেন ডেরা ইসমাইল খানের তরুণ মুহাম্মাদ আকরাম সাহেব। আমরা পৌঁছতেই তিনি এখানকার দশজন মুজাহিদকে বাড়ীর ক্যাম্পে ফেরত পাঠান। যেন সেখানে গিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করে তাঁরা নতুন উদ্যম নিয়ে ফিরে আসতে পারেন।

এখানে মুজাহিদদের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। কিছু আফগান ও আরব মুজাহিদ ছিলেন, আর কিছু ছিলেন হরকাতুল মুজাহিদীনের সাথী। বহু সংখ্যক মুজাহিদ আরো সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বিমানবন্দরের একেবারে নিকটে চলে গেছেন। সেখানে তারা জায়গায় জায়গায় মোচা ইত্যাদি বানিয়ে তৎপরতা আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। নতুন নতুন মোর্চা তৈরী করা

এবং তোপ ইত্যাদি বসানোর জন্য বিভিন্ন প্রকারের সামানা ফারানবাগের পথে অনবরত সম্মুখে পাঠানো হচ্ছিল। এ সকল মালামাল আনা নেওয়ার জন্য মুজাহিদগণ দুশমন থেকে ছিনিয়ে আনা দৈত্যাকৃতির হিনো ট্রাক ব্যবহার করছিলেন। ট্রাক এমন জায়গা দিয়ে নদী অতিক্রম করত, যেখানে নদীর প্রস্থ ও গভীরতা কম ছিল।

কিছুদিন পূর্ব পর্যস্ত তা ফারানবাগে পানাহার সামগ্রী আসত “বাড়ী"্র ক্যাম্প থেকে। পরে সম্মুখের একটি গ্রাম দুশমনরা খালি করে দিয়ে চলে গেলে মুজাহিদদের ছোট ছোট দল এ সমস্ত সামানা প্রয়োজন মত সেখান থেকে নিয়ে আসতে থাকে।

আমি এখানে দুপুরে এসে পৌছি। সেদিনই বিকালে আকরাম সাহেব আমাদের পাঁচজন সাথীকে ইলিয়াস সাহেবের নেতৃত্বে এ গ্রামে পাঠান। আমরা চুপে চুপে খোলা ময়দান এবং একটি হেলিপ্যাডের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে এঁ গ্রামে গিয়ে পৌছি। গ্রামের সর্ব কয়টি বাড়ী খোলা পড়েছিল। সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ গেরস্থালী ও পানাহার সাম্রী ছিল। মুরগী ও গৃহপালিত পশু এদিক ওদিক ঘোরাযেরা করছিল। কবরস্থানের মত নীরব নিস্তন্বের মধ্যে আমরা জলদি জলদি প্রয়োজনীয় সামগ্রী একত্রিত করি। কয়েকটি গাধাও ঘোরাযেরা করছিল। একটি গাধার উপর সামানা চাপিয়ে দিয়ে সম্ভব মত নিজেরাও সামানা তুলে নিয়ে ফিরে গ্রামের শেষ প্রান্তে এসে যখন পৌছি, তখন মাগরিবের সময় ঘনিয়ে আসছিল। এ সময় দূশমনের উত্তরদিকের মোর্চাগুলো থেকে ফায়ারিং

শুরু হয়ে গিয়েছিল। ময়দানের মধ্য দিয়ে বড় বড় আলোর গোলা অতিক্রম করছিল ) আমাদেরকে এই ময়দান অতিক্রম করে যেতে হবে। ইলিয়াস সাহেব বললেন যে , রাতের এই সতর্কতামূলক ফায়ারিং দুশমনের নিয়মিত ব্যাপার।

আমরা একজন একজন করে কখনো বসে, কখনো শুয়ে আর কখনো দৌড়িয়ে ময়দান অতিক্রম করতে থাকি। আমি চিনির ছোট একটি বস্তা কাঁধে তুলে নিয়ে আসছিলাম। শো শো আওয়াজে একটি গুলি আমার এত নিকট দিয়ে অতিক্রম করে যে, ভয়ে আমি মাটিতে পড়ে যাই। জিহাদে আমি এবারই প্রথম এসেছি। “আল্লাহ ” “আল্লাহ করে ময়দান শেষ হলে আমি ভাঙ্গাচুরা একটি বিরান ঘরের আড়ালে বসে রোযা ইফতার করি। অন্য সাথীরাও নিরাপদে এসে পৌঁছেন।

দুশমনের বিমান প্রতি রাতেই বোমা বর্ষণ করতে থাকে। তাদের তোপও আকাশ মাথায় তুলে নেয়। একদিন একটি স্কাড মিসাইলও পার্শ্ববতী ময়দানে পড়ে টুকরা টুকরা হয়ে যায়। তবে এতদিনে আমি এগুলোতে অভ্যস্ত হয়ে যাই। বরং এর মধ্যে এক প্রকারের স্বাদ অনুভব করতাম।

***اگر چہ عشق میں آفت بھی ہے، بلا بھی ہے***

***مگر برا نہیں یہ درد کچھ ، بھلا بھی ہے***

“প্রেমের পথে বিপদও আছে এবং ঝুঁকিও আছে ।

কিন্তু প্রেমপথের বেদনা বড় স্বাদের !

বড় কল্যাণের !”

আরো কিছু সফলতা রমাযানের পাঁচ তারিখের কাছাকাছি সময়ে খোস্ত শহরের উত্তর-পশ্চিমের “কিকা যিয়ারতবাবা” নামে প্রসিদ্ধ পাহাড় চূড়াটি বিজিত হয়। মুজাহিদদের উত্তরাঞ্চলীয় জোট তার.উপর আক্রমণ করেছিল। উত্তর-পশ্চিম এই চূড়ার গুরুত্ব ছিল অনেকটা দক্ষিণ-পূর্বের তোরগোড়ার ন্যায়। এখানে দুশমনের একটি হেলিকপ্টারও শিকার করা হয়। এখন সেখানকার মুজাহিদগণ ময়দান এলাকার অবশিষ্ট পোষ্টসমূহ দ্রুত শত্রুমুক্ত করছিলেন। সেখান থেকে শহরের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে নদী প্রতিবন্ধক ছিল না।

৬ বা ৭ই রমাযানে 'শেখামীরের, তিনদিক থেকে চূড়ান্ত আক্রমণ করা হয়। সেখানে দুশমনের কেল্লা, পোষ্ট, পাকা মোর্চা, পরিখা এবং সামরিক সাজ-সরঞ্জাম ছিল প্রচুর পরিমান। প্রধান দুর্গ ছিল একটি টিলার উপর। দুশমন অবিচল থেকে আক্রমণের মোকাবেলা করে। দুশমনের বিমান বাহিনী এবং খোস্ত শহরের দূর্গ ও বিমানবন্দরের দূরপাল্লার তোপসমূহও প্রলয় সৃষ্টি করে। কিন্তু যে সমস্ত গাজী মুজাহিদ বিজয় বা শাহাদাতের সংকল্প নিয়ে আল্লাহর পথে অবতরণ করেছেন, তাঁরা আহত ও শহীদদের পরওয়া না করে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকেন। তীদের তোপ এবং ট্যাৎক দুটিও দুশমনের কলিজা ছিন্ন করতে কোনরপ ত্রুটি করেনি। তবুও শেষ পর্যায়ে ট্যাংক দুটিকে ধবংসের শিকার হতে হয়।.

নূরুল আমীন-__-যিনি “ওয়ালিম কেল্লায়' ছিলেন__-বলেন যে, আমরা অনেক দূর থেকে

শেখামীরের লড়াই দেখছিলাম। আমরা কায়মনে দুআ করছিলাম। যোহরের সময় ভয়ংকর বিস্ফোরণ ও ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে আমরা দুশমনের দু ’টি ট্যাংককে জ্বলতে দেখতে পাই। ট্যাংকে রক্ষিত গোলাসমূহ উড়ে উড়ে দক্ষিণের পাহাড়ের সঙ্গে নিজেদের মস্তক চূর্ণ করছিল। তিনটার দিকে দুশমনের দু 'টি বিমান অকস্মাৎ আমাদের মাথার আরো বেশী বেশী কেঁদে কেঁদে দুআ করতে থাকি। একটি বিমান তো বোমা নিক্ষেপ করে চলে যায়। আর দ্বিতীয়টিকে শিকার করা হয়। কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে বিস্ফোরণের পরিমাণ কম হতে থাকে। তারপর ওয়ারলেস মারফত সংবাদ পাই যে , দুশমন পালাচ্ছে। তাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হচ্ছে।

“এই বিজয়ের মাধ্যমে আটটি অক্ষত ট্যাংক সহ অগণিত অস্ত্র এবং অসংখ্য সাজ -সরঞ্জাম মুজাহিদদের হাতে আসে। সর্বচে ” বড় কথা হলো-_এখন শামিল নদীর দক্ষিণ তাঁর পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সম্পূর্ণটা দুশমন থেকে মুক্ত হয়েছে। (একমাত্র কারড়ি পোষ্ট ছাড়া। অবশ্য তার উপরও খণ্ড আক্রমণ চলছিল) খোস্ত শহরের উপর আক্রমণ করার জন্য এখন শুধুমাত্র নদী অতিক্রম করা বাকী থেকে যায়। মুজাহিদদেরকে অনেক শহীদ এবং আহতের মাধ্যমে শেখ আমীরের মূল্য পরিশোধ করতে হয়।

***موت کی لیکن، دل دانا کو کچھ پروا نہیں***
***شب کی خاموشی میں جز ہنگامہ پردا نہیں***

“জ্ঞানীর হৃদয় মৃত্যুকে কিছুমাত্র
পরওয়া করে না ”

রাতের নীরবতায় দিবসের চাঞ্চল্যই তো লুকিয়ে থাকে 7

নদীর ওপারে ডেত্তর তীরে ) কিছুদূর পরপর দুশমনের অনেকগুলো প্রতিরক্ষা পোষ্ট ছিল। সেগুলির মস্তক চূর্ণ করার জন্য মুজাহিদদের নিবেদিতপ্রাণ বাহিনী নদীর দক্ষিণ তীরে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত এবং সেখানকার বস্তিসমূহের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের উপর্পরি গোলা বর্ষণ দুশমনকে নতুন পোষ্ট এবং মোর্চা বানানো থেকে বিরত রাখে এবং তাদের অনেক ক্ষতিসাধন করে। এখন মুজাহিদগণ এমন স্থানের সন্ধানে ছিলেন , যেখান দিয়ে নদী অতিক্রম করা তৃলনামূলক সহজ হয় এবং রণকৌশলের দিক থেকেও অধিক উপযুক্ত হয়।

## বিধুর একটি দুর্ঘটনা

হরকাতুল জিহাদের যে সমস্ত জানবাজ মুজাহিদ কমাণ্ডার নাসরুল্লাহ লেংড়িয়ালের নেতৃত্বে শেখ আমীরের নিকটবর্তী নদীর তাঁর সংলগ্ন একটি বেশ কয়েকজন আফগান ও আরব মুজাহিদকে সঙ্গে নিয়ে সেখান দিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে নদী পার হওয়ার এবং অপর পাড়ের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার উদ্দেশ্যে বের হন। সবেমাত্র নদী অতিক্রম করার জন্য উপযুক্ত স্থান তালাশ করা হচ্ছে , এমন সময় ৮জন আরব মুজাহিদ -_যারা পাহাড়ী নদীর স্বেচ্ছাচারিতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না -_নদীতে নেমে পড়েন। সাথীরা বুঝে উঠতে

উঠতে নদীর ওদ্ধত্যপূর্ণ স্রোত তাঁদেরকে গ্রাস করে ফেলে। যাবতীয় উদ্ধার প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

এমন অপ্রত্যাশিতভাবে ৮ জন মুজাহিদ নদীর প্রবাহে অপহৃত হওয়ায় রাতের বাকি অংশ নদী অতিক্রম করবে কি করবে না এই দ্বিধা-দ্বন্দেই অতিবাহিত হয়ে যায়। সাহরীর সময় দুশমনের ফায়ার আসমান মাথায় তুলে নেয়। ফজর নামাযের পর অতি কষ্টে তাঁরা প্রত্যাবর্তন করেন।

বিপদসংকুল কিন্তু অবশ্যম্ভাবী চানার পোষ্টের সম্মুখে নদীর উত্তর তাঁর সংলগ্ন দুশমনের কয়েকটি কেল্লা, ট্যাংক বাহিনী এবং তার পশ্চাতে উত্তরেই দুশমনের অধিকতর মজবুত “তখতা বেগ" কেল্লা রয়েছে। এ দুর্গ পদানত না করা পর্যস্ত এদিক থেকেও নদী অতিক্রম করা সম্ভবপর ছিল না। এ সমস্ত প্রতিবন্ধককে নিঃশেষ করার জন্য একটি পর্যায় ক্রমিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হয়। যা ছিল একদিকে ঝুঁকিপূর্ণ অপরদিকে অবশ্যন্তাবী। তবে সেজন্য দুশমনের একটি দুর্বল দিক খুঁজে বের করা হয়।

হরকাতুল মুজাহিদীনের কেন্দ্রীয় কমাণ্ডার মৌলভী শাববীর আহমদ চানার পোষ্টের নিকটবর্তী গ্রাম থেকে প্রায় ১৫ জন মুজাহিদকে সঙ্গে করে নদীর তাঁর ধরে পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে বিমানবন্দরের দক্ষিণে চলে যান। সেদিন ছিল রমাযানের

১৩তম রাত। এখানে নদীর ওপারে সামনেই দুশমনের একটি গ্রাম ছিল। তার কিছু দূর পর থেকে বিমানবন্দরের সীমানা আরম্ভ হয়েছে। সেখানে বিমান বন্দরেরই দূরবর্তী একটি ভবনও ছিল। খোস্ত শহর এখান থেকে অনেকটা উত্তর-পশ্চিমে। পূর্ব দিক থেকে ফারানবাগের মুজাহিদগণ আগে থেকেই বিমানবন্দরের উপর 'উপধু্পরি আক্রমণ করে আসছিলেন। কোচীদের (বেদুঈন) এলাকা এবং উত্তর দিক থেকেও শহরের উপর আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। দুশমনসেনারা তাদের সাথে ঘোর মুকাবিলায় লিপ্ত ছিল। এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে মাগুলানা শাববীর,আহমাদ এখান দিয়ে নদী অতিক্রম করে সম্মুখস্থ গ্রাম দখল করবেন, এই ছিল তাঁর পরিকল্পনা। তাঁর সকল সাথী ছিলেন সাঁতারু।
.

অর্ধ রাত্রির কাছাকাছি তাঁদের পিছন (দক্ষিণ) দিক থেকে মুজাহিদদের তোপ সেই বসতির উপর অকন্মাৎ তীব্র গোলা বর্ষণ আরম্ভ করে। কয়েক ঘন্টা গোলা বর্ষণের পর যখন অনুমিত হয় যে, দুশমন গ্রাম খালি করে দিয়ে চলে গেছে, তখন শেষ রাতে এই জানবাজ মুজাহিদগণ তোপের ফায়ারের আড়ালে অত্যন্ত নীরবে নদী অতিক্রম করেন। গ্রাম খালি পড়েছিল। কোনরূপ বাধা ও প্রতিদ্বন্দিতা ছাড়া গ্রাম মুজাহিদদের দখলে চলে আসে। বিমানবন্দরের দূরবর্তী ভবন ও মোর্চাসমূহের দিকে পশ্চাদপসারণকারী দুশমন গ্রামে উপনীত এ সমস্ত মুজাহিদ সম্পর্কে ছিল বেখবর। মুজাহিদদের নিরাপত্তা বিধান এবং গ্রামের উপর তাদের

দখল ' বহাল রাখার জন্য পিছন দক্ষিণ দিক থেকে মুজাহিদদের তোপ দুশমনের ভবন এবং মোর্চাসমূহকে লক্ষ্য করে অবিরাম গোলা ছুড়ছিল।

১৬ জন মুজাহিদের এই বাহিনী ফায়ারের আড়ালে সারাদিন নিজেদের পজিশন সুদৃঢ় করার কাজে ব্যস্ত থাকেন। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর মুজাহিদদের জন্য দুশমন কবলিত এলাকায় অতিবাহিত করা এদিনটি ছিল কঠিন পরীক্ষার দিন। কিন্তু দুশমনের বিধবস্ত মনোবল কঠিন এ কাজটিকে সহজ করে দেয়। এঁদের মধ্যে ১১ জন মুজাহিদ ছিলেন আফগান তালিবে ইলম। তাঁরা ছিলেন মাওলানা জালালুদ্দীন হককানীর সংগঠনের সদস্য। বিস্তারিত পরিকল্পনা তাদেরও জানা ছিল না। তবে এই দায়িত্ববোধ তাঁদের সাহসকে দু 'ধারী করার জন্য যথেষ্ট ছিল যে , তাঁদেরকে যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে , তা খোস্ত নগরীর বিজয়ে মৌলিক গুরুত্ব বহন করে। তাঁদের সামান্য অসতর্কতা সম্পূর্ণ পরিকল্পনাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করতে পারে। প্রত্যেক মুজাহিদের অন্তর এই সতর্ক ধ্বনি শুনতে পাচ্ছিল —

***"آباد س ے اک تاز ہ ج ہاں تر ے ہنر میں"۔***

‘তোমার কর্মকুশলতার মধ্যে এক নতুন জগত লুকিয়ে আছে ।’

## ধাবমান ধুম্ররেখা

আজ (১৩ই রমাযান ) সকালবেলা হরকাতুল মুজাহিদীনের প্রবীণ স্বেচ্ছাসেবী মৌলভী

সুহাইল আহমাদ(

27)এই বাহিনীর কুশলবার্তা
জানার জন্য মাওলানা জালালুদ্দীন হক্কানীর গ্রুপ কমাণ্ডার হাজী খান মুহাম্মাদের নিকট গমন করেন। হাজী খান মুহাম্মাদ তখন নদীর দক্ষিণ তীরের নিকটবর্তী একটি বাড়ীতে ওয়ারলেস যোগে বিভিন্ন রণক্ষেত্রের সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন।

মৌলভী সুহাইল আহমাদ বলেন যে, আমি এবং অন্য একজন মুজাহিদ এ বাড়ীর ছাদে আরোহণ করে দুশমনের এলাকা দেখছিলাম। দূরবীণ দ্বারা শহর এবং মাতৃন কেল্লা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। শহরের পূর্ব দিকে অবস্থিত নতুন বিমানবন্দরের উপর এদিককার মুজাহিদগণ তীব্র আক্রমণ করেন। বিকট বিস্ফোরণ এবং তীব্র ফায়ারিংয়ের শব্দ প্রচণ্ড আক্রমণের সংবাদ বহন করছিল। হঠাৎ মাতুন কেল্লা থেকে একটি গুলি ও রকেট বর্ষণ আরম্ভ করে। ফায়ারিংয়ের অগ্নিশিখা এবং ধুম্ররেখা আমরা দূরবীণ ছাড়াই দেখতে পাচ্ছিলাম। সাথে সাথে মুজাহিদদের হৈচৈ এবং ফায়ার এমনভাবে নিস্তব্ধ হয়ে যায়, যেমন কিনা ফুটন্ত দুধের উপর পানি ঢেলে দেওয়া হয়েছে। হেলিকপ্টারটিও ফিরে গিয়ে মাতুন কেল্লায় অবতরণ করে।

27 এদিক থেকে পরিচালিত অপারেশনসমূহের যাবতীয় বিবরণ আমি তাঁর থেকেই বিভিন্ন বৈঠকে জেনে নিয়ে লিপিবদ্ধ করি। সে এখন দারুল উলৃম করাচীর “তাখাসসুস ফিল ইফতা" বিভাগের ছাত্র। __রফী' উসমানী।

কিছুক্ষণ পর মুজাহিদগণ পুনরায় ঝড় _ঝঞ্চার বেগে আক্রমণ আরম্ভ করেন। পূর্বের সেই হেলিবপ্টারই পুনরায় সেখানে পৌছলে পিছন দিক থেকে রকেটের ২টি অগ্নিশিখা তার দিকে ধেয়ে যায়। হেলিকপ্টারটি রকেট দু’টি থেকে আত্মরক্ষা করে পিছন দিক পড় নিতেই সম্মুখের পাহাডুসারি থেকে একটি ধুঘ্ররেখা দ্রত্ত তার দিকে ধেয়ে যেতে দেখা যায়। হেলিকপ্টারটি বাঁচার জন্য উপরে উঠলে রেখাটিও উপরে উঠে খায় এরং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্নভিন্ন করে ফেলে।

রাতে হাজী খান মুহাম্মাদও ১৫জন সাতার জানবাজকে সঙ্গে নিয়ন যাঁদের মধ্যে সুহাইল আহমাদ এবং হাফেয রব নাগয়ায সহ আরো কয়েকজন হরকাতুল মুজাহিদীনের সদস্য ছিলেন__নী অতিক্রম করেন। আকাশ পরিষ্কার ছিল। ১৪ তারিখের পূর্ণিমার চাঁদ অকৃপণভাবে সমগ্র পরিবেশকে জ্যোত্ম়না বিকিরণ করছিল। গ্রামের দিকে যাওয়ার পথে দুশমনের বিমান এই বাহিনীকে আবিষ্কার করে। দুশমনের বিমান অনেক উঁচু থেকে ক্রাষ্টার বোমা নিক্ষেপ করে। কিন্তু মুজাহিদগণ নিরাপদে বস্তি বিজেতা মুজাহিদদের সাথে মিলিত হন। এঁরা তাঁদের জন্য পানাহার সামগ্রী এবং অতিরিক্ত অস্ত্রশস্ত্রও সঙ্গে এনেছিলেন।

সকাল (৪ই রমাযান) ৮টার কাছাকাছি বিমানবন্দরের সেই ভবন থেকে সীজোয়া যানের বছর বের হয়ে আসে। তাদের পিছনে পিছনে পদাতিক সৈন্যও ছিল। তারা ফায়ারিং করতে করতে গ্রামের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদগণ_-যাঁরা এমনতর যে

কোন অবস্থার সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য পূর্ব থেকেই মোর্চায় অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন __দৃঢ়ভাবে তাদের মোকাবেলা করেন। পিছন (দক্ষিণ ) দিক থেকে মুজাহিদদের তোপও গোলাবর্ষণ করতে থাকে। দু " ঘন্টার অবিরাম লড়াইয়ের ফলে আফগান সেনারা বেশ কয়টি লাশ ফেলে রেখে এ ভবনের দিকেই পশ্চাদাপসরণ করে।

## লড়াইয়ের দ্বিতীয় ধাপ

দুশমনের এই আধমরা প্রচেষ্টা দেখে এখানে তাদের লোক স্বল্পতা এবং হীন মনোবলের বিষয়টি মুজাহিদগণ খুব ভাল করে উপলব্ধি করতে পারেন। এখন তাঁরা অধিকতর আত্মবিশ্বাস নিয়ে পরবর্তী ধাপ আরম্ভ করার জন্য তৈরী হন।

এখানে সুহাইল সহ আরো কয়েকজন জওয়ানকে মৌলভী শাব্বির সাহেবের নেতৃত্বে রেখে হাজী খান মুহাম্মাদ প্রায় ২১ জন সাথীকে সঙ্গে নিয়ে পশ্চিম দিকে নদীর তাঁর ধরে ছোট ছোট সেই চারটি কেল্লার মস্তক চূর্ণ করার জন্য রওয়ানা হন __যেগুলো এখান থেকে চানারপোষ্ট পর্যন্ত নদী অতিক্রম করার পথে প্রতিবন্ধক ছিল। এ সমস্ত কেল্লার উপর দক্ষিণ তাঁর থেকে মুজাহিদদের তোপ এবং ট্যাংকসমূহ গুলি বর্ষণ আরম্ভ করেছিল। হাজী সাহেবের সঙ্গে হরকাতুল মুজাহিদীনের অভিজ্ঞ জানবাজ মুজাহিদ হাফেয রব নাওয়াযও ছিলেন। তিনি শাহাদাতের বাসনা এবং তাওয়াক্কুল আলাল্লাহর পথসম্বলও সঙ্গে করে নিয়ে যান।

***قافلہ ہو نہ سکے گا اک بھی ویراں تیرا***

জানবাজ মুজাহিদ

غیر یک بانگ درا کچھ نہیں ساماں تیرا

“তোমার কাফেলা কখনো উজাড় হতে পারে না

একটি মাত্র ঘন্টাধবনি ছাড়া তোমার আর কোন পাথেয় নাই

## লড়াইয়ের তৃতীয় ধাপ

ঠিক এই সময়ে হরকাতুল জিহাদের কমাণ্ডার নাসরুল্লাহ এখান থেকে অনেক পশ্চিমের সেহগায়ী গ্রামে মৌলভী আবদুল কাইয়ুমকে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে প্রায় ১৩জন মুজাহিদকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরবর্তী অপর একটি বিজিত গ্রামে গিয়ে উপনীত হন।

হাজী খান মুহাম্মাদ যেই কেল্লা চতুষ্টয়ের মস্তক চূর্ণ করছিলেন , সেগুলো এখান থেকে পূর্ব দিকে কয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। " কমাণ্ডার নাসরল্লাহ কয়েকদিন পূর্বে এই গ্রাম থেকে একটি ঘোড়া এবং একজন সৈন্যকে পাকড়াও করেন। বন্দী লোকটি নিজেকে শিয়া বলে দাবী করছিল। সে বলছিল যে, সে একজন ইহঞ্জিনিয়ার। কমিউনিষ্ট সরকার তাকে কাবুল থেকে ধরে জোরপূর্বক এখানে পাঠিয়েছে। ?

মৌলভী নূরুল আমীন সোল্লামাহু ) বর্ণনা করেন যে, গ্রামের আশেপাশে জায়গায় জায়গায় বিক্ষিপ্তাকারে প্যারাসুট পড়েছিলে। সেগুলোর ভিতর বন্ধ সিন্দুকে ভরা গোলাবারুদ , ডিজেলের ড্রাম এবং প্রচুর

পরিমাণে পানাহার সামগ্রী ছিল। সম্মুখে নদীর ওপারে ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে দুশমনের গোপন চৌকি উধিরপোষ্ট ছিল। মুজাহিদগণ সেই পোষ্টের উপর কয়েকদিন ধরে গোলাবর্ষণ করছিলেন। দৃশ্যত এই রসদসমূহ এ পোষ্টের জন্য নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু ভাগ্যনিয়ন্তা সেগুলোর উপর মুজাহিদদের নাম লিখে দেন।

এই পোষ্ট আমাদের আগমন সম্পর্কে কিছুই জানত না। তারা দক্ষিণ-পূর্বের দূরবর্তী মুজাহিদদের উপর ফায়ারিং করছিল। অল্পক্ষণের মধ্যে মাওলানা জালালুদ্দীন হক্কানীর সংগঠনের উদী' পরিহিত মুজাহিদগণও সেখানে এসে পোষ্টের মস্তক চূর্ণ করার জন্য তোপ বসাতে আরম্ভ করেন। কিছু সাথী জনশূন্য গ্রামে বিক্ষিপ্ত বিচরণকারী মুরগী ধরে ইফতারী তৈরীর কাজ আরম্ভ করে।

আমরা ধারণা করেছিলাম যে, হয়তো বাতে নদী অতিক্রম করে পোষ্টের উপর আক্রমণ করার প্রোগ্রাম করা হয়েছে। কিন্তু সেগুলোকে যে, দুশমন পোষ্ট খালি করে দিয়ে শহরের পথ থধরেছে। ইতিমধ্যে মাওলানা পীর সুহাম্মাদ এবং হরকাতুল জিহাদের কেন্দ্রীয় আমীর মাওলানা সাআদাতুল্লাহও সেহগায়ী গ্রাম হয়ে সেখানকার অবশিষ্ট মুজাহিদদেরকে সঙ্গে নিয়ে এখানে এসে পৌঁছেন। এভাবে এখানে কয়েকশ মুজাহিদ সমবেত হয়ে যায়।

ওয়ারলেস যোগে পূর্ব দিকের মুজাহিদদের সঙ্গে মাওলানা পীর মুহাম্মাদের যোগাযোগ বহাল ছিল। তিনি এসেই সবাইকে একত্রিত করেন এবং অবিলম্বে নদী পার হওয়ার আবেগপূর্ণ নির্দেশ প্রদান করেন। তখন আর কারো গরম

পরাটা, ডিম ও মুরগী ভোনার কথা মনে থাকে না। শাহাদাত-বাসনার প্রবল আবেগ--তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ প্লাবনের ন্যায় নদীর দিকে আছড়িয়ে পড়ে।

সর্বপ্রথম কিছু আফগান মুজাহিদ নদী অতিক্রম করেন। তারপর পাঁচজন মুজাহিদকে সঙ্গে নিয়ে নাসরুল্লাহ অবতরণ করেন। তিনি বড় একটি রশি সাথে নিয়ে যান। রশির একমাথা এপারে এবং অপর মাথা ওপারে বেঁধে দেওয়া হয়।

ময়দানী এলাকা থেকে আগত মুজাহিদদের জন্য পাহাড়ী নদী অতিক্রম করা ছিল একদম নতুন এক পরীক্ষা। সাঁতার লোকদের জন্যও পাহাড়ী নদীতে সাঁতার দেওয়া প্রাণান্তকর কাজ ছিল। তাঁরা রশির সাহায্যে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু শীতল পানির তীব্র স্রোত মাটিতে পা পড়তে দিচ্ছিল না। তীব্র স্রোতের কারণে রশিও স্থির ছিল না। রশি এমন জোরে ঝটকা দেয় যে, কয়েকজন জওয়ান ডিগবাজি খেয়ে পড়ে যায়। সারগোদার অধিবাসী মুহাম্মাদ নায়ীম এবং তার সঙ্গী নায়ীমুল্লাহ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে গিয়ে স্রোতে ভেসে যান। তাঁদেরকে সংগঠনের আমীর মাওলানা সাআদাতুল্লাহ, পুরাতন ও অভিজ্ঞ গেরিলা মুজাহিদ বখতিয়ার হুসাইন (বাংলাদেশী) এবং রহমাতুল্লাহ (আফগানি) জান বাজি রেখে তুলে আনেন। মুহাম্মাদ নায়ীম অচেতন হয়ে পড়েন। নায়ীমুল্লাহর ক্লাসিনকোভ ভেসে যায়। অবশিষ্ট মুজাহিদগণ নদীর তীরে অসহায়ভাবে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে

দাঁড়িয়েছিলেন। হঠাৎ মাওলানা পীর মুহাম্মাদের আওয়াজ গর্জে ওঠে -

"মুজাহিদ গাজিগণ ! কোন নদী আজ পর্যন্ত ইসলামের মুজাহিদের পথ রোধ করেনি। তোমরা কি আল্লাহর পথের মুজাহিদ নও !

এতো তাঁর আওয়াজ ছিল না ! এ যেন মুমিনের হৃদয়ের বিশ্বাস রসনায় এসে গর্জে উঠেছিল। এ যেন এক বিদ্যুৎ ছিল , যা প্রত্যেকের শিরা -উপশিরায় প্রবাহিত হয়। দেখতে দেখতে তাঁর লোকশূন্য হয়ে যায়। নদী রোজাদার মুজাহিদদের বিক্ষুব্ধ প্লাবনের মুখে পড়ে যায়। অনেকে আঁকড়ে ধরে সবাই কমাণ্ডার নাসরুল্লাহর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হন।

স্বল্পভাষী নাসরুল্লাহ কাব্য রসিক লোক নন। তিনি কথা নয় কাজের প্রবক্তা। কিন্তু আজ তিনি আবেগে আত্মহারা ছিলেন। মৌলভী নূরুল আমীন বর্ণনা করেন - তিনি দুই হাত উত্তোলন করে চিৎকার করে করে নিম্নের কবিতা দ্বারা মুজাহিদ সাথীদেরকে স্বাগত জানাচ্ছিলেন।

***دشت تو دشت □یں، دریا بھی نہ□ چھوڑ□ □م نہ□***

***بحر ظلمات میں دوڑا دئ□ گھوڑ□ □م نہ□***

"বন ও মরু তো বটেই সাগরও আমরা ছাড়িনি □

গভীর সাগর বক্ষেও আমরা ঘোড়া দৌড়িয়েছি □"

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ
الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ
مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ
مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ
تُظْلَمُونَ

ছাড়া অন্যান্যদের উপরও যাদেরকে তোমরা জান না ; আল্লাহ তাদেরকে চিনেন। বস্তুত যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না। (আনফালঃ ৬০)

এই আয়াতের তিনটি বিষয় , বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য -

১.একটি এই যে , এখানে **مَّا اسْتَطَعْتُم** ( যো কিছু সংগ্রহ করতে পার ) বলে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে , তোমাদের সফলতার জন্য প্রতিপক্ষের নিকট যে ধরনের এবং যে পরিমাণ সরঞ্জাম রয়েছে , তোমাদেরকেও সে ধরনের এবং সে পরিমাণ সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে হবে তা জরুরী নয়। বরং সামর্থ্য পরিমাণ সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে ত্রুটি করো না। এটাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে। আর তাহলেই আল্লাহ তাআলার নুসরাত ও সাহায্য তোমাদের সঙ্গে থাকবে।

(তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন , খণ্ড ৪ , পৃঃ ২৭২ )

২. পবিত্র কুরআন এই আয়াতে সমকালীন প্রচলিত হাতিয়ারসমূহের উল্লেখ না করে ব্যাপক অর্থবোধক (**قُـــوَّةٌ**)‘শক্তি ’ শব্দটি প্রয়োগ করে এদিকেও ইঙ্গিত করেছে যে , এই শক্তি স্থান ও কালভেদে ভিন্নতর হতে পারে। সে যুগের অস্ত্র ছিল তাঁর , তলোয়ার , বর্শা ও মিনজানিক ইত্যাদি। আর এখন রাইযেল , তোপ, রকেট, এটম বোম, মিসাইল ও ডুবোজাহাজের যুগ। ভবিষ্যতে এর চেয়ে অধিক শক্তিশালী অস্ত্রও আবিষ্কার হতে পারে। প্রত্যেক যুগের অত্যাধুনিক অস্ত্র ও রণসামগ্রী

প্রস্তুত করার সম্ভাব্য যাবতীয় প্রচেষ্টা করা মুসলিম জাতির ধর্মীয় দায়িত্ব। কারণ , এ সর্বই এই (قُوَّةٌ)“শক্তি ' শব্দের অন্তর্ভূক্ত , যার প্রস্তুতিকে পবিত্র কুরআন ফরয করেছে।

৩. এ আয়াতে সর্বপ্রকারের সমর সামগ্রীকে অন্তর্ভূক্তকারী قُـوَّةٌ "শক্তি শব্দের উল্লেখান্তে বিশেষ এক প্রকারের শক্তির কথা স্পষ্ট করেও উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হলো وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ অর্থাৎ “পালিত ঘোড়া ” ।

এখানে বিশেষভাবে ঘোড়ার উল্লেখের পিছনে একটি কারণ তো সুস্পষ্ট যে , সে যুগে ঘোড়াই ছিল জিহাদের জন্য সর্বাধিক কার্যকর ও উপকারী বাহন। দ্বিতীয় কারণ এই যে , সমরাস্ত্র ও অন্যান্য রণ সামগ্রী তো সময়ের সাথে পরিবর্তিত হতে থাকে। প্রাচীন অস্ত্রসমূহের স্থান আধুনিক অস্ত্রসমূহ দখল করে নেয়। কিন্তু ঘোড়ার উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা তথাপি অবশিষ্ট থেকে যায়। বর্তমানের এই যান্ত্রিক যুগেও যখন কিনা নানাপ্রকারের সমরযান আবিস্কৃত হচ্ছে এবং পশু ব্যবহার অনেকটা বিলুপ্ত হয়ে গেছে অনেক লড়াইয়ে ঘোড়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। বিশ্বের উন্নত কোন সেনাবাহিনীকে আজও ঘোড়া ছাড়া পরিপূর্ণ মনে করা হয় না। উন্নতমানের প্রত্যেক সেনাবাহিনীই ঘোড়ার বংশ বৃদ্ধি , প্রতিপালন ও প্রশিক্ষণের প্রতি গুরুত্বারোপ করে থাকে। যা হোক এখানে বিশেষভাবে ঘোড়ার উল্লেখ করার মধ্যে সম্ভবত এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে , জিহাদে ঘোড়ার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা

ভবিষ্যত যুগে কম হয়ে এলেও নিঃশেষ হবে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো এ বিষয়টি অনেকটা সুস্পষ্টই বলে দিয়েছেন।

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাদি .) বর্ণনা করেন যে, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি একটি ঘোড়ার ললাটের কেশ গুচ্ছ স্বীয় আঙ্গুল দ্বারা পেঁচাতে পেঁচাতে বলছিলেন-

**اَلْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ بِنَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اِلَي يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْاَجْرُ وَ الْغَنِيْمَةُ**

অর্থঃ "ঘোড়ার ললাটের সঙ্গে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য কল্যাণ বেঁধে দেওয়া হয়েছে, (অর্থাৎ) সওয়াব ও গনীমতের মাল। (মুসলিম শরীফ)

জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া প্রতিপালনের মহান সওয়াব ও প্রতিদানের বহুবিধ কথা, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়ার প্রতিপালন, প্রশিক্ষণ ও দৌড় প্রতিযোগিতার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করতেন। ইসলামী সমাজে জিহাদের ঘোড়ার মর্যাদা এত অধিক ছিল যে, মুসলিম রমণীরা এ সমস্ত ঘোড়ার গালের ধুলি নিজেদের উড়নী দ্বারা পরিষ্কার করতেন। আর এজন্যই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি. ওয়াসাল্লামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ সাহাবী মশহুর কবি হযরত হাসসান বিন সাবিত (রাদি .), যিনি ঈমানোদ্দীপক প্রশস্তিমূলক কাব্য দ্বারা বিধর্মী কবিদের বাজে কথা ও মিথ্যা

অভিযোগসমূহের দাতভাঙ্গা জবাব দিতেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে তাদের উপর তীব্র আঘাত হানতেন। কারণ , সে যুগে কবিতা ছিল দুশমনকে ঘায়েল করার প্রভাবশালী মাধ্যম। এমনই একটি কবিতা তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুনালে তিনি তাঁর জন্য দুআ করেন এবং বলেন যে, "হাসসান আমার হৃদয়কে শীতল করে দিয়েছে " সেই কবিতায় তিনি ইসলামের মুজাহিদদের ঘোড়ার শান -শওকত বর্ণনায় কয়েকটি চরণ রচনা করেন। তার একটি -

***تَظَلُّ جِيَادُنَا مُتَمَطِّرَاتٌ***

***تَلْطَمُهُنَّ بَالْخُمُرِ النِّسَاءِ***

অর্থঃ "আমাদের বিদ্যুৎ গতি সম্পন্ন ঘোড়াসমূহ (দুশমনের উপর ) আপতিত হওয়ার কালে পরস্পরের উপর অগ্রগামী হয় রমণীরা স্বীয় উড়ুনি দ্বারা ঘোড়ার গালসমূহ সাফ করে থাকে ' (মুসলিম শরীফ )

## হাফেয রব নাওয়ায

দুশমন অনেক দেরীতে হলেও দেওয়ালের লিখন পাঠ করে। সুতরাং তারা হাজী খান মুহাম্মাদ এবং হাফেয রব্ব নাওয়াযের বাহিনীর সঙ্গে দৃঢ়ভাবে কোথাও মোকাবেলা করতে পারেনি। এদের বাহিনী এবং অন্যান্য মুক্ত করে নেয়। তারপর দুশমন অনতিবিলম্বে উত্তর তীরের অবশিষ্ট পোষ্টসমূহকেও বিনা যুদ্ধে খালি করে দেয় ফলে শহর বিজয়ের দ্বার উন্মোচিত হয়ে যায়।

জানবাজ মুজাহিদ

মৌলভী সুহাইল আহমাদ বলেন যে, ওয়ারলেস যোগে এই বিজয় সংবাদ পেতেই দক্ষিণ দিক থেকে মুজাহিদগণ দলে দলে নদী পার হতে থাকে। আমরা শাব্বীর সাহেবের নেতৃত্বে বিজিত কেল্লাগুলোকে বাম দিকে রেখে দ্রুত “তখতাবেগ' কেল্লার দিকে রওনা হই। যাওয়ার পথে অনেক তেজোদ্দীপ্ত মুজাহিদ বাহিনী আমাদের সঙ্গে শামিল হতে থাকে। মুজাহিদদের কয়েকটি ট্যাংকও দুশমনের ট্যাংকের ব্যবহৃত পথ ধরে নদী অতিক্রম করে। কিছুদূর সম্মুখে গিয়ে আমরা হাজী খান মুহাম্মাদ এবং হাফেয রব্ব না'ওয়াযের বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হই-যারা কিনা আজ উত্তর তাঁরকে দুশমন মুক্ত করতে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং "তখতাবেগ' কেল্লার উপর আক্রমণ করি।

দূর্গের দিক থেকেও কিছুক্ষণ ফায়ারিং হতে থাকে। কিন্তু মুজাহিদদের সংখ্যা এবং আক্রমণের তীব্রতা প্রতি মুহূর্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই দুর্গের উপর মৃত্যুসম নীরবতা ছেয়ে যায়। দূর্গটি ছিল কিছুটা উঁচু স্থানে। তার দেওয়ালগুলোও ছিল উঁচু। দরজা ছিল আমাদের বিপরীতে অন্য কোনদিকে। মুজাহিদগণ বিভিন্ন দিক থেকে ফায়ার করতে করতে দুর্গের উপর আরোহণ করতে আরম্ভ করেন।

রাতের আঁধার ঘনিয়ে আসছিল। আমাদের কমাণ্ডার মৌলভী শাববীর সাহেব নির্দেশ দিলেন__কোন পাকিস্তানী মুজাহিদ যেন দুর্গাভ্যস্তরে প্রবেশ না করেন। এমন সময় আমরা ডান-বাম এবং আশপাশ দিয়ে আলোর গোলার ব্রাষ্ট অতিক্রম করতে দেখতে পাই। তারপর দ্বিতীয় ব্রাষ্ট অতিক্রম করতেই

কমাণ্ডার সাহেব সাথীদেরকে আড়ালে আত্মগোপন করার নির্দেশ দেন।

এ সমস্ত ফায়ার কাছের একটি অস্ত্র গুদাম থেকে আসছিল। সেদিকেই নিচে কিছু পুরাতন বাড়ী ছিল। আমরা আশ্রয় গ্রহণের জন্য সেদিকে দৌড়াই। কিছু মুজাহিদ মাটিতে শুয়ে পড়ে। হাফেয রবব নাওয়ায আমার নিকটেই দাঁড়িয়েছিলেন। আমি দৌড়াতে দৌড়াতে তাকেও ডাক দেই। কিন্তু নিচে আড়ালে পৌঁছে ঘুরে দেখি তিনি সেখানেরই একটি বৃক্ষের আড়ালে আত্মগোপন করার জন্য অগ্রসর হচ্ছেন।

আমি দেখতে দেখতে তিনি গুলিবিদ্ধ হন। তিনি উচ্চ স্বরে “আল্লাহু আকবার, ধ্বনি দিয়ে মাটিতে পড়ে যান। বৃষ্টির মত গুলি বর্ষণ হচ্ছিল। তাঁকে তুলে আনা বিপদজনক ছিল। সে সময় আমাদের নিকট কিছু বন্দী সেনা ছিল-_যাদেরকে মুজাহিদগণ পথের মধ্যে পাকড়াও করেছিলেন_ নাওয়াযকে গুলির বৃষ্টির মধ্যে থেকে বের করে আমাদের নিকট নিয়ে আসে।

ভাই রবব নাওয়ায বেহুশপ্রায় অবস্থায় ছিলেন। তাঁর বুকে বাঁধা ম্যাগ্রজিনের পেটিতে দুশমনের গুলি এসে লেগেছিল। যারফলে ম্যাগজিনের গুলিসমূহও বিস্ফোরিত হয়ে তাঁর পেট ও শরীরের অন্যান্য অংশে ঢুকে গিয়েছিল। কমাণগডার সাহেব আমাকে হুকুম করলেন যে, তাকে পিছনে নিয়ে যাও এবং দু'জন বন্দীকেও সঙ্গে নিয়ে যাও। “বাড়ীর কেন্দ্রে ওয়ারলেসযোগে দরখাস্ত করা হয় যে, অবিলম্বে যেন একটি গাড়ী নদীর তীরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

আমি খুব তাড়াতাড়ি ভাই রব্ব নাওয়াযকে একটি চাদরের উপর শুইয়ে দেই। তাঁর পেটি, বর্শা এবং গত রাতে নদী পার হওয়ার জন্য সঙ্গে আনা রশি-_যা তাঁর কোমরে বাঁধা ছিল-_এবং অপ্রয়োজনীয় কাপড়সমূহ খুলে ফেলি। একজন আফগান সাথী এবং দুইজন কয়েদীর সাহায্যে তাঁকে চাদরের মধ্যে তুলে নিয়ে আমরা বিরান বাড়ীসমূহের আড়ালে নিয়ে যাই। সম্মুখে শুকনো ক্ষেত ছিল। আমরা ফায়ারিং বন্ধ হওয়ার অপেক্ষায় শেষ বাড়িটির আড়ালে গিয়ে বসে পড়ি।

“তখতাবেগ" কেল্লা ছিল আমাদের পিছনে। ইতিমধ্যে প্রায় ত্রিশজন সৈন্যকে কেল্লা থেকে বের হয়ে পালাতে দেখতে পাই। তারা সবাই সাদা পোশাক পরিহিত ছিল। তাদের হাত ছিল খালি। তারাও নদীর দিকেই যাচ্ছিল। কিছু মুজাহিদ আড়াল থেকে বের হয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্ত অস্ত্র ডিপো থেকে তাঁদের দিকে ফায়ারিং হলে তাঁরা ফিরে চলে আসে।

পলায়নপর সৈন্যরা আমাদেরকে দেখে
ফেলে। আমাদেরকে পাশ কেটে তারা যখন নদীর দিকে অগ্রসর হয়, সেদিক থেকে তখন মুজাহিদদের ট্যাংক এগিয়ে আসছিল। আর দুশমন তাদের দিকে রকেট বর্ষণ করছিল। বাধ্য হয়ে পলায়নপর সৈন্যরা কয়েকটি পুরাতন বাড়ির, পিছনে লুকিয়ে পড়ে।

আমি সুযোগের সদ্যবহার করে আফগান সাথীদেরকে সেখানেই রেখে ক্লাসিনকোভ দ্বারা ফাঁকা গুলি করতে করতে তাদের মাথার উপর চলে যাই। আমার নিকট ছয়টি ম্যাগজিন ভরা ছিল। পকেটের মধ্যেও অনেক গুলি ছিল।

আমি তাদের নিকট পৌঁছেই উচ্চস্বরে নির্দেশ দিয়ে তাদের হাত উপরে উঠাতে বলি এবং ক্লাসিনকোভ দ্বারা হাঁকিয়ে নিয়ে ভাই রবব নাওয়াযের নিকট চলে আসি। আফগান সাথীদের সহযোগিতায় প্থক পৃথকভাবে সবার তল্লাশি নেই। ফায়ারিংয়ের তীব্রতা হাস পেতেই তাদেরকে সারিবদ্ধ ভাবে সাথে নিয়ে আমরা দ্রুত ক্ষেতসমূহ অতিক্রম করি। নদীর নিকটবর্তী একটি জনশূন্য গ্রাম থেকে একটি চৌকি খুঁজে নিয়ে তার উপর ভাই রব্ব নাওয়াযকে শোয়ায়ে সম্মুখে রওনা হই।

নদীর তীরে হাজী খলীল সাহেব চারটি ট্যাংক নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। বন্দীদেরকে তাঁর হাতে সমর্পণ করি। তিনি একজন কয়েদীকে অনতিবিলম্বে এই পয়গাম দিয়ে নগরবাসীর নিকট পাঠিয়ে দেন যে, এখনো আপনারা অস্ত্র সমর্পণ করলে আপনাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করা হবো?

একটি হিনো ট্রাকে চড়ে আমরা নদী অতিক্রম করি। ট্রাকটি মুজাহিদদেরকে নদী পার করানোর জন্যই এখানে দাঁড়িয়েছিল। এমন সময় দুশমনের বিমান আমাদের উপর আক্রমণ করে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাযত করেন।

সামনে গিয়ে ভাই রবব নাওয়াযকে একটি পিকআপে তুলে নিয়ে রওনা করি। এবার আমি তাঁর নিকট বসার সুযোগ পাই। তাঁর অবস্থা ভীষণ নাজুক দেখতে পেয়ে আমার মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। তাঁর মাথা চক্কর দিচ্ছিল। বমির ভাব হচ্ছিল। সোজা হয়ে শোয়া দুস্কর হয়ে পড়ছিল। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় গাড়ীর প্রত্যেক

ঝাঁকুনিতে তাঁর মুখ থেকে আল্লাহ আল্লাহ শব্দ বের হচ্ছিল।

হঠাৎ করে আফগান ড্রাইভার মাগরিব নামায পড়ার জন্য গাড়ী দাঁড় করায়। আমরা বুঝানোর চেষ্টা করি যে, নামাযের সময় এখনো অনেক বাকী আছে। সামনে গিয়ে নামায পড়তে পার্ব। কিন্তু সে শুনেও না শোনার ভান করল।

সে সময় ভাই রবব নাওয়ায চোখ বন্ধ করে প্রশান্তভাবে শুয়েছিলেন। আমার মনে আশংকা হলো, আঙ্গুলের সাহায্যে তাঁর চোখ খুলে দেখতে চাইলে তিনি মাথা দিয়ে হালকাভাবে ইশারা করে এমন করতে নিষেধ করলেন। তাঁর জিহবা ধীরে ধীরে ধিকিরে লিপ্ত ছিল।

আমরা তাড়াতাড়ি করে উবু করলাম। একজন সাথী আযান দিল! অপর একজন সাথী ভাই রবব নাওয়াঘকে গিয়ে দেখে, কিন্তু ততক্ষণে তিনি অনেক দূরে চলে গেছেন। তাঁর আদি নিবাস-__যার বাসনায় তিনি বছর ধরে আফগানিস্তানের বিভিন্ন রণাঙ্গনে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিলেন-__অন্যদের জন্য খোস্তের দ্বার উন্মোচনকারী রবব নাওয়ায জান্নাতের পানে চলে গেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

জামাআতের সাথে মাগরিব নামায' আদায়
করে সম্মুখে অগ্রসর হলে পিছনের সেই অস্ত্র ডিপো থেকে__যার গুলি ভাই রবব নাওয়াযের বুকে লেগেছিল-_বিরাট একটি অগ্নিশিখা আকাশ স্পর্শ করতে দেখতে পাই। বিস্ফোরণের শব্দও শোনা যায়। পরে জানতে

পারলাম যে , মুজাহিদগণ বারুদের আঘাতে অস্ত্র ডিপোর্টি উড়িয়ে দিয়েছেন। ফলে ভিতরের অস্ত্র দিয়েছে। এই সংবাদের শীতলতা দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত আমাদের তপ্ত বুককে সান্ত্বনা দিতে থাকে।

আফগানিস্তানের জিহাদ চলাকালে আমি বেশ কয়জন মুজাহিদের নিকট থেকে শহীদদের খুন থেকে খুশবু বের হওয়ার ঘটনা শুনেছি। একবার একজনেব রুমালের রক্তের দাগ থেকে সুপ্রাণ শুঁকেও ছিলাম। কিন্তু এ পর্যন্ত আমি নিজে কোন শহীদকে এমতাবস্থায় প্রত্যক্ষ করিনি। একথা মনে হতেই আমি ভাই রবব নাওয়াযের রক্তের মধ্যে আমার আঙ্গুল ডুবিয়ে দেই। শুকে দেখি তা " একেবারে বিরল বিস্ময়কর এক সুগন্ধি। আমি অন্য কোন সুগন্ধির সাথে তার তুলনা করতে পারবো না। কারণ, তা " এমনই মনোমুগ্ধকর ছিল যে , কখনো তা" আমার কল্পনাতেও আসেনি।

মোটকথা, হৃদয় জগতে এক আলোড়ন এবং অপূর্ব ও অপার্থিব ভাব ও আবেগ নিয়ে আমরা মাওলানা জালালুদ্দীন হক্কানীর মারকায "সালমান ফারসী 'তে পৌঁছি এবং শহীদের দেহকে এসম্বুলেন্সে করে সাহিওয়াল (পাকিস্তান ) পাঠিয়ে দেই। জি হা ! "দেহকে অন্যথা তাঁর রূহ তো সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে চলে গিয়েছিল - প্রত্যেক মুজাহিদই যার বাসনা করে থাকে এবং যার উত্তাল বাসনা নিয়ে আজো তিনি যুদ্ধে যাওয়ার প্রাক্কালে সাথীদেরকে বলেছিলেন -__"আমার শাহাদাতের জন্য দুআ করবে!

***پر ہے خرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی***

***ستار□ جس کی گرد را□□و ، و□ کارواں تو □□***

“নীলাম্বরের উর্ধ্বে
মুসলমানের অভীষ্ট মঞ্জিল □
নক্ষত্রপুঞ্জ যার পথ -ধুলি , তুমি সেই
কাফেলা □”

## ফাতহে মুবীন বা প্রকাশ্য বিজয়

ওদিকে পশ্চিম দিক দিয়ে মুজাহিদদের যে কাফেলাটি মাওলানা পীর মুহাম্মাদ সাহেবের নেতৃত্বে নদী পার হয়েছিল , তাঁরা ভেজা কাপড়েই মাগরিব নামাযের পর অবিলম্বে শহর অভিমুখে যাত্রা করেন।

মৌলভী নূরুল আমীন -_যিনি হরকাতুল জিহাদিল ইসলামীর মুজাহিদদের সঙ্গে সেই কাফেলায় শরীক ছিলেন _-বলেন যে , ফাওয়ার পথে অনেকগুলো কেল্লা এবং পোষ্ট সম্মুখে আসে, কিন্তু সর্ব ক 'টই জনশূণ্য ছিল। আমরা আবেগপূর্ণ সুর দিয়ে হযরত কায়ফী মরহুমের[28]আলোড়ন সৃষ্টিকারী কবিতা “লাগাও যাবে হায়দারী ” “আলী হায়দারের আঘাত হানো ” এবং

---

[28] অর্থাৎ অধম লেখকের “ভাইজান, জনাব মুহাম্মাদ যকী কাইফী মরহুম। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'কাইফিয়্যাত " বারবার ছেপে বের হয়েছে। তাঁর কাব্যচর্চার আসল অঙ্গন ছিল “গজল'। ফলে তাঁর কবিতারাজির মধ্যে অসম্ভব রকমের সুষ্মতা ও প্রতিক্রিয়া পরিদৃষ্ট হয়। তাঁর অনেক কবিতাই মুজাহিদদের আদ্যপান্ত মুখস্থ রয়েছে। তাঁদের সভা-সমাবেশকে সেগুলো তেজোদ্দীপ্ত করে রাখে। ১১৭৪ ঈসায়ীতে তিনি লাহোরে ইন্তেকাল করেন। এ কেতাবের অনেক জায়গায়ই তার কবিতার পংক্তিসমূহ উদ্ধৃত হয়েছে। পাঠক সমীপে তাঁর জন্য দুআর দরখাস্ত করছি। __রফী” উসমানী।

***و ہ سنگ گراں جو حائل ہیں، رستیں سے ہٹا کر دم لیں گے***

**“**পথের যাবতীয় বাধার প্রাচীর পথ থেকে হটিয়েই আমরা ক্ষান্ত হবো।**”**

পাঠ করতে করতে আমরা বিদ্যুৎ গতিতে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকি।

মাওলানা পীর মুহাম্মাদ সাহেব ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে , যে গৃহ থেকে ফায়ারিং হবে না , তাকে যেন কেউ উত্যক্ত না করে। নারী ও শিশুদের উপর যেন কেউ হাত না উঠায়। শরীয়ত নির্দেশিত এ সমস্ত হুকুমকে কঠোরভাবে মেনে চলা হয়। আমরা আনুমানিক দেড়ঘন্টার মধ্যে শহরের পশ্চিমাংশে গিয়ে উপনীত হই। এখানে একটি অক্ষত হেলিকপ্টার খালি পড়েছিল। আরো সম্মুখে ট্যাংকের ওয়াকশপের মধ্যে ১৫/২০টি ট্যাংকে দাঁড়িয়েছিল। কয়েকজন মুজাহিদ সেগুলোকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ফাঁকা গুলি করতে থাকে।

এতক্ষণ পর্যন্ত দুশমনের পক্ষ থেকে উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিরোধ হয়নি। আমরা খোস্ত বাজারের দিকে অগ্রসর হলে মতুন কেল্লার দিক থেকে গুলি -আসতে আরম্ভ করে। আমরা না থেমে কেন্দ্রীয় সামরিক হাসপাতালে চলে যাই। হাসপাতালটি ছিল কয়েক তলা বিশিষ্ট। সেখানে কয়েকশ " সৈন্য আহতাবস্থায় পড়েছিল। তাদেরকে জনাব গুলবদন হিকমত ইয়ার -এর মুজাহিদগণ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিয়েছিল।

আমরা দ্রুত খোস্তের সর্ববৃহৎ সেনা ওয়ার্কশপের দিকে অগ্রসর হই। ওয়ার্কশপটি ছিল বিশাল আয়তন নিয়ে বিস্তৃত। এখান থেকেও সৈন্যরা পালিয়েছিল। তারই সম্মুখে ফায়ার ব্রিগেড স্টেশন। সেখানকার গাড়িগুলোও জনশূন্য পরড়েছিল। ওয়ার্কশপের মধ্যে অনেকগুলো বুলডোজার, ট্রাক, ট্রাক্টর, বিপুল পরিমাণে নতুন স্পেয়ার পার্টস এবং গাড়ির যন্ত্রাংশ প্রস্তুতকারী মেশিন ছিল।

ওয়ার্কশপটি ছিল “মতুন কেল্লার অনেক নিকটে। কিন্তু এখন সেখানে নিস্তকৃতা বিরাজ করছিল। আমরা দুশমন সেখান থেকেও পালিয়েছে মনে করে সেখানকার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে এমন একটি পাকা রোড ধরে-- যার উভয় দিকে কয়েকতলা বিশিষ্ট অনেকগুলো বাড়ী ছিল-_অতিক্রম করে নিকটবর্তী চৌরাস্তায় পৌঁছতেই একটি বাড়ী থেকে ফায়ারিং আরম্ভ হয়ে যায়। মাওলানা পীর মুহাম্মাদ সাহেব আমাকে সহ একটি বাহিনীকে মাওলানা আবদুল কাইয়ুম সাহেবের নেতৃত্বে সেই বাড়ীর খবর নেওয়ার জন্য এবং ওয়ার্ক শপের পাহারাদারীর জন্য নিয়োজিত করে সম্মুখে চলে যান।

আমাদের ধারণা ছিল যে, শুধুমাত্র এ বাড়ীতেই দুশমন রয়েছে। কিন্ত মুজাহিদগণ এ বাড়ীর উপর রকেটের আঘাত করতেই উপর দিকে 'মতুন কেল্লার” পাহাড় থেকে অটোমেটিক মেশিনগান মৃষলধারে গুলি বর্ষণ আরম্ভ করে দেয়। তখন বুঝতে পারি যে, দুশমন এখন পর্য্ত কেল্লার মধ্যে মজবুত অবস্থান

গ্রহণ করে আছে। আমরা ছিলাম খুবই অল্প সংখ্যক মুজাহিদ। তার মধ্যে তিনজন এখানে আহত হয়। এজন্য মাওলানা আবদুল কাইয়ুম সাহেব সিদ্ধান্ত নেন যে, আমীর সাহেবের পরামর্শ এবং নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ না করে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না। এখন শুধুমাত্র আহত সাথীদের জান বাঁচানোর চেষ্টা করা হবে, আহত মুজাহিদগণ তখন পর্যস্ত দুশমনের নিকট পড়েছিল।

হরকাতুল জিহাদিল ইসলামীর মুখপত্র মাসিক আল-ইরশাদের (

29)সম্পাদক মৌলভী আবদুল
হামীদ আব্বাসী বলেন যে, আমরা মাওলানা পীর মুহাম্মাদের নেতৃত্বে নগরীর মধ্যভাগে পৌঁছে দেখি, বিভিন্ন দিক থেকে বিজয়ী মুজাহিদরা এসে সেখানে একত্রিত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে কোলাকুলি করছে।

আমাদের বাহিনী কমিউনিষ্ট সেনাদের গুপ্ত সংগঠন “খাদ'-এর কেন্দ্র এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভবনসমূহে তল্লাশী চালায়। তারপর সেখানে পাহারাদার নিয়োজিত করে “আফগান মহিলা কাউন্সিল, এর অফিসে যায়। সেখানে একটি ছবি ঝুলানো ছিল। ছবিতে নারী- পুরুষ বিবস্ত্র হয়ে একসঙ্গে হাউজে স্লানের দৃশ্য দেখানো হয়েছে। আর তার নিচে পশতু ভাষায় লেখা রয়েছে_

“আফগানিস্তানে রুশদের আগমনে নারী- পুরুষ স্বাধীনতা লাভ করেছে। কাবুল সরকার জনগণের বিনোদনের সুব্যবস্থা করে দিয়েছো।’

29

, মাসিক আল-ইরশাদ, খোস্ত বিজয় সংখ্যা, পৃঃ ১৪

এখান থেকে মহিলা বিষয়ক একটি মাসিক পত্রিকাও বের হত।

এখান থেকে আমরা খোস্তের মজবুত ছাউনি “তখতাবেগ'এর দিকে অগ্রসর হই। ছাউনিটি শহর এবং বিমানবন্দরের মধ্যবর্তী একটি উঁচু স্থানে, . অবস্থিত। দূর্গ-প্রাটীর ৮/৯ ফুট চওড়া। দরজার মুখে কমিউনিষ্ট সেনাদের লাশ বিক্ষিপ্তাকারে পড়েছিল। পূর্বাংশ থেকে অগ্নিশিখা উঠছিল।

এটি ছিল পবিত্র রমাযানের পনেরতম রাত। জ্যোতম্নার ঝলমলে আলোয় সমগ্র শহর দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। শহরের বিজিত এলাকাসমূহ থেকে মুজাহিদগণ নানা রংয়ের গুলি নিক্ষেপ করে আনন্দ উদযাপন করছিল। কতক স্থানে তখনও খণ্ড খণ্ড লড়াই চলছিল। সে সমস্ত এলাকায় উভয় পক্ষ থেকে ফায়ারিং হচ্ছিল।

কেল্লার মধ্যে ছয় সহস্রাধিক ক্লাসিনকোভ ছাড়া ভারী তোপ, রকেট লাঞ্চার, বিমান বিধবৎসী কামান, টিটি পিস্তল, আরো অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র এবং অসংখ্য গোলাবারুদ ছিল।

এখানকার সমস্ত অস্ত অতি দ্রুত মুজাহিদদের পিছনের পাহাড়ী ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া ছিল জরুরী। এ কাজের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ছিল মাওলানা গীর মুহাম্মাদ সাহেবের উপর। কারণ, এটি নিশ্চিত ছিল যে, সকাল হতেই কাবুলের স্কাড মিসাইল এবং বোমারু বিমান খোস্ত শহরকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার পরিপূর্ণ চেষ্টা চালাবে। গণিমতরূপে প্রাপ্ত ট্রাকসমূহ

সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিল, সেগুলোতে অস্ত্র ভরে দ্রুত পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছিল।

আমরা কিছু সাথী ওয়ার্কশপে ফিরে গেলে এখানকার লড়াই এবং আহতদের হালত জানতে পারি। "রহিম ইয়ার খানের অধিবাসী মুহাম্মাদ খালেদের পিঠে “যারকায়ী , মেশিনগানের দুর্টি গুলি লেগেছিল। তিনি মারাত্বক আহত ছিলেন। কাশ্মীরের অধিবাসী মুহাম্মাদ আসেমের পায়ে গুলি লাগায় গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল। ওদিকে মুহাম্মাদ আফযালের পায়েও গুলি লেগেছিল। তবে তার ক্ষত গভীর ছিল না। অপর দিক থেকে অবিরাম ফায়ার আসছিল।

এখন যে কোন উপায়ে আহতদেরকে পিছনে নিয়ে যাওয়া ছিল সর্বপ্রথম জরুরী কাজ। ওয়ার্কশপে দাঁড়ানো কোন গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছিল না। বাধ্য হয়ে আহতদেরকে তুলে নিয়ে পায়ে হেটেই পুনরায় তখতাবেগ কেল্লার দিকে চলে যাই। উদ্দেশ্য ছিল সেখানে গিয়ে হিনো ট্রাক সংগ্রহ করে আহতদেরকে তাতে তুলে দিবো। কারণ , হিনো ট্রাকেই কেবলমাত্র নদী অতিক্রম করা সম্ভব ছিল।

***پ□ل□ غم تھا ک□ ٹوٹ□ قفس***

***اب غم بال و پرمل کیا***

প্রথমে পিঞ্জিরা ভেঙ্গে যাওয়ার দুঃখ ছিল ,

আর এখন ডানা ও পালকের দুঃখ লাভ হয়েছে □”

জুতা
আব্বাসী সাহেব বলেন যে,রাত তিনটা বেজে গিয়েছিল। সারা দিন রোযা রেখে ইফতারীর পরও কিছু না খেয়েই এখন পর্যন্ত অবিরাম অপারেশনের কারণে সাথীদের চেহারায় ক্লান্তির লক্ষণ ছিল সুস্পষ্ট। নদী অতিক্রমকালে আমি সহ কয়েকজন মুজাহিদ জুতা হারিয়ে বসি। নদী অতিক্রম করে প্রথমে কাঁটাযুক্ত ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে দিয়ে তারপর কাদা-পাঁকের “মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়। তারপর পাঁচ কিলোমিটারের -অধিক পাথুরে ভূমি নগ্নপদে অতিক্রম করার ফলে - আমাদের পায়ের অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। এবার পুনরায় তখতাবেগ যাওয়ার পর আমার মাথায় একটি বুদ্ধি আসে। আমি দেরী না করে সৈন্যদের একজনের লাশের পা থেকে বুট খুলে নিয়ে আমার পায়ের সমস্যার সমাধান করার জন্য সৈন্যদের লাশের নিকট চলে যাই। কিন্তু সম্ভবত আমার চেয়ে অধিক অভাবীরা পূর্বেই এ কাজ সেরে ফেলেছে। সমস্ত লাশের বুট গায়েব হয়ে গিয়েছিল!

খালেদ এবং আসেম মারাত্মক আহত্ত ছিল। তাদেরকে যে চৌকিতে অপেক্ষায় রাত চারটা বেজে যায়। পার্শ্বে উপবিষ্ট অধিকাংশ মুজাহিদ ঝিমুচ্ছিল। এমন সময় অকস্মাৎ পশ্চিম দিক থেকে এক ঝাক বিমান দেখা দেয়। তাদের শব্দ দ্রুত নিকটতর হচ্ছিল। হৃদয় ও রসনা পুনরায় আল্লাহর স্মরণে সিজদাবনত হয়ে যায়_-সমগ্র এলাকা বোমা বর্ষণের, শব্দে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে।

বিমানগুলো চারবার কেল্লাকে নিশানা বানায়। কিন্তু,আল্লাহ তাআলার অপার

অনুগ্রহে সমস্ত বোমা বাইরে পতিত হয়। বোমা থেকে বের হওয়া কিছু গ্রেনেড কেল্লার ভিতরে চলে আসে, কিন্তু তা বেশী কিছু ক্ষতি হয়নি। সমগ্র কেল্লা গোলা- বারুদে ভরা ছিল। একটি বোমাও যদি ভিতরে পতিত হতো তাহলে বারুদে আগুন ধরে যেত। সেজন্য মুজাহিদগণ অবিলম্বে কেল্লা খালি করে দেয়, আমরাও আহতদেরকে তুলে নিয়ে পদক্রজে চলা আরম্ভ করি।

আমার অবস্থা এখন এতই খারাপ ছিল যে, বিক্ষত পায়ের ভালু মাটিতে রাখা মুশকিল হয়ে পড়ে। কিছুটা আরাম লাভের আশায় সাথীদের থেকে কাপড়ের পষ্টি চেয়ে নিয়ে পায়ে জড়িয়ে নেই। ইতিমধ্যে আল্লাহর মূর্তিমান রহমত হয়ে একটি খালি ট্রাক চলে আসে। ট্রাকে আহতদেরকে তুলে নিয়ে রওনা করি এবং “বাড়ীর নিকটে এসে ফজর নামায আদায় করি।

আব্বাসী সাহেব এবং তাঁর সাথীরা নিজেদের ইচ্ছা ছাড়াই সেই ছয়জন সাহাবীর সুন্নাতের উপর আমল করার সৌভাগ্য লাভ করেন__মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে 'গাযওয়ায়ে যাতুর রিকায়ে” যাঁদের পবিত্র পা পদব্রজে চলতে চলতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। হযরত আবু মূসা আশআরী রোধিঃ)এর তো পায়ের নখও পড়ে গিয়েছিল। এ সমস্ত সাহাবাকে নিজেদের পায়ে পষ্টি বীধতে হয়। আর এ কারণেই এই গাযওয়ার নাম “যাতুর রিকা” প্রসিদ্ধ হয়। “রাযিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া মান তাবিয়াহুম"_“তাদের প্রতি এবং তাঁদের

অনুসারীদের প্রতি মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট।
(মুসলিম শরীফ )

সাধারণ অবস্থাতেও জুতা পরিধান করা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত এবং ইসলামী শিষ্টাচারের অন্তর্ভক্ত। তবে জিহাদের সময় এর গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পায়, কারণ এটিও জিহাদের জরুরী সামানার অংশবিশেষ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুজাহিদদেরকে এর প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন। হযরত জাবের (রাদি.) বর্ণনা করেন যে, জিহাদের একটি সফরে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি —

**اِسْتَكْثِرُوْا مِنَ النِّعَالِ فَاِنَّ الرَّجُلَ لَايَزَالُ رَاكِبًا مَّا انْتَعَلَ**

"অধিক হারে জুতা ব্যবহার কর, কারণ মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত জুতা পরিধান করে, ততক্ষণ সে আরোহী (এর মত) থাকে।" (এতে করে ক্রান্তি কম হয় এবং পা শক্ত মাটি এবং কাঁটার আঘাত থেকে নিরাপদ থাকে)। (মুসলিম শরীফ )

নূরুল আমীন ওয়ার্কশপে নিয়োজিত বাহিনীর অন্যতম সদস্য ছিলেন। সারা রাত এবং পরের দিন সকালেও তিনি সেখানেই ছিলেন। তিনি বলেন যে, রমাযানের ১৫ তারিখের ভোর হতেই বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। এই বৃষ্টির মধ্যেই মুজাহিদদের বিভিন্ন সংগঠন সম্মিলিতভাবে কেল্লা মতুনের উপর আক্রমণ করলে দুশমন তাদের বাইরের মোর্চাসমূহ ছেড়ে দিয়ে কেল্লার মধ্যে ঢুকে পড়ে।

কেল্লার প্রাচীর ৬/৭ ফুট চওড়া। তার নিচে নিকটেই দুশমনের ওয়ারলেস ষ্টেশন এবং রেডিও স্টেশনের ভবনসমূহ অবস্থিত। এ সকল ভবনের মধ্যে থেকে তারা যদিও রকেট মারতে পারছিল না, কিন্তু মেশিন গান দ্বারা শেষ পর্যন্ত মোকাবেলা করতে থাকে। মুজাহিদগণ তাদের উপর গনিমত স্বরূপ প্রাপ্ত দুটি ট্যাংক দ্বারা গোলা এবং দূর থেকে মিসাইল বর্ষণ আরম্ভ করেছিল।

বড়ই শিক্ষণীয় ঘটনা! অবস্থার মোড় কিভাবে ঘুরে গেল! চেঙ্গিজ প্রকৃতির কমিউনিষ্ট সেনারা নিঃস্ব ও দরিদ্র আফগানদের গ্রামকে গ্রাম যেই দৈত্যাকৃতির ট্যাংক দ্বারা মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছিল। নিষ্পাপ শিশু, নারী, অসুস্থ ও বৃদ্ধদেরকে আগুন-ও ধাতব বর্ষণ করে করে ভস্ম করে ফেলেছিল। আজ সেই ট্যাংকই রক্তচোষা সেই সেনাদের উপর আল্লাহর গজবরূপে পতিত হয়েছে। তবে পার্থক্য এই যে, নিষ্পাপ ও হত দরিদ্র সেই আফগান নাগরিকগণ তো শাহাদাত মদিরা পান করেন, কিন্ত অস্ত্র সমর্পণের লাঞ্কুনা বরদাশত করেননি। পক্ষান্তরে রক্তপিয়াসী এই ভীরু সেনারা-_যাদের মধ্যে বেশির ভাগ ছিল বড় বড় অফিসার__অল্পক্ষণের মধ্যেই হাত উপরে উঠিয়ে বাইরে বের হয়ে এসে মুজাহিদদের সামনে অস্ত্র সমর্পণ করে। মোটকথা সরাল দশটার কাছাকাছি এই শেষ দুর্গটির উপরও মুজাহিদদের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এসে থায়। নূরুল আমীন বলেন যে, এ সম্পূর্ণ ঘটনা আমাদের চোখের সামনে ঘটে।

এই দুর্গের মধ্যের পশ্চিম দিকের একটি গ্রামের উপর হিন্দু সেনারা-_ যাদের মধ্যে মহিলা কমাণ্ডোও ছিল--এখন পর্যন্ত দখল প্রতিষ্ঠা করে রেখেছিল। এদের সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে যে, কমিউনিষ্ট সরকারকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে এরা ভারত থেকে এসেছিল। কয়েকদিন পূর্বেই দুশমনের একটি পোষ্টের নিকট কয়েকজন ভারতীয় মহিলা কমান্ডোর সঙ্গে আমাদের মুখোমুখী মুকাবেলা হয়। 'এই গ্রামের পুরুষ ও মহিলা কমান্ডোরা মুজাহিদদের সঙ্গে তিন ঘন্টা পর্যন্ত তীব্র লড়াই করতে থাকে। বাধ্য হয়ে মুজাহিদদেরকে ট্যাৎক ব্যবহার করে তাঁদের সবাইকে খতম করতে হয়।

ইসলাম পৃথিবীর ইতিহাসের সেই প্রথম ধর্ম, যে ঠিক যুদ্ধের মৃহূর্তেও দুশমনের নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করাকে হারাম ঘোষণা করেছে এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট ভ'যায় এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম শরীফ)

তবে হাদীসের আলোকেই দুটি অবস্থায় তা' মাফ রয়েছে--এক, যদি দুশমনের নারী ও শিশুরাও লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। এমতাবস্থায় বাধ্য হয়ে তাদেরকেও হত্যা করার অবকাশ রয়েছে। দ্বিতীয়, রাত্রিকালে যুদ্ধ হওয়ার কারণে যদি নারী-পুরুষ এবং বড়-ছোটর মধ্যে পার্থক্য করা না যায়, এমতাবস্থায় অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি নারী এবং শিশুও মারা পড়ে, তাহলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ক্ষেত্রেও মাফ আখ্যা দিয়েছেন। তবে

এক্ষেত্রেও তাদেরকে ইচ্ছা করে হত্যা করা জায়েয নেই।

এ যুগের বোমা বর্ষণের ক্ষেত্রেও এই একই বিধান। যদি নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করার ইচ্ছা না থাকে, বরং দুশমনের শক্তি নিঃশেষ করাই লক্ষ্য হয়, আর এমতাবস্থায় যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে নারী ও শিশুও মারা পড়ে তাহলে তাও মাফ।

নারী ও শিশুদের যে বিধান ঠিক একই বিধান এ সমস্ত কাযেরদেরও, যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না। যেমন বৃদ্ধ, পঙ্গু, অন্ধ, উন্মাদ এবং মন্দির ও উপাসনালয়ে উপাসনারত লোক। তবে শর্ত হলো, তারা লড়াইয়ে অংশগ্রহণ না করা। সারকথা এই যে, মরহুম ভাইজানের (হযরত কাইফী)

ভাষায় __

***خدا ک□ خوف □ی پر منحصر □□ امن عالم کا***

***ی□ □□ شیراز□ □ستی، اس□ بر□م ن□ □ون□ دو***

‘আল্লাহর ভয়ের উপরই বিশ্ব চরাচরের শান্তি ও নিরাপত্তা নির্ভরশীল। এই হলো বিশ্ব অস্তিত্বের বন্ধন ও শৃংখলা, একে বিক্ষিপ্ত হতে দিও না।’

এই বিজয়ের বিশেষ বিশেষ দিক

30

১৪১১ হিজরীর পবিত্র রমাযানের ১৫ তারিখ (৩১শে মার্চ ১৯৯১ ঈসায়ী) সোমবার দিনটি খোস্তের উপর ইসলামের পরিপূর্ণ বিজয়ের দিন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। যোহরের পূর্বেই মুজাহিদগণ খোস্ত নগরীর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করেন ডেল্লেখ্য যে, আফগানিস্তানে সেদিন রমযানের ১৬ বা ১৭ তারিখ ছিল। কারণ, সেখানে রমাযানের চাদ পাকিস্তানের আগে দেখা গিয়েছিল।)

* কোন সৈন্য পালাতে সক্ষম হয়নি। সবাইকে বন্দী করা হয়েছে। যাদের মধ্যে উত্বতন সেনা অফিসার, কয়েকজন জেনারেল এবং একজন সহকারী প্রতিরক্ষা মন্ত্রী অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।.

(পি.পি.পি/রেডিও রিপোর্ট/মাওলানা পীর মুহাম্মাদ সাহেবের সাক্ষাৎকার, মাসিক আল-ইরশাদ পৃষ্ঠা ১০ ও ২১)

অস্ত্র সমর্পণকারী ঘোরা বন্দী হয়েছে) সৈন্যদের সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার। (দৈনিক জং করাচী, তারিখ ১৫ রমাযানুল মুবারক, ১৪১১ হিজরী)

30 এ শিরোনামের অধীনের বেশির ভাগ তথ্য হরকাতুল জিহাদিল ইসলামীর মুখপত্র মাসিক আল ইরশাদ-_খোস্ত বিজয় সংখ্যা, শাওয়াল/যিকাদ্দা, ১৪১১ হিজরী থেকে এবং হরকাতুল মুজাহিদীনের মুখপত্র মাসিক সদায়ে মুজাহিদ, শাওয়াল ১৪১১ হিজরী সংখ্যা থেকে সংগৃহীত। যেগুলোর সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। জার অন্য সূত্রে সংগ্হীত তথ্যসমূহের উদ্ধৃতি যথাস্থানে সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। __রফী" উসমানী

* কমিউনিষ্ট সরকার খোস্তের প্রতিরক্ষার জন্য তাদের বিরাট শক্তিকে এ লড়াইয়ের শেষ পর্যন্ত কাজে লাগিয়েছে। বিশেষ কমাণ্ডো বাহিনী, সাধারণ সৈন্য এবং স্বজাতির পূজারী মিলিশিয়া ছাড়াও দোস্তম এবং গলিমজাম নামী বাহিনীকে এখানে বিশেষভাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল।
'গলিমজাম'কে সর্বাধিক লড়াকু এবং সরকারের সর্বাধিক বিশ্বস্ত বাহিনী মনে করা হয়। তারা সর্বশেযে অস্ত্র সমর্পণ করে। লড়াইতে. এরাই সর্বাধিক সংখ্যক নিহত হয়।

* খোস্তে শুধুমাত্র পাঁচজন বা ছয়জন জেনারেল থাকতো। কিন্তু রমাযানের লড়াইকালে অতিরিক্ত বিশজন জেনারেলকে এখানে পাঠানো হয়। তারা শেষ পর্যন্ত এখানে উপস্থিত থাকে।

(সদায়ে মুজাহিদ পত্রিকায় প্রকাশিত মাওলানা জালালুদ্দীন হক্কানীর সাক্ষাৎকার)

মুজাহিদদের যে সাতটি সংগঠন এ লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে, শহরের সর্বশেষ চবিবশ ঘন্টার লড়াইয়ে তাদের শুধুমাত্র এক বা দুণ্জন মুজাহিদ শহীদ হয়েছেন। আল-ইরশাদ, পৃঃ ৬, মাওলানা পীর মুহাম্মাদের সাক্ষাৎকার)

* মাওলানা পীর মৃহান্মাদ সাহেবের ভাষ্যানুযায়ী নতুন ও পুরাতন বিমান বন্দরে অক্ষত ও বিধ্বস্ত বিমানের সংখ্যা ছিল শতাধিক। তার মধ্যে চল্লিশটি বিমান মেরামত করার পর ব্যবহারোপযোগী হয়। (প্রাগুক্ত)

* বিজয়ের পর মুজাহিদদের দ্বারা খোস্ত শহর পরিপূর্ণ ছিল। জায়গায় জায়গায় ট্যাংক এবং সাঁজোয়া ঘানের ভীড় ছিল। সর্ব ধরনের ভারী ও হালকা অস্ত্র এবং গোলা বারুদের স্তুপ বিদ্যমান ছিল। নিশ্চয়তার সাথে বলা হচ্ছিল যে, ভোর হতেই কাবুলের বোমারু বিমান এবং স্কাড মিসাইল সমস্ত অস্ত্রকে ধ্বংস করার এবং শহরকে ধুলিস্মাৎ করার আপ্রাণ চেষ্টা করবে। কিন্ত ভোর হতেই সমগ্র খোস্তের উপর আল্লাহর রহমত স্বরূপ“কালো মেঘ ছেয়ে যায়। বৃষ্টি বর্ষণ আরম্ভ হয়ে যায়। দুর্দিন পর্যন্ত অবিরাম বৃষ্টিধারা চলতে থাকে। ফলে কোন বিমান খোস্তে আসতে পারেনি এবং মুজাহিদরা সমস্ত অব্ত্র স্থানান্তরের সুযোগ লাভ করে। (আল-ইরশাদ, পৃঃ ১৫, সদায়ে মুজাহিদ, পৃঃ ১২)

* ব্যাংকে ৯শ' মিলিয়ন আফগানী নোট ছিল। সেগুলো মুজাহিদদের কেন্দ্রে স্থানান্তর করা হয়। (আল ইরশাদ, পৃঃ ৭)

* বিজয়ের দিন এবং তার পরবর্তী দুর্দিন কাবুল থেকে অসংখ্য স্কাড মিসাইল শহরের উপর এসে পতিত হতে থাকে। যার বেশীর ভাগই ব্যর্থ হয়। তবে একটি মিসাইলের আঘাতে ২জন, একটির আঘাতে ৪জন এবং একটির আঘাতে ৫ জন মুজাহিদ শহীদ হন। অনেকে আহতও হন। কিন্তু. মুজাহিদদের দ্বারা শহর পরিপূর্ণ ছিল। তারা শহরে শৃংখলা ও নিরাপত্তা বিধানে এবং অন্তর স্থানান্তরের কাজে লিপ্ত ছিলেন।

(আল ইরশাদ)

* সেনা ঘাঁটিসমূহ এবং অনেকগুলো বাড়ী থেকে প্রচুর পরিমাণে মদের বোতল, নগ্ন নারী

চিত্র, ভারতীয় ফিল্ম এবং কমিউনিষ্ট সাহিত্য-পুস্তক পাওয়া যায়। (আল ইরশাদ, পৃঃ ১৬)

* মাওলানা জালালুদ্দীন হক্কানী_যিনি ছিলেন খোস্ত লড়াইয়ের প্রাণপুরুষ এবং সর্বদা সামরিক পোষাকে সজ্জিত থাকেন__বিজয়ের পর সাদা পোশাক পরিধান করে শহরে প্রবেশ করেন। (সেদায়ে মুজাহিদ, পৃঃ ১৩)

* বিজয়ের পর অবিলম্বে খোস্তের জামে মসজিদের জন্য মাওলানা হক্কানীর ভ্রাতা 'হাজী খলিল" মসজিদের জরুরী সামানা সেখানে পৌছিয়ে দেন। মসজিদে আযান ও নামায আরম্ভ করা হয়। (প্রাগুক্ত)

* মাওলানা নূরুল আমীন বর্ণনা করেন যে, শহরের মধ্যে আমরা একটি ভূগর্ভস্থ কারখানাও দেখতে পাই। কারখানাটিতে অন্দ্র তৈরী করা হত। কারখানাটি অনেক বাঁক ও মোড় খেয়ে নিচে চলে গেছে। তার মধ্যে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত শুধু মেশিন আর মেশিন চোখে পড়ছিল।

* ডঃ নজিবুল্লাহু সোমবার দিন (খোত্ত বিজয়ের দিন) জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে মঙ্গলবার দিন খোস্তের পরাজয়ের জন্য শোক দিবস পালন করার আপিল করে। (দৈনিক জং, করাচী, ১৬ই রমাযান ১৪১১ হিজরী, ২৭শে এপ্রিল ১৯৯১ ঈসায়ী

কিন্ত মুজাহিদ নেতারা জোরালোভাবে তাদের সে অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেন। (সদায়ে মুজাহিদ, পৃঃ ১৫-১৬)

* পাকিস্তানে তখন ইসলামী জমহুরী ইত্তেহাদ এর সরকার ক্ষমতায় ছিল। জনাব নওয়াজ শরীফ ছিলেন প্রধানমন্ত্রী।

* কমিউনিষ্ট সরকার অশিক্ষিত অনেক মুসলমানকেও জোরজবরদস্তি করে, লোভ দেখিয়ে এবং প্রতারিত করে খোস্তের লড়াইয়ে ঠেলে দিয়েছিল। তাদের মধ্যে কিছু লোক তো যুদ্ধ চলাকালীনই এসে মুজাহিদদের সঙ্গে মিলিত হয়। অবশিষ্টরা নামে মাত্র লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে। তারা সুষোগ পেতেই অস্ত্র সমর্পণ করে।

* বন্দী সেনাদের মধ্যে বিরাট সংখ্যক ছিল স্বল্পবয়স্ক শিশু। তাদেরকে উর্দি পরিয়ে কাবুল সরকার জোরজবরদস্তি লড়াইয়ে ঠেলে দেয়। মাওলানা জালালুদ্দীন হক্কানী জাতিসংঘের নিকট আবেদন করেন যে, তারা যেন শিশুদের সঙ্গে পাশবিক ও অমানবিক এই আচরণের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। (দায়ে মুজাহিদ, পৃঃ ১৬ ও ২৪)

* বিজয়ের কয়েকদিন পর মাওলানা হক্কানী একটি সাক্ষাৎকারে বলেন যে, আমরা বন্দী সেনাদের সঙ্গে ইসলামী শিক্ষা অনুপাতে আচরণ করছি। তাদেরকে ভাল খাবার এব উৎকৃষ্ট সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। বরং যারা ক্ষমা প্রার্থনা করেছে এবং অঙ্গীকার করেছে যে, তারা নজীবের সেনা বাহিনীতে অন্তর্ভূক্ত হবে না, তাদেরকে

মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে এবং নিশ্চিন্ত হওয়ার পর ) অন্যান্যদেরকেও মুক্তি দেওয়া হবে। (প্রাগুক্ত , পৃঃ ৪ )

* বিজয়ের কয়েক মাস পর পর্যন্ত খোস্তের উপর দুশমনের বোমারু বিমান এবং স্কাড মিসাইলের আক্রমণ অব্যাহত থাকে। কতক মুজাহিদ তাতেও শহীদ হন। (আল ইরশাদ, পৃঃ ২৫ ) .

* শুধুমাত্র খোস্তের বিভিন্ন রণাঙ্গণে এবং সেখানকার লড়াইসমূহে ১৯৮৮ ঈসায়ীর নভেম্বর থেকে নিয়ে ১৯৯১ ঈসায়ীর মে মাস পর্যন্ত পাকিস্তানী মুজাহিদদের সংগঠন হরকাতুল জিহাদিল ইসলামীর ২৭ জন জানবাজ মুজাহিদ শহীদ এবং ৯৮ জন মুজাহিদ আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে ৭ জন মুজাহিদ একটি করে পা এবং একজন মুজাহিদ তাঁর দুই চক্ষু হারান। (আল ইরশাদ, পৃঃ ৩০ -৪৫)

পাকিস্তানী মুজাহিদদের অপর একটি সংগঠন হরকাতুল মুজাহিদীনের ২৬ জন মুজাহিদ শাহাদাত মদিরা পান করেন। মোসিক সদায়ে মুজাহিদ , সংখ্যা ৬ , ভলিউম ২, যিকাপ্দা ১৪১১ হিজরী , জুন ১৯৯১ ঈসায়ী )

এই সংগঠনের আহত ও পঙ্গুদের সংখ্যা সম্পর্কে অবগত হতে . পারিনি।

***ہر لحظہ نیا طور، نئی برق تجلی***

***اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہو طے***

“প্রতি ক্ষণে নতুন আঙ্গিক , নতুন
তাজাল্লীর বিদ্যুৎ ,

আল্লাহ করুন যেন প্রেমের ধাপ শেষ না
হয় ।”

বন্দী জেনারেলের সাক্ষাৎকার খোস্ত থেকে গ্রেপ্তারকৃত,একজন জেনারেল মুহাম্মাদ জাহের সালাহমিলের নিকট থেকে রাওয়ালপিগ্ডির দৈনিক জং পত্রিকার প্রতিনিধি জনাব হানিফ খালেদ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। তার কয়েকটি প্রশ্নোত্তর লক্ষ্য করুণ-

জেনারেলঃ থোস্ত পরাজয়ের বড় বড় অনেক কারণই রয়েছে। মৌসুম খারাপ ছিল। আমরা সানাই এবং রেইনফোর্সমেন্ট পাইনি।

প্রশ্ন- আপনাদের সৈন্যদের মোরাল কেমন ছিল?

জেনারেল- পরাজয় হলে তখন আর মোরাল কিভাবে থাকে?

প্রশ্ন- মুজাহিদদের আচরণ কেমন দেখছেন?

জেনারেল- মানবিক, ইসলামী এবং আফগানী ঐতিহ্যমত মুজাহিদরা আমাদের প্রতি খেয়াল রাখছেন।

প্রশ্ন- মুজাহিদদের সম্পর্কে অন্যান্য আফগান সেনাদের ধারণা কি?

জেনারেল- বাস্তব সত্য এই যে, আমরা বন্দী হওয়ার পর থেকে আমাদের সঙ্গে মুজাহিদদের সম্পর্ক অনেক উৎকৃষ্ট মানের রয়েছে।

প্রশ্ন- আপনাকে দশদিন পূর্বে খোস্ত পাঠানো হয় কেন?

জেনারেল- অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে রিপোর্ট প্রদান করার জন্য।

প্রশ্ন - আপনাদের বিপক্ষে পাকিস্তানী সেনারা কি লড়াই করেছে?

জেনারেলঃ খোস্তের লড়াইয়ে পাকিস্তানী সেনাদেরকে বিরুদ্ধে লড়তে দেখিনি।

প্রশ্ন- খোস্ত পরাজয়ের ফলে কাবুল সরকারের উপর কি ধরনের প্রভাব পড়বে?

জেনারেল- রাজনৈতিক দিক থেকে এবং আন্তর্জাতিক দিক থেকে কি প্রভাব পড়বে তা সাংবাদিকরা ভাল জানেন। তবে ভৌগলিক দিক থেকে আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি এলাকা হারিয়েছি। প্রত্যেকটি এলাকাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

প্রশ্ন- আপনার বয়স কত?

জেনারেল- ৪৮ বছর (সাদা চুলের কারণে তাকে ৫৮ বছরের কাছাকাছি মনে হচ্ছিল__জং প্রতিনিধি)।

প্রশ্ন- সামরিক বন্দী হওয়ার পর আপনার কি এ আশংকা হচ্ছে না যে, নজীবের সরকার যেভাবে মুজাহিদ কমাণ্ডারদেরকে হত্যা করছে, আপনাদেরকেও সেভাবে হত্যা করা হবে?

জেনারেল- আমরা এবং মুজাহিদরা আফগানী ভাই। আমার কোনরূপ আশংকা হচ্ছে না। কারণ, আমাদের আশা রয়েছে যে, আমরা মিলেমিশে আফগানিস্তানকে নতুন করে গড়ে তুলবো।

প্রশ্ন- আপনি শুরুতেই মুজাহিদদের সাথে সঙ্গ দেননি কেন?

জেনারেল- প্রথমে তো তাদের বিরুদ্ধে লড়েছি, কিন্তু লড়াইয়ে বন্দী হওয়ার পর আফগান মুজাহিদদের সদাচরণ দেখে সিদ্ধান্ত

নিয়েছি যে , মুক্তি পেলে আমরা পুনর্বার আর আফগান সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভূক্ত হবো না।

প্রশ্ন - কতদিন ধরে আঁফগান সেনাদের রসদপুত্র সাপ্লাই বন্ধ ছিল ?

জেনারেল- মাত্র দুদিন পূর্বে বন্ধ হয়েছিল।

প্রশ্ন -একথা কি ঠিক যে , আপনারা আলোচনার উদ্দেশ্যে মুজাহিদদের নিকট এসেছিলেন আর তারা আপনাদেরকে বন্দী করেছে ?

জেনারেল- আমাকে আলোচনার জন্য পাঠানো হয়নি এবং আলোচনা চলাকালে আমাকে বন্দী করা হয়েছে তাও ঠিক নয়। আমরা খোস্তে পরাজিত হওয়ার পর আমাকে বন্দী করা হয়েছে। যুদ্ধ যুদ্ধই। ডাঃ নজীব আমাকে যুদ্ধ করার জন্যই পাঠিয়েছিল। আমার পক্ষ থেকে নজিব সরকারের সেনাবাহিনীর নিকট পয়গাম এই যে , মুজাহিদগণ জালিম নয় , কোমল হৃদয়। তারা দুশমন নয় , দোস্ত।

কিন্তু শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত কমিউনিষ্টদের দাসত্বে নিমগ্ন এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইরত এই আফগান জেনারেলের কমিউনিজম থেকে প্রকাশ্যে তওবা কিংবা তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্নের পরিপূর্ণ ঘোষণা করা ছাড়া একথা বলা যে , "আমরা এবং মুজাহিদরা আফগানী ভাই , আমরা মিলেমিশে আফগানিস্তানকে নতুন করে গড়ে তুলবোম্ _ হাস্যকর তো বটেই তাছাড়া এই হাকীকতেরও অস্বীকৃতি —

***ممکن نہیں محکوم ہو آزاد کا ہم دوش***

***وہ بندۂ افلاک ہے، یہ خواجۂ افلاک***

“অধীন ও স্বাধীন ব্যক্তি এক সমান হতে পারে না ।

সে হলো মহাকাশের ক্রীতদাস , আর এ হলো মহাকাশের মনিব ।

## পরামর্শের ধর্মীয় গুরুত্ব

খোস্তের মহান বিজয় মুজাহিদদের সেই ঐক্য , সম্মিলিত পরিকল্পনা গ্রহণ এবং পারস্পরিক শলা -পরামর্শের পুরস্কার , যা এই লড়াইয়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কার্যকর এবং বহাল ছিল। অন্যথায় এটি এমন এক সময় ছিল যে, তাঁদের বিরুদ্ধে আমেরিকা, রাশিয়া , ভারত, ইসরাঈল ও অন্যান্য দুশমন শক্তিসমূহ এক জোট ছিল। সর্বত্র নিত্য নতুন এবং গভীর থেকে গভীর ষড়যন্ত্রের জাল বিছানো ছিল। এটি মুজাহিদদের দুঃসাহসিক ঈমানী অন্তর্দৃষ্টি (ফারাসাত ) ছিল যে , তাঁরা দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে এসে সত্যকে মহিমামণ্ডিত করার জন্য বাতিলের সঙ্গে চরম লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। তাঁরা নিজেদের এঁক্য দ্বারা দুশমনের সমস্ত তাকত এবং ষড়যন্ত্রে জালকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেন। তাঁদের এই সফলতার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের এই ঘোষণার সত্যতা পুনর্বার সর্বসমক্ষে ফুটে ওঠে।

**إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا**

অর্থ -“বাস্তবিকই শয়তানের চক্রান্তের জাল দুর্বল ও ব্যর্থ হয়। (সূরা নিসা -৭৬)

এই বাস্তব সত্যটি সর্বাবস্থায় স্মরণ রাখা জরুরী যে , আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে

একান্তই তার করুণা ও অনুগ্রহ দ্বারা নিঃশর্তভাবে বিজয় ও সফলতা দান করতে পারেন ঠিকই, ত্যুব তিনি বিজয় ও নুসরাতের প্রতিশ্রুতিসমূহকে দুটি শর্তের সাথে যুক্ত করেছেন।

প্রথম শর্ত হলো, খালেস নিয়ত। জিহাদ কেবলমাত্র দ্বীনের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং মজলুমকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে হতে হবে। আর দ্বিতীয় শর্ত হলো, প্রতি পদে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের বিধান ও নির্দেশ মেনে, চলার প্রতি সযত্ব গুরুত্বারোপ করতে হবে।

31

এখলাস এবং শরীয়ত কর্তৃক আরোপিত বিধানসমূহ পালন করে কোন কাজ করা হলে আল্লাহ তাআলার নুসরাত অবশ্যই শামেলে হাল হয়। ইসলামের ইতিহাস সাক্ষী যে, মুসলমানরা যখনই পরাজয়ের মুখোমুখী হয়েছে, তা এই শ্তদবয়ের ব্যাপারে ত্রুটি বা গাফলতির ফলেই হয়েছে। চাই সে ত্রুটি কতিপয় সদস্যের পক্ষ থেকে হোক বা সবার পক্ষ থেকে।

শরীয়তে ঐক্যের যে গুরুত্ব রয়েছে সে. সম্পর্কে তো সবারই জানা রয়েছে যে, কুরআন ও হাদীসের জায়গায় জায়গায় এ বিষয়ে

31 ১.পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়াগায় এই শর্তদ্রয়ের কথা পৃথক পৃথকভাবে বর্ণিত সহয়েছে। যেমন_-সূরা নিসার ৭৫-৭৬ নং আয়াত, সুরা আনফালের ৪৫-৪৬ নং আয়াত এবং সূরা নূরের ৫৫ নং আয়াত ;দ্রষ্টব্য।

তাকীদ করা হয়েছে। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহর এই হুকুম অনেকেরই দৃষ্টির আড়ালে থাকে যে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়পমূহে পারস্পরিক শলা-পরামর্শও শরীয়তে অনেক জরুরী। অভিজ্ঞতাও সাক্ষী যে, পারস্পরিক শলা-পরামর্শ ছাড়া ঐক্যও দীর্ঘদিন টেকসই হয় না।

মুজাহিদ নেতারা মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক এবং মরহুম জেনারেল আখতার আবদুর রহমানের দিক নিদেশিনা এবং পরিপূর্ণ সহযোগিতায় নিজেদের মধ্যে যেই এঁক্য কায়েম করেছিলেন, তার নেতৃত্বে দীর্ঘদিন পর্যন্ত জিহাদ দ্রুতগতিতে সম্মুখপানে অগ্রসর হতে থাকে।

এ দু" নেতার শাহাদাতের পর আফগান জিহাদের সর্বাধিক যেই ক্ষতিটি হয়, তা এই যে, তাদের এক্য বহির্দেশীয় ষড়যন্ত্র এবং কতিপয় লিভারের শ্বেচ্ছাচারিতার শিকার হয়ে ছিন্নভিন্ন হতে থাকে। পারস্পরিক যোগাযোগ এবং পরামর্শ ছাড়াই বড় বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হতে থাকে। যার পরিণতিতে জালালাবাদের আক্রমণ মারাত্মকভাবে ব্যর্থ হয়। বরং রাশিয়ান সৈন্যদের প্রত্যাবর্তন ১৯৮৯ ঈসায়ীর যেব্রুয়ারী মাসে সম্পন্ন হলেও তারপর দু' বছর পর্যন্ত কোন একটি শহরও জয় করা যায়নি।

পক্ষান্তরে খোস্তের শেষ লড়াইয়ে সকল কমাগারের এঁক্য এবং পারস্পরিক যোগাযোগ ও পরামর্শের বরকতে মহান বিজয়-_খুব কম লোকের কুরবানী নিয়ে_-তাঁদের পদচুম্বন করে।

পারস্পরিক পরামর্শ ঐক্যের প্রাণ। এছাড়া ঐক্য প্রতিষ্ঠিতও হয় না এবং টিকেও থাকতে পারে না। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীতে শলা -পরামর্শ করার দ্বারা পরস্পরের মধ্যে আস্থা ও সুসম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। অন্তর নিষ্কলুষ হয়। পক্ষান্তরে অহমিকা ও স্বেচ্ছাচারিতার ঘাতক বিষ . মজবুত থেকে মজবুত ঐক্যকেও মৃত্যুর দুয়ারে পৌছিয়েই তবে ক্ষান্ত হয়। মানবের এই সহজাত প্রবৃত্তিকে পরিবর্তন করা সম্ভব নয় যে , স্বেচ্ছাচারিতার সাথে কাজ করলে এবং সাথীদের আস্থাভাজন না হয়ে বড় বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে গুরুত্বপূর্ণ লোকদের অতীব নিষ্ঠাবান সাথীরাও বেশী দিন সঙ্গ দিতে পারে না।

অন্যদের কথা বাদই দিলাম হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাদি .__ যাঁদের চেয়ে অধিক অনুগত ও নিবেদিতপ্রাণ হওয়ার দাবী আর কেউই করতে পারে না -_তাঁদের ব্যাপারেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শিক্ষাদান করা হয়েছে _[32]

**فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ**

---

[32] 'মশওয়ারা " (পরামর্শ ) সংক্রান্ত উদ্ধৃত যাবতীয় ইসলামী শিক্ষা তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন থেকে সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য এই তাফসীরের ২য় খণ্ড , পৃঃ ২১৪-২২৭ এবং ৭ম খণ্ডের ৭০২ -৭০৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য। তবে হাদীসের আরবী এবারত এবং বিস্তারিত উদ্ধৃতিসহ 'পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র শিরোনামে এরতিহাসিক বিবরণ অধম লেখক সংযোজন করেছি। (রফী" উসমানী )

**وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ**

অর্থ - আল্লাহ পাকের অনুগ্রহেই আপনি তাদের প্রতি দয়ালু ছিলেন , আপনি যদি রুঢ় ও কঠোর মেজাযের হতেন তাহলে আপনার পাশ থেকে তারা চলে যেতো। সুতরাং আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন। এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। এবং বিশেষ ব্যাপারে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর যখন সিদ্ধান্ত করে ফেলেন তখন আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন। নিশ্চয় আল্লাহ পাক এরূপ লোকদেরকে ভালবাসেন। (সুরা আল-ইমরান , ১৫৯ আয়াত)

আয়াতটি উহুদ যুদ্ধের পর অবতীর্ণ হয়েছে। কতিপয় মুসলমানের পদস্খলন এবং মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডার ভিত্তিতে তাদের রণাঙ্গন ছেড়ে যাওয়ার ফলে এ যুদ্ধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আঘাত ও বেদনাপ্রাপ্ত হন __যদিও স্বীয় সহজাত মহান চরিত্র এবং দয়া ও ক্ষমার গুণের ভিত্তিতে এজন্য তিনি তাদেরকে কোনরূপ ভৎসনা করেননি এবং কোনরূপ কঠোর আচরণও কারো সাথে করেননি , তবুও আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় রাসূলের মনোরঞ্জন এবং এ সমস্ত মুসলমানের অন্তরে এই অন্যায়ের ফলে যে অনুতাপ ও মনোবেদনা সৃষ্টি হয়েছিল তা পরিষ্কার করার ইচ্ছা করেন। তাই তিনি ইতিপূর্বে এ সূরারই ১৫৫ নং আয়াতে তাঁদের ক্ষমা ঘোষণা করেন। আর এ আয়াতে (১৫৯) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁদের সঙ্গে অতিরিক্ত দয়া ও অনুগ্রহের আচরণ করার এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ পূর্বের ন্যায়

তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করার নির্দেশ প্রদান করেন।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম _- মহান আল্লাহ্র সর্বাধিক প্রিয় রাসূল এবং যথানিয়মে তাঁর নিকট ওহী এসে থাকে__বাহ্যতঃ তাঁর কোনরূপ পরামর্শের জরুরত ছিলো না। তিনি সর্ব বিষয় ওহী মারফত আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে অবগত হতে পারতেন। এতদসত্ত্বেও তাঁকে সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাহলে অন্য কোন ব্যক্তি - সে যত বেশী বুদ্ধিমান , অভিজ্ঞ , যোগ্য এবং নিজের সাথীদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যই হোক না কেন_ পারস্পরিক শলা-পরামর্শ করার প্রয়োজন থেকে কি করে মুক্ত হতে পারে ?

ইসলামে পরামর্শের গুরুত্ব কত বেশী তা ” এ থেকেও কিছুটা অনুমান করা যায় যে , পবিত্র কুরআনের বড় একটি সুরার নামকরণই করা হয়েছে 'আশশুরা” পরামর্শ ) দিয়ে। এ সূরায় খাঁটি মুসলমানদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা তাদের একটি গুণ এই বর্ণনা করেছেন যে -

**وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ**

অর্থ - “এবং তাদের প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে হয়ে থাকে (আশশুরা--৩৮)

এমনকি মা -বাবার মধ্যে থেকে কোন একজন দুগ্ধপানের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে শিশুর দুধ ছাড়াতে চাইলে পবিত্র কুরআন

তাদেরকেও পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে তা করার হেদায়েত দান করেছে।

(সুরা আল বাকারা __২৩৩ নং আয়াত দ্রষ্টব্য )

সাংগঠনিক, সামাজিক এবং জিহাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের সঙ্গেও পারস্পরিক শলা -পরামর্শের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। বিধায় কুরআন ও হাদীসের আলোকে এ প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয়ের আলোকপাত জরুরী মনে করছি।

১. বিষয়েপরামর্শ করতে হবে

উপরোক্ত আয়াত দ্বয়ে **اَمْرٌ** (আমর) শব্দটি উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ উভয় আয়াতেই মৌলিকভাবে একথা বলা হয়েছে যে, পরামর্শ হবে **اَمْرٌ** (আমর) সম্পর্কে। **اَمْرٌ** (আমর) শব্দটি আরবী ভাষায় কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কথা ও কাজকে **اَمْرٌ** (আমর) বলা হয়। আবার শাসন ও শাসন ক্ষমতাকেও **اَمْرٌ** (আমর), বলা হয়। **اَمْرٌ** শব্দের প্রথম বা দ্বিতীয় যে অর্থই গ্রহণ করা হোক না কেন, এ থেকে "হুকুমত, তথা শাসন ক্ষমতার ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণ করা সর্বাবস্থায় জরুরী বলে প্রতীয়মান হয়। কারণ, প্রথম অর্থ গ্রহণ করা হলে তখনও শাসন ও শাসন ক্ষমতার বিষয়াবলী গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে পরামর্শ গ্রহণের যোগ্য সাব্যস্ত হয়। আর তা এজন্য যে, এ সমস্ত আয়াতে আমর শব্দের অর্থ প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। চাই তা হুকুমত সংক্রান্ত হোক বা অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত।

তবে এ বিষয়টি ভাল করে বুঝে নেওয়া জরুরী যে , পরামর্শ শুধুমাত্র এ সমস্ত বিষয়েই সুন্নাত বা ওয়াজিব , যেগুলো সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট ও অকাট্য কোন হুকুম নেই। অন্যথায় যে সমস্ত বিষয়ে স্পষ্ট এবং অকাট্য বিধান রয়েছে , সে সমস্ত বিষয়ে কারো সঙ্গে পরামর্শ করার জরুরত নেই, বরং তা জায়েষও নেই। যেমন কেউ নামায , রোযা, হজ্জ ও যাকাতের মত এবাদত পালন .করবে কি করবে না এ বিষয়ে পরামর্শ করল। এগুলো শরীয়তে অকাট্য ফরয। এগুলো যে পরামর্শের বিষয়ই নয় তা " বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে এ বিষয়ে পরামর্শ করা যেতে পারে যে , যেমন হজ্জ করতে পানির জাহাজে যাবে , নাকি উড়োজাহাজে ? কোন্ হকদারকে কি পরিমাণ দিবে , ইত্যাদি ইত্যাদি। কারণ , এ সমস্ত বিষয়ে কুরআন ও হাদীস বিশেষ কোন পন্থাকে নির্ধারণ করে দেয়নি। বরং এ ব্যাপারে মানুষের অবস্থার প্রেক্ষিতে যে কোন উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করার স্বাধীনতা রয়েছে। একটি হাদীসে খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম .থেকে এর ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে যে , হযরত আলী (রাদি .) জিজ্ঞাসা করলেন - ইয়া রাসূলাল্লাহ ! যদি আমাদের সামনে এমন কোন সমস্যা দেখা দেয় , যার সুস্পষ্ট কোন আদেশ বা নিষেধ (কুরআন ও সুন্নাতে ) বিদ্যমান নেই, তাহলে এ ব্যাপারে আপনি আমাকে কি নির্দেশ করেন ? তিনি এরশাদ করলেন _

**شَاوِرُوْا فِيْهِ الْفُقَهَاءَ وَالْعَابِدِيْنَ وَ لَا تُمْضُوْا فِيْهِ رَأْيَ خَاصَّةٍ**

জানবাজ মুজাহিদ

অর্থ-“এ ব্যাপারে ফকীহ এবং আবেদ লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করো এবং কারো একক মতামতকে এক্ষেত্রে প্রয়োগ করো না।”

(তাবরানী, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খণ্ড ১, পৃঃ ১৭৮,

কানযুল উম্মাল, খণ্ড ৩, পৃঃ ৪১১)

এই হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, পরামর্শ শুধুমাত্র ব্যবস্থাপনা বিষয়ক, রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত বিষয়সমূহেই নয়, বরৎ শরীয়তের যে সমস্ত মাসআলা সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট বিধান নেই সে সমস্ত মাসআলা সম্পর্কেও মশওয়ারা করা সুন্নাত।

২. উপদেষ্টাদের মধ্যে দুটি গুণ থাকা আবশ্যক।

এ হাদীস থেকেই এ মূলনীতিটিও প্রতিভাত হয় যে, যাদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা হবে, তাদের মধ্যে দুটি গুণ বিদ্যমাৰ থাকা জরুরী। এক. সমাজে তারা ইবাদত-বন্দেগী (এবং সাধুতায়) প্রসিদ্ধ হতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ পরামর্শাধীন বিষয়ে তারা জ্ঞানসম্পন্ন এবং অভিজ্ঞ হতে হবে। উপরোক্ত হাদীসে হযরত আলী রোযিঃ)এর প্রশ্নটি শুধুমাত্র শরীয়ত সংক্রান্ত মাসআলা (কোন জিনিস শরীয়তে জায়েয, ওয়াজিব বা নাজায়েয হওয়া) সম্পর্কে ছিল বিধায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম “ফুকাহা” অর্থাৎ এমন আলেমে দ্বীন থেকে পরামর্শ গ্রহণের দাবী এই যে, পরামর্শাধীন বিষয়টি যদি ফিকাহের মাসআলা

সংক্রান্ত না হয়ে অন্য কোন বিষয় ও জ্ঞান সম্পর্কিত হয় , তাহলে সে ক্ষেত্রে বিষয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ কিংবা পরহেযগার লোকের নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণ করবে। তবে ইবাদত এবং সাধুতার গুণ , যার . সারকথা হলো "তাকওয়া ' উভয় প্রকার উপদেষ্টাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকা জরুরী। সুতরাং হযরত আলী রাদি . এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদি থেকে অপর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন -_

**اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ**

অর্থ - "যার নিকট পরামর্শ চাওয়া হয় সে আমানতদার।"

(তাবরানী , বাযযার , মাজমাউয যাওয়ায়েদ )

অর্থাৎ পরামর্শ একটি আমানত। তাই এ বিষয়ে তার নিষ্চরর জন্য যেটি পছন্দনীয় , অন্যের জন্যও সেই মতামতই প্রদান করা জরুরী। এর অন্যথা করা হবে খেয়ানত।

৩. ইসলামে পরামর্শের গুরুত্ব

প্রজ্ঞাময় কুরআনের উপরোক্ত বাণীসমূহ এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসসমূহ দ্বারা প্রতিভাত হয় যে, প্রত্যেক এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে -_-যার মধ্যে মতদ্বৈততা দেখা দিতে পারে __পরামর্শ গ্রহণ করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এবং সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাত এবং দুনিয়া ও আখেরাতে বহুবিধ

বরকতের কারণ। আর যে সমস্ত বিষয়ের সম্পর্ক জনসাধারণের সঙ্গে _যেমন, প্রশাসনিক বিষয়সমূহ -_-সেগুলোতে পরহেযগার নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে পরামর্শ করা জরুরী। (তাফসীরে ইবনে কাসীর ) .

পবিত্র কুরআনের উল্লেখিত আয়াতসমূহ এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশিদীনের ধারাবাহিক আমল এর উজ্জ্বল প্রমাণ ?

মোটকথা, ইসলামী হুকুমতের জন্য পরামর্শ এবং পরামর্শ -ব্যবস্থা মৌলিক গুরুত্ব রাখে। এমনকি শাসক (আমীর) যদি পরামর্শ পরিহার করে স্বেচ্ছাচারী হয়ে যায় , কিংবা শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে অযোগ্য লোকদের. থেকে পরামর্শ গ্রহণেই ক্ষ্যান্ত থাকে , তাহলে তাকে (আইনানুগ ও শাসতিপূর্ণ পন্থায় ) পদগু্যত করা ওয়াজিব। (তাফসীরে আলবাহরুল মুহীত )

শরীয়ত কর্তৃক আরোপিত পারস্পরিক পরামর্শের বিধানের উপর আমল করার দ্বারা ইসলামী শক্তি , সমাজ ও ব্যক্তির যে ফল , উপকারিতা ও বরকত লাভ হয় , সে সম্পর্কে নিম্নোদ্ধত হাদীস থেকে কিছুটা অনুমান করা যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

**مَنْ اَرَادَ اَمْرًا فَشَاوَرَ فَيْهِ وَ قَضَي لِلّٰهِ هُدِيَ لِاَرْشَدِ الْاُمُوْرِ**

অর্থ - “যে ব্যক্তি কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের সংকল্প করে এবং পারস্পরিক পরামর্শের পর এখলাসের সাথে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে , তাহলে (আল্লাহ

**اِذَا كَانَ اُمَرَائُكُمْ خِيَارُكُمْ, وَاَغْنِيَائُكُمْ سَمْحَاءُكُمْ
وَاُمُوْرُكُمْ شُوْرَي بَيْنِكُمْ, فَظَهْرُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ
مِنْ بَطْنِهَا’وَ اِذَا كَانَ اُمَرَائُكُمْ شِرَارُكُمْ’
وَاَغْنِيَائُكُمْ بُخَلاَئُكُمْ’ وَاُمُوْرُكُمْ اِلَي نِسَاءِكُمْ
فَبَطْنُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا**

জানবাজ মুজাহিদ

বিদ্যমান রয়েছে। ইতিপূর্বে সূরায়ে বাকারার ২৩৩ নং) আয়াতের উদ্ধতিতে একথা বলা হয়েছে যে, দুগ্ধপানের মেয়াদ থাকাকালে দুধ ছাড়ানোর সিদ্ধান্ত মাতা ও পিতার আপোষের পরামর্শের ভিত্তিতে হওয়া উচিত। এ বিষয়টির সম্পর্ক মহিলাদের সঙ্গে বিধায় পবিত্র কুরআন এ বিষয়ে বিশেষভাবে মহিলাদের সঙ্গে পরামর্শ করার নির্দেশ প্রদান করেছে?

৪. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরামর্শ গ্রহণের নির্দেশ কেন দেওয়া হয়েছে?

কতিপয় আলিম এর কারণ এই বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি বিষয় আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী মারফত অবগত হতে পারতেন বিধায় তাঁর পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজনও ছিল না এবং পরামর্শের উপর তাঁর কোন কাজ নির্ভরশীলও ছিল না। তবুও শুধুমাত্র সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা রক্ষা এবং তাঁদের মনোরঞ্জনের জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁদের থেকে পরামর্শ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু ইমাম আবু বকর জাসসাস বহ. তার কারণ এই বর্ণনা করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরামর্শ-বৈঠকের ইতিহাসও এ কথাই বলে যে, অধিকাংশ বিষয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলার

পক্ষ'থেকে ওহীর মাধ্যমে সরাসরি কর্মপন্থা নির্ধারণ করে দেওয়া হতো। তবে আল্লাহ তাআলার হিকমত এবং রহমতের ভিত্তিতে কিছু কিছু বিষয়কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতামত ও সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দেওয়া হতো। আর এ জাতীয় বিষয়সমূহের ব্যাপারেই তাঁর পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন পড়তো এবং এ জাতীয় বিষয়েই তাঁকে পরামর্শ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বদরের যুদ্ধ, খন্দকের যুদ্ধ, হুদাইবিয়ার সন্ধি এবং ইফ্ক হযরত আয়েশা রাদি. কে অপবাদ দেওয়ার ঘটনা ইত্যাদি ঘটনার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরাম থেকে পরামর্শ গ্রহণের ঘটনাবলী রাসূলের পবিত্র জীবন চরিতসমূহে এবং হাদীসপ্রস্থসমূহে মওজুদ রয়েছে। অনেকবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের মতামতকে পরিহার করেও কতিপয় সাহাবীর পরামর্শ গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের মতানুযায়ী ফয়সালা দিয়েছেন। এ সর্বই এমন ধরনের বিষয় ছিল, যেগুলোতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ওহীর মাধ্যমে বিশেষ কোন পন্থা নির্ধারণ করা হয়েছিল না। অন্যথায় তিনি ওহীর বিপরীতে কশ্মিনকালেও কারো মতামত গ্রহণ করতেন না। এমন করার মধ্যে ভবিষ্যৎ উম্মতের জন্য রাসূলের আমলের মাধ্যমে পরামর্শের সুন্নাত জারি করার বিশেষ হিকমত এবং রহস্যও কার্যকর রয়েছে। কারণ যেখানে স্বয়ং মহানবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও পরামর্শের প্রয়োজন থেকে মুক্ত নন, তাহলে এমন কে রয়েছে, যার পরামর্শের প্রয়োজন নেই বলে সে দাবী করতে পারে? সুতরাং যে আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরামর্শ গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেই আয়াত অবতীর্ণ হলে তিনি এরশাদ করেন —

**اَمَا اَنَّ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهُ غَنِيَّانِ عَنْهَا' وَلَكِنْ جَعَلَهَا اللّٰهُ رَحْمَةً لِّأُمَّتِيْ ' فَمَنْ شَاوَرَ مِنْهُمْ لَمْ يَعْدُمْ رُشْدًا, وَ مَنْ تَرَكَ الْمَشْوَرَةَ مِنْهُمْ لَمْ يَعْدُمْ عَنَاءً**

অর্থ - "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পরামর্শের প্রয়োজন নেই। তবে আল্লাহ পাক পরামর্শকে আমার উল্মতের জন্য একটি রহমত বানিয়েছেন। তাই তাদের যে ব্যক্তি পরামর্শ করবে, সে উত্তম কাজের) হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হবে না। আর যে ব্যক্তি পরামর্শ গ্রহণ করা ছেড়ে দিবে সে কষ্ট থেকে মুক্তি পাবে না। "( শুআবুল ঈমান লিল বাইহাকী)

## ৫. ইসলামের শাসন পদ্ধতি "পরামর্শভিত্তিক'

উপরোল্লিখিত আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা ইসলামের শাসন পদ্ধতি এবং আইন সংক্রান্ত কিছু মূলনীতিও সামনে চলে আসে। আর তা এই যে, ইসলামী শাসন পদ্ধতি হলো 'পরামর্শ ভিত্তিক সেখানে শাসক ও দলনেতা পরামর্শের মাধ্যমে মনোনীত হয়। এটি পারিবারিক উত্তরাধিকার নয়।

বর্তমানে তো ইসলামী শিক্ষার বরকতে সমগ্র বিশ্বে এই মূলনীতির কার্যকারিতাকে

নির্বিবাদে মেনে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আজ থেকে ১৪শ" বছর পূর্বের পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি দিন, যখন সমগ্র বিশ্বে দুই পরাশক্তি কাইসার ও কিসরার শাসন চলছিল। এ উভয় হুকুমত ব্যক্তিগত ও উত্তরাধিকারগত রাজত্ব হওয়ার বিষয়ে অভিন্ন ছিল। তাতে একজন মাত্র ব্যক্তি লক্ষ-কোটি মানুযের উপর নিজের যোগ্যতা ও প্রাপ্যতার ভিত্তিতে নয়, বরং উত্তরাধিকারের অন্যায় আইনের ভিত্তিতে শাসন করত। তারা মানুষকে গৃহপালিত পশুর মর্যাদা দেওয়াকেও শাহী এনাম মনে করতো। পৃথিবীর বেশির ভাগ অঞ্চলে এই চিন্তাধারার শাসনই বলবৎ ছিল। শুধুমাত্র ইউনানে (তৎকালীন গ্রীস) গণতন্ত্রের অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ কিছু চিত্র পাওয়া যায়। কিন্তু তাও আবার এত ক্রুটিপূর্ণ এবং ভঙ্গুর ছিল যে, সে সমস্ত মূলনীতির উপর কখনো কোন সুদৃঢ় হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি।

তাদের বিপরীতে ইসলাম শাসনক্ষমতা ও রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারের অপ্রাকৃতিক নীতি বাতিল করে রাষ্ট্প্রধানকে নিয়োগ ও বরখাস্ত করার বিষয়টি জনগণের হাতে অর্পণ করে। এই ক্ষমতা তারা তাদের প্রতিনিধি নীতি নির্ধারকদের) দ্বারা ব্যবহার করতে পারবে। রাজা পুজনের কাদা-পাঁকে ফেঁসে যাওয়া পৃথিবী ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমেই এই ন্যায়নীতি নির্ভর সহজাত রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিচয় লাভ করে। আর এটিই সেই শাসন ব্যবস্থার প্রাণ, যার বিকৃত

চেহারাকে বর্তমানে “গণতন্ত্র নাম দেওয়া হয়ে থাকে।

পশ্চিমা গণতন্ত্র
তবে বর্তমান ধাঁচের গণতন্ত্র ১৭৮৯ ঈসায়ীর ফ্রান্স বিপ্লবের অনুসরণে প্রতিষ্ঠিত হয়। নিঃসন্দেহে এ বিপ্লব স্বেচ্ছাচার রাজত্বের উপর চরম আঘাতরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এবং অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের অধিকাংশ দেশে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

কিন্তু এ বিপ্রুবটি ধর্মহীনতা (সেব্যুলারিজম)এর কোলে প্রবৃদ্ধি লাভ করে এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থা (ক্যাপিটালিজম)এর কাঁধে সওয়ার হয়ে রাজ-রাজড়াদের জুলুম-নির্যাতন এবং শোষণ ও হঠকারিতার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আত্মপ্রকাশ করে। সে কারণে পশ্চিমা গণতন্ত্রসূহও এমন ভারসাম্যহীন ও চরমগন্থীরূপে আত্মপ্রকাশ করে যে, তা” জনসাধারণকে, বরং অধিকতর.সঠিক কথা হলো জনসাধারণের নামে পুঁজিপতি, জায়গিরদার ও অত্যাচারীদেরকে সর্বময় ক্ষমতার স্বেচ্ছাচারী অধিকারী বানিয়ে শাসনক্ষমতা ও আইন বিভাগের এমন স্বাধীন কর্তা বানিয়ে” দিয়েছে যে, তারা আসমান-জমিন এবং সমস্ত মানুযের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা এবং প্রকৃত বিধান দাতা ও প্রকৃত অধিকর্তা যে একমাত্র মহান আল্লাহর সত্তা এই চিন্তা-চেতনা থেকেও অপরিচিত হয়ে যায়। এখন তাদের গণতন্ত্র

আল্লাহপ্রদত্ত ক্ষমতার জোরে আল্লাহর পক্ষ থেকে আরোপিত আইনসমূহকেও বোঝা এবং অমানবিক ভাবতে আরম্ভ করেছে।

ফল এই দীড়িয়েছে যে , বল্লাহীন রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে আসার পর শক্তিধর সেই শ্রেণীর উপর কোনরূপ আইনগত কিংবা নীতি - নৈতিকতার বাধ্যবাধকতাও আর অবশিষ্ট থাকে না। তারা দেশের যাবতীয় আইনকেই তাদের ব্যক্তিস্বার্থের ছাঁচে ঢেলে সাজায়। বাকি রইল হতদরিদ্র ও নিঃস্ব জনসাধারণ মূলতঃ এ সমস্ত গণতন্ত্র -যা তাদের স্বার্থরক্ষার নামেই অস্তিত্ব লাভ করেছিল-_তাদের দুঃখ দুর্দশার প্রতিকার না হয়ে , বরং শক্তিধর শ্রেণী ও তাদের ব্যক্তিস্বার্থের অধীন হয়ে অকেজো হয়ে যায়। দরিদ্র জনগ্বণের রক্ত পূর্বে রাজন্যবুযুর্গ নিড়িয়ে নিত। আর এখন তাদের রক্ত প্রতারণাপূর্ণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা , সূদী ব্যাংকিং ব্যবস্থা এবং নানাপ্রকার অর্থনৈতিক ভেলকিবাজির মাধ্যমে অর্থ গৃধ্নু শ্রেণী শোষণ "করতে থাকে। যে কোন ব্যক্তি গভীর দৃষ্টিতে এই রাষ্ট্রব্যবস্থাকে পরখ করে দেখলে সোচ্চারে বলে উঠবে যে -

***خنجر پہ کوئی داغ، نہ دامن پر کوئی چھینٹ ،***

***تم قتل کرو ہو کہ کرامت کرو ہو!***

‘খঞ্জরে কোন দাগ নেই , আঁচলে ছিটার চিহ্ন নেই ।

তোমরা কি হত্যা করছ , নাকি অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করছ ***?’***

পশ্চিমা গণতন্ত্রের মাধ্যমে যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পূর্ণতা লাভ করে , তারই জুলুম -শোষণের প্রতিকার স্বরূপ কমিউনিজমের সেই রাক্ষুসী আত্মপ্রকাশ করে , যার সম্মুখে চেঙ্গিস ও হালাকু খানের হিংস্রতাও ম্লান হয়ে যায়। জনসাধারণ পূর্বাধিক নির্যাতিত ও নিপীড়িত : হয়ে কমিউনিজমের নিষ্প্রাণ যন্ত্রাংশে পরিণত হয়। এটিও সেই ধর্মহীনতার (সৈক্যুলারিজম ) মতাদর্শই ছিল , যার এক কাঁধ থেকে শোষণকারী পুঁজিবাদী ব্যবস্থা জন্ম নেয় আর অপর কাঁখ থেকে রক্তচোষা কমিউনিজম আত্মপ্রকাশ করে। আর উভয়ে বিশ্বের দরিদ্র ও অসহায় জনসাধারণের রক্ত চুযে খাওয়ার কোন পথই বাদ রাখেনি।

মোটকথা সেকুলারিজম ধের্মহীনতা ) এমন এক পাঁক , যার মধ্যে ফেঁসে গিয়ে বিশ্বের বিরাট এক অংশ রাজাদের পাঞ্জা থেকে মুক্তি লাভ করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার জালে ফেঁসে যায়। আর তার থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করলে তাদেরকে কমিউনিজমের অক্টরোপাপে কযে আটকানো হয়। প্রাচ্যের কবি ইকবাল এই কবিতায় তার অলীক কাব্যশক্তিই শুধু প্রদর্শন করেননি —

***جلال پادشا□ی □و ک□ جم□وری تماشا □و***

***جدا □و دیں سیاست س□، تو ر□ جاتی □□ چنگیزی***

‘রাজাদের প্রতাপ হোক আর গণতন্ত্রের
ভেলকিবাজি হোক ,রাজনীতি থেকে দ্বীন

বিচ্ছিন্ন হলে তখন তাতে চেঙ্গিস খানের নৃশংসতাই শুধু রয়ে যায় ।’

ইসলামী আইন যেভাবে মানবতাকে রাজা - বাদশাদের জুলুম -শোষণ থেকে পরিত্রাণ দিয়েছে , তেমনিভাবে জনগণ ও তাদের প্রতিনিধিদেরকে আল্লাহকে চেনার এবং তাঁর বন্দেগী করার পথও দেখিয়েছে। ইসলাম বলেছে যে, দেশের শাসক হোক আর সাধারণ জনগণ হোক , সবাই আল্লাহপ্রদত্ত আইনের বাধ্য অনুগত হবে। জনগণ , এসেম্বলীর অধিকারসমূহ , আইন প্রণয়ন এবং পদাধিকারীদেরকে পদে বহাল রাখা ও বরখাস্ত করা এ সর্বই মহান আল্লাহ কর্তৃক বেঁধে দেওয়া সীমার মধ্যে থাকা জরুরী। শাসক ও রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত করতে এবং পদ ও অধিকারসমূহের বন্টনে একদিকে যেমন যোগ্যতা ও পারদর্শিতার প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক , অপরদিকে তাদের দ্বীনদারী ও আমানতদারীকেও পৰিপূর্ণৰূপে পরখ করে দেখা জরুরী। নিজেদের শাসক , রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রতিনিধি এমন ব্যক্তিকে নির্বাচিত করবে, যে ইলম, আল্লাহর ভয় , দ্বীনদারী - আমানতদারী এবং অভিজ্ঞতায় সর্বোত্তম। তারপরও এই শাসক স্বাধীন ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হবেন না , বরং দ্বীনদার ও বিজ্ঞজনদের থেকে পরামর্শ গ্রহণে বাধ্য থাকবেন।

খেলাফতে রাশেদা “পরামর্শের ভিত্তিতে , রাষ্ট্র পরিচালনার এমন সুন্দরতম আদর্শ ছিল, যা ধর্ম ও বিশ্বাস , স্থানীয় ও বহিরাগত , ধনী ও দরিদ্র এবং বর্ণ ও বংশের তারতম্য না করে প্রত্যেককে যথার্থ

ন্যায়বিচার এবং বাস্তবসম্মত সহজাত সমতা প্রদান করেছিল। সমগ্র সমাজকে অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রদান করে শান্তি ও নিরাপত্তা এবং তৃপ্তি ও প্রশান্তির লালন কেন্দ্রে পরিণত করেছিল।

***تو شام و صبح وہ پھر !تصور اے دکھادے ہاں***

***تو ایام گردش اے طرف کی پیچھے دوڑ***

“হে কল্পনাশক্তি ***!*** পুনর্বার সেই সকাল - সাঁঝ দেখিয়ে দাও ।

হে যুগের আবর্তন ***!*** পুনরায় একবার পিছন দিকে ধাবিত হও ।”

৬**.** পরামর্শে মতবিরোধ দেখা দিলে সিদ্ধান্ত কিভাবে নেওয়া হবে **?**

কুরআন, সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কেরামের ধারাবাহিক আমল দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, মতদ্বৈততা দেখা দিলে আমীর অধিক সংখ্যকের মত গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন। বরং এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, মতবিরোধ দেখা দিলে আমীর তার সত্যানুসন্ধানী দৃষ্টি দ্বারা যে কোন একটি মত গ্রহণ করতে পারবেন। চাই তা সংখ্যাগরিষ্ঠের মত অনুপাতে হোক কিংবা সংখ্যালঘুদের। তবে নিজের আত্মতৃপ্তি লাভের জন্য সাধুতার সঙ্গে যেমনিভাবে অন্যান্য দলীল-প্রমাণের প্রতি দৃষ্টি দিবে, তেমনি বেশীর ভাগ লোকের কোন বিষয়ে একমত হওয়াও অনেক সময় আত্মতৃপ্তির কারণ হতে পারে।

যে. আয়াতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরামর্শ গ্রহণের

নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে , সে আয়াতেই এরশাদ হয়েছে -

**فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ**

অর্থাৎ , পরামর্শের পর যখন আপনি (কোন দিককে প্রাধান্য দিয়ে তার ) সংকল্প করেন , তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন।

এ আয়াতে **عَزَمْتَ** শব্দের মধ্যে **عَزْمٌ** অর্থাৎ "কাজের সংকলম্প'কে শুধুমাত্র মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এখানে **عَزَمْتُمْ** (তোমরা সংকল্প কর ) একথা বলা হয়নি। এ রকম বলা হলে "আযম" তথা সংকল্পের মধ্যে সাহাবায়ে কেরামের শরীক থাকার বিষয়টি প্রতিভাত হতো-__এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, পরামর্শ গ্রহণের পর কেবলমাত্র আমীরের সিদ্ধান্ত ও সংকল্পই গ্রহণযোগ্য ও বিবেচ্য ।

সুতরাং দেখা গেছে যে , মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেকবার হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ ) এবং হযরত উমর (রাদি .)এর মতকে অধিক সংখ্যক সাহাবীর মতের উপর প্রাধানা দিয়েছেন। এমনকি একবার" তিনি তাঁদের উভয়কে সম্বোধন করে এরশাদ করেন__

**لَوْ اجْتَمَعْتُمَا فِيْ مَشْوَرَةٍ مَّا خَالَفْتُكُمَا**

অর্থ - "তোমরা দু 'জন যখন কোন বিষয়ে একমত হয়ে যাও , তখন আমি তোমাদের মতের বিপরীত করি না। , (মাজমাউয যাওয়ায়েদ )

হযরত উমর ফারুক রাদি . কোন কোন সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রাদি . এর

জানবাজ মুজাহিদ

মতানুষায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। অথচ মজলিসে সাধারণত এমন অনেক সাহাবী উপস্থিত থাকতেন, যাঁরা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বয়স, ইলম ও সংখ্যায় অনেক বেশী হতেন।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, এটি তো গণতন্ত্রের পরিপন্থী এবং ব্যক্তি-শাসনের পন্থাই হলো, এতে জনগণের ক্ষতি হওয়ার আশংকা রয়েছে।

তার উত্তর এই যে, ইসলামী,আইন পূর্বেই এর বিহিত করেছে। কারণ, ইসলাম জনগণকে এমন ক্ষমতাই দেয়নি যে, যাকে ইচ্ছা শাসক নিযুক্ত করবে। বরং তাদের অবশ্য কর্তব্য হলো, ইলম, আমল, যোগ্যতা, খোদাভীতি ও সাধুতার দিক থেকে যাকে সর্বাধিক উত্তম মনে করবে কেবলমাত্র তাকেই আমীর নির্বাচিত করবে। এমন উচ্চ গুণাবলী সম্পন্ন ব্যক্তিকে নির্বাচিত করার পর তার উপর এমন বিষয় আরোপ করা, যা অসাধু, পাপী ও দুরীতিপরায়ণ লোকের উপর আরোপ করা হয়__বিবেক-বুদ্ধি ও নীতি-নৈতিকতাকে খুন করা এবং কর্তব্যরতদের মত ও সাহস ভেঙ্গে দেওয়া এবং দেশ ও জাতির কাজে বাধা সৃষ্টি করারই নামান্তর হবে।

৭. প্রত্যেক কাজে প্রচেষ্টার সাথে সাথে আল্লাহর উপর ভরসা করা জরুরী।

এ স্থলে এ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে পরামর্শ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়ার সাথে সাথে এ

নির্দেশও প্রদান করা হয়েছে যে , যখন কাজ করার জন্য সংকল্প করবে , তখন নিজের জ্ঞান , বুদ্ধি ও কর্মপন্থার উপর ভরসা করবে না। আস্থা আর ভরসা শুধুমাত্র আল্লাহরই উপর রাখবে। পরামর্শ করাও কর্মকৌশলেরই অন্তর্ভূক্ত। আর কর্মকৌশল কার্যকর ও উপকারী হওয়া একান্তই আল্লাহ পাকের কুদরতী হাতে নিয়ন্ত্রিত। আল্লাহ চাইলে বিষ দ্বারা বিষনাশকের কাজ নিতে পারেন এবং তিনি চাইলে কারো জন্য বিষ নাশককেই বিষে পরিণত করতে পারেন। মানুষই বা কি আর তার মত ও চেষ্টারই বা গুরুত্ব কতটুকু ? প্রত্যেক মানুষই নিজের জীবনের হাজার হাজার ঘটনায় নিজের বুদ্ধি ও চেষ্টার তুচ্ছতা ও অক্ষমতা প্রত্যক্ষ করে থাকে।

মাওলানা রুমী (রহঃ) কত চমৎকার বলেছেন—

***خویش را دیدم و رسوائی خویش***

***امتحان ما مکن ا شا بیش***

অর্থ - "আমার অসহায়ত্ব ও আমার প্রচেষ্টার ব্যর্থতা খুব ভাল করেই প্রত্যক্ষ করেছি হে মহান সম্রাট ! তাই আমাদেরকে পরীক্ষা করবেন না ?

তবে মনে রাখতে হবে যে , "তাওয়াক্কুল" তথা আল্লাহর উপর ভরসা করার অর্থ উপায়-উপকরণ গ্রহণ না করা এবং চেষ্টা-তদবীর পরিহার করে নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকা নয় , বরং এমন করা আম্বিয়ায়ে কেরামের সুন্নাত এবং কুরআনের শিক্ষার পরিপন্থী। এ গ্রন্থে সমরাস্ত্র ও সমর-সরগ্রামের প্রস্তুতির বিষয়ে কুরআনের নির্দেশ এবং মহানবী

জানবাজ মুজাহিদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিক নির্দেশনাসমূহ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। পরামর্শ করাও তদবীরসমূহের অন্যতম। যার বিধান কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এইমাত্র বর্ণনা করা হলো। বিধায় শরীয়তের সীমার মধ্যে থেকে যুক্তিযুক্ত আসবাব ও তদবীর গ্রহণ করা এবং যথাযোগ্য চেষ্টা-পরিশ্রম করা কখনই তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। তবে হাঁ, অনর্থক ও অলীক তদবীরের পিছনে পড়া কিংবা শুধুমাত্র উপায়-উপকরণ এবং কর্মকৌশলকেই কার্যকর, প্রভাবশালী ও যথেষ্ট মনে করে মহান আল্লাহ থেকে গাযেল থাকা যে তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী তাতে সন্দেহ নাই।

(তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, খণ্ড ২, পৃঃ ২২৭)

সমাপ্ত